علامہ اقبال

(مجموعہ مقالات)

5

(بنگالی)

1993

আল্লামা ইকবাল

পঞ্চম খন্ড

আল্লামা ইকবাল

ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫

প্রকাশনা কমিটি

[illegible]

মূল্য : ৫০ টাকা
২ ডলার

[illegible]
[illegible]
১০৯, [illegible] রোড, ঢাকা
ফোন : ৪০৬৫৩২

Allama Iqbal
Printed at Mass Printing & Packaging Ltd. and published by [illegible] from 109, Nazimuddin Road, Dhaka.

Price : Taka 50
US $ 2

আল্লামা ইকবাল

ফেব্রুয়ারী '৯৪

সম্পাদনা কমিটি

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন [চেয়ারম্যান]

অধ্যাপক শাহেদ আলী

এস, মুজিব উল্লাহ

কে এ রহমান

এ এফ এম হোসাইন আহমদ

মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

সৈয়দ তোসারফ আলী

সম্পাদক ঃ আবদুল ওয়াহিদ

মূল্য ঃ ৫০ টাকা
২ ডলার

প্রকাশনায়
আল্লামা ইকবাল সংসদ
১০৯, নাজিম উদ্দীন রোড, ঢাকা।
ফোন ঃ ৪০৬৫১২

Allama Iqbal
Printed at Masro Printing & Packaging Ltd. and published by Abdul Wahid, from 109, Nazimuddin Road, Dhaka.

Price : Taka 50
US $-2

সূচী

পৃষ্ঠা

সেমিনার প্রবন্ধ

১. আমাদের কাল ঃ ইকবালের প্রাসঙ্গিকতা — ৯–১৭
❑ অধ্যাপক শাহেদ আলী

২. আল্লামা ইকবালের জীবন দর্শন — ১৮–১৯
❑ ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন

৩. ইকবাল দর্শনে ঐক্য ও সংহতি — ২০–২৫
❑ সৈয়দ তোসারফ আলী

অনুবাদ প্রবন্ধ

১. ইকবাল জীবনের শিক্ষা ঃ সাইয়্যেদ মওদুদী — ২৬–৩০
❑ আবদুল ওয়াহিদ অনূদিত

মূল্যায়ন

১. আল্লামা ইকবাল ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড প্রসঙ্গে — ৩১–৩৩
❑ হোসেন মাহমুদ

প্রবন্ধ

১. বিশ্ব সভ্যতায় ইকবালের অবদান — ৩৪–৪১
❑ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

২. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পাঠ্য পুস্তকে ইকবালের স্থান — ৪২–৪৬
❑ এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান

৩. ইকবালের চিন্তা, লাহোর প্রস্তাব এবং পাকিস্তান — ৪৯–১০২
❑ শেখ দরবার আলম

৪. মুসলিম জাগরণে ইকবালের অবদান — ১০৫–১১৩
❑ মাওলানা আমীনুল ইসলাম

৫. ইকবাল কাব্যে সমকালীন রাজনীতির প্রভাব — ১১৪–১২৪
❑ কানিজ–ই–বাতুল

IQBAL ACADEMY Library LAHORE 30990

shikdur

সূচী

পৃষ্ঠা

অনুবাদে ইকবাল

১. ইকবালের দশটি কবিতা ১২৫–১৩৪

❑ আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত

২. মাযহাব ১৩৪

❑ আব্দুজ্জাহের অনূদিত

ভাষণ

১. মহাকবি ইকবাল ও আমরা ১৩৫–১৩৮

❑ ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

২. প্রসঙ্গ ঃ ইকবাল দর্শনে ঐক্য ও সংহতি ১৩৯–১৪১

❑ জাস্টিজ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী

স্বাগত ভাষণ

১. মীর কাসেম আলী ১৪২–১৪৪

An Address

1. Speech of His Excellency Anwar Kemal, High Commissioner for Islamic Republic of Pakistan. 145-146

English Articles

1. Renaissance Movement of the Muslim World and Allama Iqbal 147-185

❑ Advocate Mujibur Rahman

2. Vision of Iqbal 186-188

❑ Mohammad Husain Malik

রিপোর্ট

১. 'ইকবাল দর্শনে ঐক্য ও সংহতি' শীর্ষক সেমিনার ১৮৯–১৯৫

❑ মুহাম্মদ রুহুল আমীন

২. 'আমাদের কাল ঃ ইকবালের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক সেমিনার ১৯৬–২০০

❑ শিকদার আবদুর রব

যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছে

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ জাতীয় অধ্যাপক, বর্ষীয়ান দার্শনিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী
ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ঃ সাবেক ভাইস চান্সেলর, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক শাহেদ আলী ঃ বিশিষ্ট কথাশিল্পী, শিক্ষাবিদ
ডঃ আবু সাঈদ নুরুদ্দীন ঃ ইকবাল স্কলার
মাওলানা আমীনুল ইসলাম ঃ সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ
আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী ঃ সাবেক বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
আবদুল মান্নান তালিব ঃ গবেষক, অনুবাদক, কবি, ইসলামী চিন্তাবিদ
শেখ দরবার আলম ঃ নজরুল গবেষক, বিভাগীয় সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব
সৈয়দ তোসারফ আলী ঃ সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক
কানিজ-ই-বাতুল ঃ চেয়ারম্যান, উর্দু ও ফার্সী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মীর কাসেম আলী ঃ সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, আল্লামা ইকবাল সংসদ
শিকদার আবদুর রব ঃ লেখক, সমালোচক,
হোসেন মাহমুদ ঃ লেখক, সমালোচক, অনুবাদক, গল্পকার
এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান ঃ পরিচালক, আল ফাতিহা গবেষণা পরিষদ
আবদুল ওয়াহিদ ঃ গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মুহাম্মদ রুহুল আমীন ঃ কবি, লেখক, চেয়ারম্যান, আল-আমীন ফাউন্ডেশন
আবদুজ্জাহের মাহমুদ ঃ ছাত্র, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সাইয়্যেদ মওদূদী ঃ ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিক

Mujibur Rahman : Senior Advocate, Bangladsh Supreme Courte.
Anwar Kemal : High Comissioner of the Islamic Republic of Pakistan, Dhaka.
Muhammad Husain Malik : Minister (Press), Pakistan High Commission, Dhaka.

আমাদের কথা

এক. ইকবালের সাহিত্য পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের জন্য। তিনি কোনো বিশেষ দেশের বা বিশেষ গোষ্ঠীর ও জাতির জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। মর্দে মুমিন তাঁর আদর্শ, মুসলমান জাতির একজন সদস্য হিসাবে নয়; বরং আল্লাহর নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণ বান্দা হিসাবে। জাতি বা ন্যাশান বর্তমান বিশ্বে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ ও ট্রাডিশনের সাথে তাকে যেভাবে সংযুক্ত করা হয়, মুসলমান আসলে সে অর্থে কোনো জাতির নাম নয়। মুসলমান শব্দটিও এসেছে 'ইসলাম' ও 'সালাম' শব্দ থেকে, যার অর্থ হয় মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর অনুগত হওয়া এবং তাঁর নির্দেশ মতো জীবনের পথপরিক্রমা করা। এদিক দিয়ে বিচার করলে মুসলমানও সংকীর্ণ 'জাতি' শব্দের গণ্ডির আওতায় পড়ে না। আর মুমিনের তো কোনো বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হবার প্রশ্নই আসে না।

দুই. ইকবালের সাহিত্যে বিশ্বাসকে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জীবনের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও লয় তিনটিই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ঈমানেরই ফল। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ছাড়া এ তিনটির কোনো অস্তিত্বই নেই।

তিন. মানুষ যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে, যে সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে শোষণ ও নিপীড়নের ধারাকে মানবিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে এবং সমাজ ব্যবস্থায় যে বৈষম্য, জুলুম, বিদ্বেষ ও স্বার্থপূজার প্রচলন করেছে ইকবাল তার পুনর্মূল্যায়ন করতে চান এবং তাকে নেকী, সততা, ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করার পরামর্শ দেন।

চার. ইকবাল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে চান। ব্যক্তি যেন এত বেশী ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে যায় যা তাকে ডিক্টেটরের আসনে বসিয়ে দেয়; আবার সমাজ যেন ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ করে ব্যক্তিকে সমাজের একান্ত দাসে পরিণত করতে না পারে– এদিকেও ইকবাল দৃষ্টি রেখেছেন।

পাঁচ. প্রত্যেক ব্যক্তি মূলত একটি স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ সত্তা। তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌছার জন্য। এই লক্ষ্যে পৌছতে হলে তার নিজস্ব গুণাবলী

বিকাশের মাধ্যমে তাকে উত্তরোত্তর অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। আল্লাহর দুনিয়ায় কারোর সে বান্দা নয়। সে একমাত্র আল্লাহর গোলাম, আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কাছে সে মাথানত করে না। আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার সব কিছুর গোলামী অস্বীকার করার ব্যক্তিত্ব–ক্ষমতা ব্যক্তিকে পূর্ণাঙ্গ মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত করে এবং এভাবেই সে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হয়।

বলা যায়, সাহিত্য ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারাকে ইকবাল কেবল পুনরুজ্জীবিতই নয় প্রতিষ্ঠিতও করেছেন। আধুনিক বিশ্বে ফরাসী বিপ্লব ও রাশিয়ার কম্যুনিস্ট বিপ্লব সাহিত্যকে যে ভাবধারা সরবরাহ করেছে তা মানবতার জন্য কল্যাণকর হয়নি। সারা বিশ্বব্যাপী তা এক বিশ্বাসহীনতা এবং তা থেকে সৃষ্ট নৈরাজ্যের প্লাবন ডেকে এনেছে। সে ক্ষেত্রে ইকবালের সাহিত্যের আদর্শ মানুষকে বিশ্বাসী, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্মঠ হবার প্রেরণা যোগাচ্ছে। তাই বিশ্বব্যাপী ইকবালের কদর বেড়ে যাচ্ছে। এই উপমহাদেশ ও এশিয়া–আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর সীমানা পেরিয়ে শুধু ইংল্যাণ্ডে ও জার্মানীতেই নয়– ফ্রান্স ও রাশিয়াতেও ইকবালের সাহিত্য জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কবির সমকালীন বিশ্ব তাঁর কবিতাকে যথার্থ মর্যাদা দেয়নি বলে কবি মোটেই ক্ষুব্ধ ছিলেন না; বরং তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, আগামী বিশ্ব তাঁর কবিতার মর্ম বুঝতে সক্ষম হবে এবং তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দেবে। কবির এ আশা আজ পূরণ হয়েছে এবং হচ্ছে।

আমাদের কাল ঃ ইকবালের প্রাসঙ্গিকতা

অধ্যাপক শাহেদ আলী

আমাদের কালের অর্থাৎ এই মুহূর্তের বাস্তবতাগুলো দুর্নিরীক্ষ্য নয়। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিঃ সাম্রাজ্যবাদের অর্গল ভেঙে পৃথিবীর প্রায় সব জনপদ এবং রাষ্ট্র, যার মধ্যে মুসলিম দেশগুলোও রয়েছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে; পৃথিবীর দু'টি পরাশক্তির একটি, ব্যক্তি সত্তাবিনাশী, নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিজমের ঘাঁটি সোভিয়েট রাশিয়ার পতন হয়েছে, খোদ সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব য়ুরোপের বলকান রাষ্ট্রসমূহে কম্যুনিজমের বিলুপ্তি ঘটেছে। আফগানিস্তানে কম্যুনিজমের ভরাডুবি হয়েছে। অপরদিকে অন্য পরাশক্তি আমেরিকা, গণতন্ত্রের নামে, তার য়ুরোপীয় দোসরদের নিয়ে পুঁজিবাদ শব্দটিকে আড়ালে রেখে চাতুর্যের সাথে বিশ্বজুড়ে বাজার-অর্থনীতি চালু করেছে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য জগৎ সাম্রাজ্য গুটিয়ে দোকান-দারিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই মুহূর্তের আরেকটি বাস্তবতা হচ্ছে-মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামের পুনরুত্থানের আলামত। ইরানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সারা বিশ্বের মুকাবিলায় এ-ই প্রথম একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা; রাশিয়ার অভ্যন্তরে ৬টি মুসলিমপ্রধান অঞ্চলের আযাদী, যুগোস্লাভিয়ায় মুসলিম বসনিয়া-হার্জেগোভিনার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করার পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র, আবিসিনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামী ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা অর্জন; ভারতে কাশ্মীরীরা আযাদীর জন্য মরণ-পণ জিহাদে লিপ্ত; ফিলিপাইনে মরো মুসলমানেরাও বুকের খুন ঢেলে ছিনিয়ে আনতে চাইছে তাদের মুক্তি। অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র আযাদীর সংগে, ইসলামের আলোকে নিজেদের জীবনকে নির্মাণের জন্য একটা প্রবল আকুতি দেখা যাচ্ছে। তৃতীয় বাস্তবতা হচ্ছে মৌলবাদের ধুয়া তুলে আতংকিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সিকিউলার ও তথাকথিত গণতন্ত্রী শক্তিগুলো মুসলিম বিশ্বের উপর থাবা মারার পাঁয়তারা করছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মহাথির মুহাম্মদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সম্প্রতি বলেছেন ঃ ইসলাম প্রতীচ্যের হামলার বিষয় হয়ে উঠেছে। অবশ্যি তার জন্য তিনি মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র দলের অপরিণামদর্শী সহিংসতাকে দায়ী করেছেন। পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েট রাশিয়া ও নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিজমের পতনের পর পশ্চিমা জগৎ এখন মুসলিম জাতিপুঞ্জের জাগরণকে তাদের প্রতিপক্ষ গণ্য করছে। এবং তাকে নির্মূল করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা তৈরির উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী মৌলবাদের ধুয়া তুলছে।

ইকবাল যেহেতু তাঁর কাব্য ও দর্শনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক জীবন-দর্শনের ক্রটি তুলে ধরেছেন এবং ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌল প্রেরণায় মুসলিম জাহানের মুক্তি ও

জাগরণের জন্য আশা–উদ্দীপনার অনিবার্য আবেগ সৃষ্টি করেছেন, তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই দ্বন্দ্ব ইকবাল পরিকল্পিত বিশ্বে কতটুকু যৌক্তিক তা বিবেচনার দাবী রাখে। ইকবালের খূদী–তত্ত্ব, যার মূল কথা হলো ব্যক্তিসত্তার বিকাশ এবং বিরামহীন কর্মতৎপরতা ও সংগ্রামের আদর্শ, তাতে পাশ্চাত্যের লিবারেলিজম–এর যে আদর্শ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তারই স্বীকৃতি রয়েছে, যদিও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিসত্তার বিপদ সম্পর্কে ইকবাল সতর্ক, অন্যদিকে সমাজের উপর গুরুত্ব দিয়ে সমাজকে খূদী বা ব্যক্তিসত্তায় লালন–পালন ও বিকাশের ক্ষেত্র ঘোষণা করে সমাজবাদী চিন্তাধারাকেও যথাযোগ্য মূল্যদান করা হয়েছে। এভাবে আসরারে খূদী ও রমূযে বেখূদীতে তিনি ব্যক্তি–সমাজের মধ্যে একটা ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করে অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি–স্বাতন্ত্র্য ও সর্বগ্রাসী সমূহবাদের ক্রটিগুলো থেকে মানব জাতিকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন– কেবল মুসলমানদের নয়, আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে এ ধরনের ব্যক্তি ও সমাজ সর্বপ্রকার আতিশয্য থেকে মুক্ত থাকে বলেই এ সমাজ একটা শান্তিকামী, সহিষ্ণু, উদার সমাজ। এ সমাজ সংঘর্ষ সৃষ্টি করে না, বরং এ সমাজবহির্ভূত আর সকলের জন্য একটা নমুনা স্থাপন করে, সবাইকে এই নমুনায় নিজ সমাজ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়।

ইকবাল পাশ্চাত্যের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে পাশ্চাত্যের প্রতি ঘৃণা নেই; তিনি কেবল তার ক্রটিগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন সংশোধনের প্রত্যাশায়। পক্ষান্তরে নির্জীব, উদ্যোগ ও ব্যক্তিত্বহীন নিজ সমাজকেই সমালোচনার কষাঘাতে রক্তাক্ত করেছেন, মোল্লা ও খানকা ব্যবসায়ী পলায়নবাদী সূফীদের অন্ধতা ও পরাজয়ী মনোভাব থেকে মুক্ত করার জন্য তীব্র ভাষায় তাদের আক্রমণ করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর উদ্দেশ্য ধ্বংস বা অভিসম্পাত নয়, জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে মানব ভ্রাতাদের মধ্যে সত্য ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, তাঁদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

কয়েক বছর আগে, এক বিখ্যাত খৃষ্টান ধর্মযাজক বলেছিলেন ঃ 'কম্যুনিজম ও ইসলাম দু–ই পাশ্চাত্য সভ্যতার দুশমন, দু–ই ক্যাপিটালিজম বা ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়, দু–ই ব্যক্তিগত সম্পত্তির শত্রু।' এতোদিন পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দুনিয়া কম্যুনিজমকে তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তাকে ধ্বংস করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য বলে স্থির করেছিলো– যদিও উভয়ে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস ও আকীদায় জড়বাদী। আজ কম্যুনিজমের ধ্বংসের পর তাদের কাছে ইসলামই এখন একমাত্র শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মহাথিরের ভাষায় ঃ 'ইসলাম এখন পাশ্চাত্য জাতিসমূহের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছে'। মহাথির একটি ক্ষুদ্র মুসলিম গ্রুপের সহিংসতার জন্যই পশ্চিমা জগতের এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন। শোষণ, জুলুম, নিপীড়নের বিরুদ্ধে ইসলামের আপোষহীন মনোভাব রয়েছে–একথা সত্য। মুসলমানেরা তাদের নিজ নিজ ভূখণ্ডে সম্মানের সংগে নিজের মতো করে বাঁচতে চায়, নিজেদের জীবন–দৃষ্টির আলোকে নিজেদের জীবনকে গড়তে চায়। এতে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীচক্র এবং তাদের তাবেদার মুসলিম শাসকগোষ্ঠী আতংকিত হয়ে তাদের নির্মূল করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তারা ক্ষমতায় এলেও তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তাদের উপর অত্যাচারের নির্মম স্টীমরোলার চালাচ্ছে। আলজেরিয়ার কথা আপনারা বিবেচনা করে দেখুন। ফিলিস্তিনের আদি অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে ইহুদী রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠা, ফিলিস্তিনে–লেবাননে বছরের পর বছর ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুদের নির্মম হত্যাযজ্ঞ, মিসরে ফেরাউনী শাসনের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের আন্দোলন তাদের ফাঁসি ও হত্যা, কাশ্মীরে নিজ বাসভূমে পরাধীন কাশ্মীরীদের নিধন যদি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং কিছু বেপরোয়া লোক যদি উপায়ান্তর না দেখে সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে, তা–ই বড়ো হয়ে দেখা যায় পশ্চিমা পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর কাছে, লাখো লাখো মানুষের দাসত্ব ও পরিকল্পিতভাবে তাদের হত্যা ওদের নজরে পড়ে না। বসনিয়ায় প্রায় দু'বছর ধরে লাখো লাখো মুসলমানের হত্যা, নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা দেখেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চোখ বুজে থাকে। তাদের বিবেক জাগ্রত হয় না। মানবাধিকার কমিশন এ নিয়ে মুখ খোলে না। অসন্তোষের মূল কারণগুলো দূর করার চেষ্টা করলে অর্থাৎ প্রত্যেকটি দেশ ও জনপদকে তার নিজের মতো করে বাঁচার সুযোগ দিলে সুস্থভাবে সকল জাতি–গোষ্ঠী বিকশিত হবার পরিবেশ পেলে সংঘর্ষ ও সংঘাতের অবকাশ কমে যেতো।

ইকবাল যে রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন তা কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র, এর সংগে বর্তমান পাশ্চাত্য ধ্যান–ধারণার মৌলিক পার্থক্য অবশ্যি রয়েছে। সেই ১৯৩২ সালেই ইকবাল বলেছিলেন, প্রতীচ্য যে উপার্জনসর্বস্ব অর্থনীতি গড়ে তুলে প্রাচ্য জাতিসমূহের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে এশিয়ায় জাতিসমূহের বিদ্রোহ অনিবার্য।

'আপনারা যে ধর্মের অনুসারী তাতে ব্যক্তির মূল্যের স্বীকৃতি রয়েছে এবং তাকে নিয়মের অধীনে আনা হয় তার সর্বস্ব আল্লাহ ও মানুষের খেদমতে বিলিয়ে দেবার জন্য। তার সম্ভাবনা এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এ জীবন–দর্শন এখনো এমন এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম– যেখানে মানুষের সামাজিক মর্যাদা তার জাতি, বর্ণ অথবা অর্জিত সম্পদ দ্বারা নির্ধারিত হয় না বরং তা নির্ধারিত হয় জীবনের ধরন দ্বারা, যেখানে মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে উদরের সাম্যের উপর নয় বরং আত্মার সাম্যের উপর, যেখানে একজন অচ্ছুৎ বিয়ে করতে পারে একজন শাহানশার কন্যাকে, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা একটি আমানত, যেখানে সম্পদ উৎপাদনকারীদের উপর আধিপত্যের জন্য পুঁজি জমা করার অধিকার দেওয়া হবে না।'

অবশ্য এই সমাজকে বাস্তবের রক্তমাংসে জীবন্ত করে তুলতে হলে ইকবালের মতে, কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে। রমূয–ই–বেখুদীতে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে ছয়টি শর্তারোপ করে ইকবাল বলেছেন ঃ ১। মানব সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি ভূমি হবে তাওহীদ, ২। তাওহীদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য থাকবে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব, ৩। সমাজকে পরিচালিত করার জন্যে একটি মৌলিক নীতিমালা অপরিহার্য, ৪। একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র থাকবে, ৫। একটি বিশেষ আদর্শের প্রতি সমাজের সদস্যবৃন্দকে পরিচালনের উদ্যম সঞ্চারের লক্ষ্যে থাকবে একটি যথাযোগ্য আদর্শ যা সাথে সাথে তাদের মধ্যে একত্ববোধ ও সুসামঞ্জস্য বিধান করবে, ৬। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে আয়ত্তে আনয়নের প্রয়াস থাকবে।

ইকবাল বলেন, এই অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শবাদকে থিয়োলোজিয়ান ও বিধান–কর্তাদের মধ্যযুগীয় খেয়াল থেকে মুক্ত করতে হবে। আত্মিক দিক দিয়ে আমরা বাস করছি চিন্তা ও আবেগের কয়েদখানায়, যে কারাগার আমরা কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে তুলেছি আমাদের

চারপাশে। অর্থাৎ ইজতিহাদের অধিকার প্রয়োগ করে, এসব মৌলনীতিমালার আলোকে, প্রতিটি মুসলিম দেশে একটি সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় কেবল তারাই আতংকিত হতে পারে যারা মানবতাবর্জিত, জীবনের মহৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অন্ধ শক্তিসমূহ। সত্যিকার মানবতাবদী রাষ্ট্র এ ধরনের সমাজকে সহযোগী বন্ধু পরিবার মনে করে, পাশাপাশি শান্তি–সম্প্রীতিতে বাস করতে আগ্রহী হবে, সুস্থ মানবপ্রকৃতির এ–ই তো দাবি। মুসলিম জাতিগুলোর উচিত আপাতত নিজ নিজ চৌহদ্দির মধ্যে, এ ধরনের একেকটি সমাজ গঠনের জন্য নিষ্ঠার সংগে কাজ করা। এতে করে সংশয় ও সন্দেহের অবসান হবে।

রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলামে ইকবাল বলেন ঃ 'ইসলাম সমস্ত জড়বস্তুর বন্ধন ও গোলামীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। ইসলামে জাতীয়তার ভিত্তি একটি খাঁটি ও পবিত্র পরিকল্পনার উপর স্থাপিত। ইসলাম এমন এক মানব গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে চায়, যাদের মধ্যে বর্ধিত ও সম্প্রসারিত হবার পূর্ণ উপযোগিতা স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান। ইসলামে জাতীয়তার ধারণা জাতি সম্পর্কিত অন্য সকল মতাদর্শ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর মূল আদর্শ ও ভিত্তি ভাষার ঐক্য নয়, বাসস্থানের ঐক্য নয়; বরং এর মূল নিয়ম হচ্ছে নিখিল সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে মত ও বিশ্বাসের ঐক্য ও সামঞ্জস্য– যা সব মানুষকে এক অবিচ্ছেদ্য শাশ্বত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে দিতে সক্ষম। এ মতাবলম্বী ব্যক্তি আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো, বীর আরব বেদুঈন, গংগার তীর ভূমির অধিবাসী আর্য অথবা পামীরের উচ্চতর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী যে–ই হোক না কেন, তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য করে না। দেশ ও মাটির পার্থক্য তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে না, কোনো বস্তুতান্ত্রিক বা ভৌগোলিক সীমারেখার বৈষম্য তাদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর রচনা করতে পারে না এবং কোন বংশ বা ভাষার বিরোধও তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

ইকবাল পাশ্চাত্যের জড়বাদ, নীরিশ্বরবাদ ও অর্থগৃধ্নুতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সংশোধন করতে চেয়েছেন এসবের মানবতাবিনাশী সমূহ ক্ষতিকর পরিণাম সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়ে, ওদের অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্ত মুসলিম মিল্লাত ও প্রাচ্য জাতিসমূহকে স্বকীয় আদর্শের উপর নিজেদের সামগ্রিক জীবন গড়ে তোলার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর এই আত্ম–প্রতিষ্ঠা ও নিজের মতো বাঁচার আকাঙ্ক্ষা যাদের কাছে খারাপ লাগে, তারা যতো উদারতার কথাই বলুক, ধনে–সম্পদে, সামরিক শক্তিতে যতো শক্তিশালীই হোক, আসলেই এরা মানবতার দুশমন, তারা মুসলিম দেশগুলোকে তাবেদার করে রাখতে চায়, আত্ম–সম্মান নিয়ে বাঁচতে দিতে চায় না। ওরা ধর্ম নীতি–বিবর্জিত রাজনীতিকে নির্লজ্জভাবে অনুসরণ করে, আর ইকবালের ভাষায় ঃ 'রাজনীতি থেকে ধর্ম–নীতি বাদ দিলে যা থাকে তা হচ্ছে চেংগিজের নীতি।'

এই চেংগিজখানী রাজনীতি আমরা দেখছি শান্তি পরিষদের ভেটোওয়ালা সর্দারদের মধ্যে– ইরাক তাদেরই ইংগিতে ইরানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, আবার তারাই শান্তি পরিষদে প্রভাব খাটিয়ে কুয়েত দখলের অপরাধে ইরাককে ধ্বংস করেছে। ফিলিস্তিনে, কাশ্মীরে চেংগীজখানের

বংশধরেরাই ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, এরাই বসনিয়া–হার্জেগোভিনায় মুসলমানদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছে, আর জাতিপুঞ্জ ও শক্তি পরিষদ তামাশা দেখেছে, ন্যাটো য়ুরোপের বুকে একটি মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্রকে নির্মূল করার এই বর্বরতম হত্যাকাণ্ডে সার্ব আর ক্রোটদের আগ্রাসনকে পরোক্ষ মদদ যুগিয়েছে।

এই পরিস্থিতি কি ইকবালের এই উক্তিকেই সমর্থন করে না ঃ 'আমাকে বিশ্বাস করুন, য়ুরোপ আজ মানুষের নৈতিক অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।' পক্ষান্তরে, যে–সব চূড়ান্ত ধারণা মানবাত্মার নিগূঢ় প্রদেশ থেকে কথা কয়ে ওঠে, আর বাহ্যঃদৃষ্টিতে বহির্মুখীরূপে প্রতিভাত অনুভূতিসমূহকে আন্তর্জাতিকতা গুণে গুণান্বিত করে; আর মুসলিম সমাজে এই ধারণাগুলো ঐশীবাণীর মাধ্যমেই প্রাপ্ত ও আয়ত্ত। মুসলিমের কাছে জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ব্যাপার। — আজ আমাদের কর্তব্য হচ্ছে– ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে নিজেদের সমাজকে পুনর্গঠিত করা এবং এখন পর্যন্ত আংশিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত ইসলামী ধারণাবলীকে আত্মস্থ করে সেই আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা–যা ইসলামের পরম লক্ষ্য।'

আজ গণতন্ত্রের জিগির উঠছে আমাদের দেশে, এবং বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি দেশে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। ভারত নাকি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র। আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা বলেনঃ সেক্যুলারিজম অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র এক সংগে চলে, ধর্ম নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত না হলে গণতন্ত্র অচল। আল্লামা ইকবাল বলেনঃ 'পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে মাথা গোণা হয়, হয় না ওজন করা।' অর্থাৎ এ গণতন্ত্রে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণের স্থান নেই, কেবল সংখ্যারই গুরুত্ব। আবুল হাশিম তাঁর ক্রীড অব ইসলামে এরই ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ এ তো ৫১টি গাধাকে ৪৯টি শ্রেষ্ঠ আরবী ঘোড়া থেকে মূল্যবান মনে করা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রে আমরা কী দেখছি! রাজনীতি, অর্থনীতি ক্ষেত্রে ও সমাজে আর ভারতের ২০ কোটি মুসলমানের অবস্থান কোথায়? কত হাজার সাম্প্রদায়িক দাংগা হয়েছে ভারতে? মুসলিম সংখ্যাগুরু কাশ্মীরের মুসলমানদের স্বাধীনতার দাবি কি স্বীকৃত? আলজেরিয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে একটি ইসলামপন্থী দল ক্ষমতায় আসীন হতে যাচ্ছিলো। কী ঘটেছে তাদের ভাগ্যে? বিশ্বের গণতন্ত্রের মোড়লরা কি নির্বাচনে বিজয়ী এই দলকে সমর্থন করেছে, তাদের সাহায্যে এসেছে? পরাশক্তি এবং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলো, রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র যা–ই তাদের তাবেদার হিসেবে তাদের নীল–নকশা কার্যকরী করতে রাজি হবে তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করছে, মদদ জোগাচ্ছে– আর যারা নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়, তারা গণতন্ত্রী হলেও তাদের উৎখাৎ করছে। ধনীর স্বার্থে দরিদ্রের শোষণ হচ্ছে এ গণতন্ত্রের লক্ষ্য। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র জনগণের নৈতিক ও মানবীয় বিকাশের সর্বপ্রধান অন্তরায়।

জাতীয়তাবাদের দাবি এখন খুবই বুলন্দ– ভূগোল, বর্ণ, ভাষা বা গোত্রভিত্তিক এই জাতীয়তাবাদের উস্কানি দিয়ে পৃথিবীকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করে নিজেদের মোড়লী জারি রাখছে পাশ্চাত্য জাতিগুলো। ইকবাল বলেন ঃ 'এ ধরনের জাতীয়তাবাদে আমি দেখতে পাই

নাস্তিক্যমূলক জড়বাদের জীবাণু, যাকে আমি মানবতার পক্ষে বৃহত্তর বিপদ সম্ভাবনা মনে করি।' আমরা দেখতে পাই, এ রকম একটি রাষ্ট্র যখন আকারে, জনবল, অর্থনৈতিক, সম্পদ ও সামরিক শক্তিতে বড়ো হয়, তখন তার অহমিকার সীমা থাকে না। নিজেদের সংখ্যালঘু ও দলিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো তাদের তাবেদার হয়ে ওঠে, ওরা হীনমন্যতা বোধের শিকার হয়, নামে স্বাধীন হয়েও কার্যতঃ পরাধীন জীবন যাপন করে। পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে গঠিত পাকিস্তানে, যার স্বাপ্নিক এবং দার্শনিক ছিলেন ইকবাল, মিল্লাতের ধারণা বিকশিত করে ইকবাল-পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তোলায় পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ব্যর্থতা যে বৈষম্যের জন্ম দেয়, তারই ফাটল দিয়ে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা এখানে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, ফলে শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে ওঠে - অহেতুক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়। ইকবালের কল্পনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠা মানবতার বৃহত্তর বিপদ সম্ভাবনার নযীর আমরা আমাদের জীবদ্দশায়ই দেখলাম আমাদের দেশে। রক্তভিত্তিক জার্মান জাতীয়তাবাদের ধ্বংসলীলা দেখলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই ইকবাল ইন্তেকাল করেন, কিন্তু তাঁর আশংকা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। এতে ইকবালের ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয়, ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় মুসলমানদের। এই ব্যর্থতার খেসারত আজ তাদের দেশে দেশে দিতে হচ্ছে।

খিলাফতের মতো একটি সংস্থার মাধ্যমে ইকবাল একদিন বিশ্ব মুসলিমকে সংগঠিত করার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর খিলাফতের যখন অবসান হলো, তুরস্ক নিজকে ঘোষণা করলো ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে, এবং আরব জাতিগুলো কয়েকটি স্বাধীন, অর্ধ-স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হলো, তখন ইকবাল স্বাভাবিকভাবে তাঁর এই চিন্তাধারার সংশোধন করে প্রত্যেকটি মুসলিম জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে বলেনঃ

এই মুহূর্তে, প্রত্যেকটি মুসলিম জাতিকেই তার নিজ সত্তার গহীনে দৃষ্টিপাত করতে হবে; কিছুকালের জন্য তার চিন্তার ক্যানভাসে তার নিজেরই ছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে-এভাবে সব ক'টি মুসলিম জাতি সংহত, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিমান হবার পরই তারা একটি জীবন্ত গণতন্ত্র সমাহার গড়ে তুলতে পারবে।

আর এহেন একতা সত্যিকারভাবে দেখা দিতে পারে এমন কতকগুলো স্বাধীন-সার্বভৌম ইউনিট সমবায়ে যাদের পরস্পরের মধ্যকার রেশিয়াল (জাতগত) প্রতিদ্বন্দ্বিতার বোঝাপাড়া ও মীমাংসা হতে পারে একটি সাধারণ স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষাজনিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দ্বারা। আমার মনে হয় আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের ধীরে ধীরে এই সত্যই বোঝাতে চান যে, ইসলাম জাতীয়তাবাদও নয়, সমাজবাদও নয়; ইসলাম প্রকৃত প্রস্তাবেই একটি জাতিসংঘ যা কৃত্রিম সীমারেখা ও জাতগত বৈশিষ্ট্য মানে শুধুমাত্র পরিচিতির খাতিরে, এসবের ভিত্তিতে সামাজিক সংশ্রব ও সম্পর্ককে ক্ষুণ্ন করতে নয়। এ মনোভাব থেকেই তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে একটা আলাদা রাষ্ট্র গঠনের ডাক দেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই পরামর্শেরই কিছুটা বাস্তবায়ন

দেখি ওআইসি – ওর্গেনাইজেশন অব ইসলামিক কান্ট্রিতে; যদিও এই প্রতিষ্ঠান সেই আধ্যাত্মিক রূহ থেকে বঞ্চিত যা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের জীবনী–শক্তি হতে পারে। প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রে ইকবাল–পরিকল্পিত সুষম, সুন্দর ইসলামী সমাজ গড়ে উঠলেই এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান একটি জীবন্ত সংগঠন হয়ে উঠতে পারে, এবং বিশ্বের জাতিপুঞ্জের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে। এখনো এ প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গের কেবল কৌতুকই উদ্রেক করে। রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্য যেহেতু এক হয়, তাই ওআইসি অনেক ক্ষেত্রেই সম্মিলিতভাবে একক সিদ্ধান্তে আসতে পারে না; ফলে, তাদের শক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

ইকবাল তাঁর কবিতায় এই সংস্থা গঠনের আহবান করেন এভাবে–

প্রাচ্যের একটি সংস্থা গড়ে তোলো
এবং শয়তানের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করো
আন্তরিকতা ও সততার ঝান্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরো।

এবং খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, তিনি তেহরানকে এই সংস্থার কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেনঃ

তেহরান যেন প্রাচ্যজগতের জেনেভা হয়
তা হলেই হয়তো সমগ্র বিশ্বের অদৃষ্ট নেবে পরিবর্তিত রূপ

জালাল উদ্দীন রূমীর দ্বারা গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ আল্লামা ইকবাল কি তাঁর বিশুদ্ধ চিত্তে এই আভাস পেয়েছিলেন যে, বহু শতাব্দীর পর ইরানেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হবে এ যুগের প্রথম সার্থক ইসলামী রাষ্ট্র? যে কারণে তিনি তেহরানকেই আধুনিক ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচনের পরামর্শ দিয়েছিলেন? তার স্বপ্নের পাকিস্তান ইসলামী বিপ্লবের ফল ছিলো না, এ ছিলো একটা রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতি–ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে যে নতুন ইরানের জন্ম হলো, তা প্রকৃত অর্থেই একটি ইসলামী বিপ্লবের ফল। প্রায় একই ভাষায় আল্লামা ইকবাল ও হযরত আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী কম্যুনিজম ও পশ্চিমা পুঁজিবাদী চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার ক্ষতিকর প্রভাব ঝেড়ে–মুছে ফেলে নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার তাকিদ দিয়েছেন। রাব্বুল আলামীনই ইমাম খোমেনীকে আল্লামা ইকবালের উত্তরসূরী নির্বাচন করে ইকবালের স্বপ্নকে রক্ত–মাংসে জীবন্ত করে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন?

পাশ্চাত্যের বাজার অর্থনীতির জয়জয়কার এখন। আমরাও তালে তালে ডুগডুগি বাজাচ্ছি। যারা কেবল কাঁচামাল উৎপাদন করে, কিছুই রফতানী করে না; কাঁচা মাল ছাড়া, তাদের জন্য মার্কেট অর্থনীতির তাৎপর্য কী? শিল্প–উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য বাজার খুলে দেয়া; অনুন্নত বিশ্বে শিল্প বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়া; কর্মসংস্থানের উপায় না রাখা। ক্রেতা ও বিক্রেতা এই দুই শ্রেণীতে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোকে বিভক্ত করা। যদিও বলা হয় সকলের জন্য অবাধ বাজার সৃষ্টি এর উদ্দেশ্য। কিন্তু আসলে অনুন্নত দেশগুলোকে শিল্পোন্নত দেশগুলোর পণ্য বিক্রয়ের স্থায়ী বাজার সৃষ্টি এর চূড়ান্ত লক্ষ্য। এতে দরিদ্র

দেশগুলোর সমস্ত সম্পদ গিয়ে পুঞ্জীভূত হবে ধনী দেশগুলোতে, গড়ে উঠবে ওদের পুঁজির পাহাড়। আর ওদের শোষণে অনুন্নত দেশগুলোর মানুষেরা সর্বস্বান্ত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে। আল্লামা ইকবালের একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধের ইতি টানছি ঃ

হে পাশ্চাত্যবাসী!

আল্লাহর এ পৃথিবীকে একটি দোকান ঘর মনে করো না।

তোমরা যাকে এ হাটে স্বর্ণ মুদ্রা মনে করছো,

তা প্রমাণিত হবে মেকি বলে।

তোমাদের নিজেদের উদ্যত খঞ্জরের উপরই

আপতিত হবে তোমাদের সভ্যতা

ভঙ্গুর বৃক্ষ শাখায় নির্মিত নীড়

ভেঙে পড়বে–আজ নয়,

আগামীকাল

. . . .

আজকের বিনম্র পিপিলিকারা

যে কিশতি বানাবে– গোলাপের পাপড়ি দিয়ে

তা–ই আমাদের পার করে নিয়ে যাবে

ঝড় ঝঞ্ঝা তরংগ সংকুল সমুদ্রের ওপারে।

এই পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট ও রোগ ধরা পড়েছিলো কবির দিব্য দৃষ্টিতে–এর পতন আজ হোক, কাল হোক, অবশ্যম্ভাবী, যদি না এ ফিরে আসে ধ্বংসের কিনার থেকে, জীবনের প্রশস্ত আঙ্গিনায়, যেখানে দুনিয়ার মানুষ মিলিত হবে পরস্পর সহযোগী, ভাই হিসেবে, জনগণের বিশ্বসংঘে সুচতুর ষড়যন্ত্রী, কপটদের জাতিসংঘে নয়।

ইকবাল তাঁর নিসর্গ প্রেম, দেশপ্রীতি, সৌন্দর্যপ্রীতি ও বিশ্ব প্রেমের গভীর প্রাণস্পর্শী অনুভূতি প্রকাশ করেছেন প্রধানতঃ কাব্যে, তাঁর অননুকরণীয় ভাষা, ছন্দ ও গীতিময়তায়। তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারার বাহন হয়েছে, তাঁর কতকগুলো ইংরেজী ভাষণ–যা পান্ডিত্য, মনীষা, গভীর উপলব্ধি ও প্রত্যয়ী যুক্তির এক অপূর্ব নিদর্শন। শিল্পের জন্যই শিল্প, শিল্পের এ সংজ্ঞার তিনি বিরোধী; তাঁর মতে, জীবনের জন্যই শিল্প– অর্থাৎ শিল্প হচ্ছে জীবনেরই সমালোচনা, জীবনেরই ব্যাখ্যা। কাব্যের এ ব্যাখ্যায় বক্তব্যই আসল লক্ষ্য, কাব্য সেই বক্তব্যের বাহন। উপরে কেবল ইকবালের দার্শনিক বক্তব্যেরই কয়েকটা দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর উপলব্ধির গভীরতা এতোই অতলস্পর্শী যে, তার প্রভাবে তাঁর ভাষাও হয়ে উঠেছে দেশ–

কালের গণ্ডি অতিক্রম করে যাওয়া এক অনুপম কাব্যের নিদর্শন। তাতেই এ প্রমাণ মেলে যে, আন্তরিকতার গুণেই তাঁর কবিতা তাঁর দেশ ও স্বজাতির হয়েও বিশ্বের সকল মানুষের কাব্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর কাব্যের এ দিকটা এ আলোচনায় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধতার কারণেই আলোচিত হয়নি।

ইকবাল বলেন, তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছত্র তাঁর শোণিত বিন্দু দিয়ে রচিত মালা। তাঁর কবিতা, তাঁর বক্তব্য বা আশু পরিপার্শ্ব যা-ই হোক, তা ভাষা ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে সকল মানুষের সম্পদ হয়ে উঠেছে। ফুলের রঙ-বৈচিত্র্য বা স্বর্ণের উজ্জ্বল প্রভা তার আরাধ্য নয়। তাই ইকবাল বলেন ঃ

আমি ভাবী কালের কবি

আমার সংগীদের উপর আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি।

আমি আমার সিনাইতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি –

যেন তাতে করে আবির্ভাব হয় মুসার।

তিনি বলেন ঃ "ইকবাল এবং ইকবালের বিরোধীরা কেউ বেশি দিন থাকবে না পৃথিবীতে। কিন্তু শুষ্ক জমিনে ইকবাল যে বীজ বুনেছে তা একদিন অংকুরিত হবেই। তার চারা একদিন বেড়ে উঠে সকল বিরোধিতার মধ্যদিয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবেই। আমাকে দেওয়া হয়েছে এর জীবনী শক্তির প্রতিশ্রুতি।"

যতোই দিন যাচ্ছে ততোই আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁর এই দাবির বাস্তবতা কতো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা আজ স্বীকৃত যে, ইকবাল সকল দেশের, সকল মানুষের, সকল কালের কবি। কারণ ব্যক্তি ও সমাজ মানুষের পরমোৎকর্ষের শাশ্বত স্বপ্নই তাঁর কাব্যের বাণী।

ইকবালের ১১৬-তম জন্মবার্ষিকীতে হোটেল সুন্দরবন অডিটরিয়ামে পঠিত

আল্লামা ইকবালের জীবন দর্শন [১]

ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন

আস্‌সালামু আলায়কুম

আল্লামা ইকবালের জীবন দর্শন সম্পর্কে ইতিপূর্বে অত্র ফোরামে বেশ কয়েকবার বক্তব্য রেখেছি এবং আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছি। সুতরাং একই বিষয়ের উপর আবার আলোচনা কিছুটা অযাচিত বলে মনে হবে। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি এ্যাবৃষ্টক্‌ট ধরনের বা বস্তুনিরপেক্ষ এবং ম্যাটাফিজিক্‌স বা অধিবিদ্যার আওতায় পড়ে যা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা সম্ভব নয় এবং তাই কিছুটা জটিল, সেহেতু বিভিন্ন আঙ্গিকে উহার উপর আলোচনা ও পুনরালোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

সবাই জানেন, দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের মূল জীবন দর্শন একটিই। তা হলো এক কথায়, 'খূদী'। এখন প্রশ্ন উঠে, 'খূদী' কি? আমরা আজ অত্র প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে তার শাব্দিক, আভিধানিক ও পরিভাষাগত দিকটির উপর কিছুটা আলোকপাত করতে চেষ্টা করবো। কারণ, জীবন দর্শন হিসাবে 'খূদী'কে বোঝার পূর্বে এ দিকটা জেনে নেয়া দরকার।

'খূদী' মূলত একটি ফারসী শব্দ এবং উর্দুতেও উহা সমভাবে ব্যবহৃত। কিন্তু ঐ অর্থে নয়, যে অর্থে আল্লামা ইকবাল নিয়েছেন। প্রামাণিক ফারসী ও উর্দু অভিধানসমূহে এর অর্থ দেয়া হয়েছেঃ গর্ব, অহংকার, অহমিকা, দাম্ভিকতা, আত্মশ্লাঘা, আত্মাভিমান, আত্মগৌরব, স্বার্থবাদ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি। উর্দু ও ফারসী কবি–সাহিত্যিকগণ প্রায় সবাই 'খূদী' শব্দটিকে এসব অর্থেই ব্যবহার করেছেন। শুধু মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমীই একমাত্র কবি, যিনি মুখ্যত 'সর্বেশ্বরবাদ'–এর একজন ঘোর প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্য মসনভীতে এসব অর্থ ছাড়াও 'খূদী' শব্দটিকে আত্মসচেতনতা, আত্মপরিচয়, আত্মোপলব্ধি, আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

আল্লামা ইকবাল মাওলানা রূমীর এসব অর্থকে সূত্র ধরে এবং এসব ভাবধারা থেকে অনুপ্রাণীত হয়েই তাঁর কালজয়ী 'খূদী' দর্শন গড়ে তুলেছেন এবং এ কারণেই তিনি মাওলানা রূমীকে তাঁর আধ্যাত্মিক পীর ও মুরশিদ মেনে নিয়ে গর্বিত হয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'খূদী' দর্শনটি কবির কোন এক বিনিদ্র রজনীর ফসল। স্বপ্নাবিষ্ট চিত্তে রূমী কর্তৃক ব্যক্ত 'খূদী'র আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কীয় অর্থটিকে কেন্দ্র করে তিনি কল্পনার জগতে বিচরণ করতে থাকেন। অবশেষে পীর ও মুরশিদের নির্দেশ পেয়ে এবং তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে উক্ত দর্শনের ভিত্তিমূল ও কাঠামো নির্মাণ করেন। এ কথা তিনি তাঁর 'আসরারে খূদী' কাব্যের সূচনাতে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য পরে তিনি তাঁর উক্ত দর্শনের পুরো সমর্থন আল–কুরআন থেকেই খুঁজে পান।

আল্লামা ইকবালের নিকট 'খূদী'র সংজ্ঞা হলো, যা তিনি নিজেই পেশ করেছেন ঃ 'খূদী আত্মিক অনুভব শক্তির এমন একটি একক বা আত্মসচেতনতার এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু, যা

---

[১] *ইকবালের ৫৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে হোটেল প্রীতম ওডিটরিয়ামে পঠিত প্রবন্ধ*

থেকে মানুষের যাবতীয় আবেগ, ভাবধারা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাসমূহ প্রজ্বলিত ও আলোকিত হয়। উহা কখনো লয়প্রাপ্ত হয় না। উহা এমন একটি খাঁটি সত্য যা মানবস্বভাবের বিক্ষিপ্ত ও অপরিসীম অবস্থাসমূহের মধ্যে বাঁধন হিসাবে কাজ করে। উহা মানবদেহে একটি নীরব শক্তি, যা কর্মের মাধ্যমে বিকশিত হবার জন্য সদা অস্থির। খূদীর বাসস্থান মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে নিহিত।' যথা তিনি বলেছেন ঃ

খূদীর বাসস্থান তোমার অন্তরে লুকিয়ে আছে

যেমনিভাবে আকাশ তোমার চোখের মণিতে

ফারসী ও উর্দু সাহিত্যে 'খূদী' শব্দের প্রচলিত অর্থ থেকে সরে গিয়ে তাকে একটি সাবলীল পরিভাষায় রূপান্তর করা ও পরে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনে পরিণত করা আল্লামা ইকবালের অসাধারণ প্রতিভারই পরিচায়ক। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ জীবন দর্শন আজ সারা বিশ্বে নন্দিত ও বহুল আলোচিত।

'খূদী' দর্শন প্রচার করাই আল্লামা ইকবালের জীবনের বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। বিভিন্নভাবে 'খূদী'র ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য তিনি তাঁর কাব্য জীবনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি ঐ শিরোনামে এত জোরালো ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন যে, উহা আজ তাঁরই বিশেষ জীবন দর্শন বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর সমস্ত শিক্ষা ও মতবাদসমূহের কেন্দ্র বিন্দুই হলো এই 'খূদী' দর্শন। তাঁর অন্যান্য সব কথা খূদীকেই ঘিরে ব্যক্ত হয়েছে।

যেহেতু 'খূদী' শব্দের পুরানো অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে লোকের মনে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবার আশঙ্কা ছিল এবং বস্তুত কোন কোন মহলে হয়েছেও তা-ই এবং এখনো তা হচ্ছে, সেহেতু আল্লামা ইকবাল স্বয়ং ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, 'খূদী' পরিভাষা দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, উহার অর্থ গর্ব ও অহংকার নয়; বরং উহার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ঐ আত্মপরিচয় ও আত্মসচেতনতা, যার বদৌলতে মানুষের মূল্যবান জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং খূদাপ্রদত্ত মহত্ত ও শান-শওকত পুনরুদ্ধার হতে পারে - এইমর্মে তিনি 'আসরারে খূদী'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন ঃ 'হ্যাঁ, 'খূদী' পরিভাষা সম্পর্কে পাঠকগণকে অবশ্যই অবহিত করা প্রয়োজন যে, উহা এই কাজে গর্ব ও অহংকার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; যা সাধারণত উর্দুতে প্রচলিত আছে। উহার অর্থ শুধু আত্মোপলব্ধি অথবা স্বীয় অস্তিত্বের পরিচয় লাভ।'

তিনি তাঁর বন্ধু কাজী নযীর আহমদকে ১২ মে, ১৯৩৭ সালে লিখিত পত্রে বলেন ঃ 'আসরারে খূদী ও রুমূযে বেখূদী-উভয় কাব্যেরই মুখ্য বিষয়বস্তু এই খূদীর প্রশ্ন। উক্ত গ্রন্থে আপনি যদি এমন কোন পংক্তি পান, যাতে খূদীর অর্থ গর্ব বা অহংকার বোঝায় তাহলে দয়া করে আমাকে অবহিত করবেন।'

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লামা ইকবাল তাঁর রচনাবলীতে কোথাও 'খূদী' পরিভাষাকে গর্ব বা অহংকার অর্থে ব্যবহার করেননি। এ জন্যই তিনি কবিতার ভাষায় অন্যত্র উল্লেখ করেছেন ঃ

খূদীর তীক্ষ্ণতায় ও প্রখরতায় কোন গর্ব ও অহংকার নাই

যদি কিছু গর্ব থেকেও থাকে, তা বিনয়ের স্বাদ থেকে খালি নয়।

ইকবাল দর্শনে ঐক্য ও সংহতি[১]

সৈয়দ তোসারফ আলী

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও চিন্তানায়ক আল্লামা ইকবালের পঞ্চান্নতম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত 'ইকবাল দর্শনে ঐক্য ও সংহতি' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আমাকে এই সুযোগদানের জন্য সংসদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সেমিনারের মূল বিষয়ে যাবার আগে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংসদের সুযোগ্য, পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদকে আজকের সেমিনারের বিষয়টি নির্ধারণের জন্য। কারণ, আমরা এমন একটা দুঃসময় অতিক্রম করছি যখন মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ঐক্য ও সংহতির কোনো বিকল্প নেই।

সমকালীন মুসলিম জাগরণ একদিকে যেমন নতুন আশার জন্ম দিয়েছে, তেমনি বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তিকেন্দ্র এই জাগরণকে ভীতির চোখে দেখছে এবং নতুন করে মুসলিম বিদ্বেষে ইন্ধন যোগাচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে মুসলমানদের নির্মূল করার দুরভিসন্ধিও আঁটছে। আরও সঠিকভাবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ক্রুসেড পরিচালনা করা হচ্ছে। এই ক্রুসেডের অংশ হিসেবে সলমান রুশদিকে দিয়ে লেখানো হয়েছে ইসলাম বিদ্বেষী গ্রন্থ 'শয়তানী গাথা'। ধূলায় মিশিয়ে দেয়া হয়েছে ষোড়শ শতকের ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ। কাশ্মীরসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও শহরে মুসলমানরা দাঙ্গার শিকার হচ্ছে। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার সার্বদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানদের উপর বর্বর হত্যাযজ্ঞ ও পাশবিক ধর্ষণ চালাবার কাজে। একই ধরনের অমানবিক নির্যাতন-জুলুম চালানো হচ্ছে ফিলিস্তিন, আজারবাইজানের মুসলমানদের উপর। বিশ্বের কোথাও কোনো মুসলিম দেশকে, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেয়া হচ্ছে না। গণতন্ত্র, মানবতা, আধুনিকতা ইত্যাদি আদর্শের মুখোশ ফেলে দিয়ে মুসলমানদের শায়েস্তা করা হচ্ছে। বিশ্বের একশো ত্রিশ কোটি মুসলিম হৃদয় আজ অব্যক্ত বেদনায় নীল। বিশ্বের বিবেকী মানুষ ভেবে পাচ্ছে না এ বর্বরতার শেষ কোথায়?

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলিম বিশ্বের বিপর্যস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বিচলিত বোধ করেছিলেন কবি দার্শনিক আল্লামা ইকবাল। তিনি হতাশাদীর্ণ মুসলিম মিল্লাতের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ঐক্য ও সংহতির কথা গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করেছিলেন। এ কারণে ইকবাল দর্শনের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ঐক্য ও সংহতির ভাবনা। মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য এবং গোটা মানবমন্ডলীর ঐক্য নিয়ে তিনি বিস্তর আলোচনা করেছেন। কখনও বিষয়টি তিনি দার্শনিকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কখনওবা রাজনীতিকের বাস্তববোধ ও দূরদৃষ্টি নিয়ে বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। তাই ঐক্য ও সংহতির ব্যাপারে কখনও

---

[১] ইকবালের ৫৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ২১ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবে পঠিত সেমিনার প্রবন্ধ।

আল্লামা ইকবালের আলোচনা হয়ে উঠেছে একাডেমিক, কখনও তাঁর আলোচনা আবর্তিত হয়েছে ব্যবহারিক নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করে।

ইকবালের ভাবনা-চিন্তা বিকাশের ইতিবৃত্তে তাকালে আমরা দেখতে পাই ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত তিনি ইউরোপে দর্শন অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। ইউরোপে দর্শন অধ্যয়নকালেই তিনি প্রত্যক্ষ করেন পশ্চিমী জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশলের বিস্তার। ইউরোপের জাতীয়তাবাদ যে হিংস্র স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে সেটা দার্শনিক ইকবাল আগাম আঁচ করতে সক্ষম হন। ইউরোপের বাতাসে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গন্ধ পান। ১৯০৭ সালে ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি একটি কবিতায় বলেন : ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য হচ্ছে দুর্বল জাতিগুলোকে শোষণ করা। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন এই বলে, জাতীয় আত্মম্ভরিতার মধ্যে সংঘর্ষ আসন্ন; এসব জাতি তাদের বাসা নির্মাণ করেছে দুর্বল ও সরু গাছের ডালে, ঝড়ের একটি ঝাপটা তাদেরকে নীচে ফেলে দেবে। এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ ঐক্য ও সংহতির যে মডেল হাজির করেছিলো তা ইকবালকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। ইকবাল হয়ে ওঠেন জাতীয়তাবাদের কঠোর সমালোচক। গোটা মানব জাতিকে নিয়ে তিনি একটি মিল্লাত (ভ্রাতৃ সমাজ) গঠনের উপর জোর দেন।

ইকবাল প্রাচ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের দুর্বল দেশগুলোকে প্রভুত্বের জোয়ালে বেঁধে রাখার পাশ্চাত্য ফন্দি ধরে ফেলেন। তিনি দেখতে পান পাশ্চাত্য এসব দেশের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা জিইয়ে রাখছে এবং এ সব দেশের জনসাধারণকে কর্মবিমুখ জীবন-দর্শনে তথা আধ্যাত্মিক ধ্যানে তন্দ্রাচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে মদদ জোগাচ্ছে। ইকবাল ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, শয়তানের কাছ থেকে পাওয়া আফিমে এসব দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী হয়েছে অদৃষ্টবাদী আর এক শ্রেণীর ধর্মানুসারী হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের গোলাম। ইকবালের মনে জিজ্ঞাসা জাগে, আল্লাহ্ কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করলেন মানুষকে, আর মানুষ করছে কি? প্রাচ্যের মানুষ করছে পাশ্চাত্যের পায়রবি আর পাশ্চাত্য ছুটছে ডলারের পেছনে। সর্বত্রই চলছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের রাজত্ব।

ইকবাল এই শয়তানের কারসাজির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কথা ভাবতে গিয়ে সক্রিয় সচেতনতার প্রয়োজন অনুভব করলেন। প্রয়োজন অনুভব করলেন চারিত্রিক দৃঢ়তার। যে-ধর্ম, যে-দর্শন মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত করতে, সমুন্নত রাখতে সাহায্য করে না তেমন ধর্ম ও দর্শনকে তিনি ধিক্কার জানালেন। মুসলিম সমাজের ঘুম ভাঙার জন্য তিনি ধর্মীয় চিন্তা পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিলেন। সন্ধান করলেন ধর্মের এক সংস্কৃত, পরিশীলিত রূপ। বলা বাহুল্য, ইসলামের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর লক্ষ্যভেদের মন্ত্র। কোরআন ও হাদীসের বাণী থেকে তিনি এই সত্যের সন্ধান পেলেন যে, মানুষের সত্তা ঐশীগুণে গুণান্বিত হয়ে এমন মুক্তাদানায় রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা রাখে যা সমুদ্রের সান্নিধ্যে গিয়েও সমুদ্র হবে না। সমুদ্রের ভেতরকার তরঙ্গের অভিঘাত মুক্তাদানাকে দেবে আরও দীপ্তি। সসীম খুদী তথা মানুষ সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা চিন্তার জগতে ইকবালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং ভালোবাসা মানুষকে অধিকতর শক্তিমান করে, মানুষকে অনুপ্রাণিত করে সমাজের সেবায়, মানবতার কল্যাণে তার জানমাল কোরবানী করতে। এই প্রতীতি তিনি পান ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য মন্থন করে। ইসলামের সাম্যবাদী, মানবতাবাদী ও তওহীদভিত্তিক ঐক্যমুখীন জীবন দর্শনকে

তিনি আধুনিক পরিভাষায় উপস্থাপিত করেন তাঁর কবিতায়, দর্শনে ও ভাষণে– যাতে মানুষের মনে শক্তিমান শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ও আবেগ সঞ্চারিত হয়।

ইসলামী ইবাদতের মর্ম আলোচনা করতে গিয়ে ইকবাল ঐক্য ও সংহতির প্রসঙ্গ আনেন। তিনি বলেন, 'ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য তখনই সিদ্ধ হয় যখন তা সংঘবদ্ধভাবে করা হয়। সম্মিলিত নামাজে মানুষ অভিন্ন লক্ষ্য ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, মনোনিবেশ করে। একই প্রবণতায় মানুষ তার অন্তরাত্মাকে উন্মোচিত করে দেয়।'

সম্মিলিত ইবাদত ইসলামের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। ইকবাল বলেন, 'সংঘবদ্ধভাবে নামাজ আদায় করার মাধ্যমে ইসলাম তার আধ্যাত্মিক দীপ্তিকে ছড়িয়ে দিতে চায়'। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সংঘবদ্ধভাবে নামাজ আদায় করা থেকে মক্কার কেন্দ্রীয় মসজিদ বায়তুল্লাহ শরীফের চারপাশে বাৎসরিক সম্মিলনীর কথা বিচার করলে বোঝা যায় ইসলামী ইবাদত অনুষ্ঠান পর্যায়ক্রমে মানুষের মেলামেশার সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইসলামী ইবাদতে একটি বিশেষ দিক নির্দিষ্ট থাকা প্রসঙ্গে ইকবাল বলেন, 'এতে নামাজ আদায়কারীদের ভেতরে ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এছাড়াও এর সাধারণ রূপ ইবাদতকারীদের মধ্যে একটা সামাজিক সাম্যবোধের চেতনাকে লালন করে। যা শ্রেণী ও বর্ণগত বিদ্বেষ দূর করতে সহায়ক হয়। এ প্রসঙ্গে ইকবাল আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, 'যদি দক্ষিণ ভারতের গর্বিত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের প্রত্যহ অস্পৃশ্যদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হতো, তাহলে অত্যল্পকালেই কী বিরাট এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত হত।'

ব্যাপারটাকে দর্শনের পরিভাষায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইকবাল বলেন ঃ 'যাবতীয় সসীম খুদীর স্রষ্টা ও রক্ষক সর্বাধার খুদীর একক স্বরূপ থেকেই প্রতীয়মান হয় সর্বমানবের অন্তর্নিহিত ঐক্য।···· ইসলামে অনেকে একত্রে নামাজ পড়ার যে ব্যবস্থা আছে, জ্ঞানগত মূল্য ছাড়াও তার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, যে-সব সংস্কারের দেয়াল মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে, তা ভূমিসাৎ করে তাদের জীবনে এই অন্তর্লীন ঐক্যের বাস্তব উপলব্ধি জাগানো।'

গোটা মানবমন্ডলী নিয়ে এক মহাজাতি গঠনের কাজটি মোটেই সহজ বলে বিবেচিত হয়নি ইকবালের কাছে। তবে ইসলাম যে সুচিন্তিত অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে অন্তহীন বিরোধ-বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে একটি সামগ্রিক আদর্শ ও চেতনা গড়ে তুলতে অনেকখানি কৃতকার্য হয়েছে–একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন তাঁর বক্তব্যে।

আধুনিক সভ্যতাকে সংকটমুক্ত করার লক্ষ্যে আল্লামা ইকবাল একটা ব্যবস্থাপত্রও দিয়ে গেছেন। বিশ্বের ভাবুক সমাজ এ পর্যন্ত তার মূল্য খুব কমই অনুধাবন করেছেন বলে আমাদের বিশ্বস। বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য ইকবালের ব্যবস্থাপত্রে প্রথমেই বিশ্বজগতের একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি জীবনে আধ্যাত্মিকতার উজ্জীবন ঘটানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, মানব সমাজের আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য একটা বিশ্বজনীন নীতিমালা গ্রহণ করার আহবান জানানো হয়েছে।

ইকবালের আশা ছিল তার সময়ের ত্রিশ কোটি মুসলমানকে ইসলামী খিলাফতের তথা শাসন ব্যবস্থার অধীনে একত্রিত দেখবার। কিন্তু উসমানিয়া সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ায়, সার্বজনীন ইসলামী

শাসন ব্যবস্থা তথা খিলাফত অন্তর্হিত হওয়ায়, তুরস্ক ধর্মনিরপেক্ষ রূপ নেয়ায় এবং আরব জাতিগুলো একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ায় তিনি ভিন্নভাবে ভাবতে বাধ্য হন। তিনি বাস্তব অবস্থার নিরিখে এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকে মুসলিম জাতিসমূহের করণীয় সম্পর্কে বলেন, 'এখন তাদের একান্ত প্রয়োজন নিজ নিজ অন্তরের গভীরে দৃষ্টিপাত করা, কিছু কালের জন্য একমাত্র নিজের উপর নিজ দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা। তাহলেই উপযুক্ত শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয় করে যথাসময়ে সম্ভব হবে মুসলিম সাধারণতন্ত্রগুলোর সমবায়ে একটি জীবন্ত ইসলামী পরিবার গড়ে তোলা।· · · ·এই বিশাল স্বাধীন ও স্বনির্ভর জাতিপুঞ্জের পরস্পরবিরোধী গোত্র ও সম্প্রদায়গত স্বার্থাবলীকে একটি আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার আদর্শে নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তোলার মধ্যে রয়েছে এর সত্যিকারের অভিব্যক্তি।'

ঐক্য ও সংহতির কথা আসলে সংগঠনের কথাও এসে পড়ে। ঐক্যকে স্থায়ী করার জন্য সাংগঠনিক কাঠামোর কথা ভাবতে হয়। ইকবালও ভেবেছেন। কিন্তু ব্যক্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে শুধুমাত্র সংগঠনের ওপর নির্ভর করাটাকে তিনি পছন্দ করেননি। যেমনটি ফ্যাসিস্ট ও কমিউনিস্টরা ইস্পাত কঠিন ঐক্যের জন্য প্রধানত সংগঠনের উপর নির্ভর করে। ইকবাল বিশ্বাস করতেন, কোনো জাতির ভাগ্য শুধুমাত্র সংগঠন শৃঙ্খল দিয়ে গড়ে তোলা যায় না। তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় সমাজের মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও শক্তি। সংগঠনের বাড়াবাড়ি ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটায়। ইকবাল বিশ্বাস করতেন, 'অতি সংগঠিত সমাজে ব্যক্তি একদিকে শক্তিলাভ করলেও অন্যদিকে তার আপন আত্মারই ঘটে অবলুপ্তি।'

একজন হৃদয়বান কবি এবং প্রজ্ঞাবান দার্শনিক হিসেবে আল্লামা ইকবাল তাঁর সময়ে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ যদি নীতিগতভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তার ঈমান ও আকীদা অনুযায়ী জীবন গঠনের অধিকারকে স্বীকার করে নিতেন তাহলে আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঐক্য অবশ্যই গড়ে তোলা সম্ভব হতো। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আগা–গোড়া দাবি করতে থাকেন যে, তাঁরাই ভারতীয় জাতিসমূহের একমাত্র প্রতিনিধি, একমাত্র অভিভাবক। লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে প্রমাণ হয় যে, তারা তা নন। এদিকে পানি অনেক দূর গড়িয়ে যায়। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অনুদার মনোভাব প্রত্যক্ষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার ভয়ে প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ দাবি করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 'আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাথে বোঝাপড়া করে দেখেছি যে, তারা সেই সব রক্ষাকবচ স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, যার দাবী আমরা ত্যাগ করতে পারি কেবলমাত্র নিজস্ব ধারায় জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য দৃঢ় সংকল্প জাতি হিসেবে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার বিনিময়ে।'

বস্তুত, আন্তঃসাম্প্রদায়িক সমঝোতা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তিরহিত হবার পর আল্লামা ইকবাল উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়কে তার স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার রক্ষার জন্য একটা স্থায়ী কর্মসূচী অনুসরণের পরামর্শ দেন। ১৯৩২ সালের ২১ শে মার্চ লাহোরে নিখিল–ভারত মুসলিম সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির বিষয়টিকে হাজির করেন রাজনীতির ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে। বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে তিনি কতিপয় প্রস্তাব রাখেন। যেমনঃ

(এক) সমগ্র দেশব্যাপী মুসলমানদের একটিমাত্র রাজনৈতিক প্লাটফর্ম থাকা প্রয়োজন। নাম যাই হোক না কেন তার গঠনতন্ত্র এমন হতে হবে যাতে যে-কোনো চিন্তাধারাসম্পন্ন দলের ক্ষমতা লাভের ও নিজস্ব আদর্শ ও পদ্ধতি অনুযায়ী জাতির পথ-নির্দেশ করার সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে। তাহলে ভাঙন এড়ানো এবং বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত ও সুশৃঙ্খল করা সম্ভব হবে।

(দুই) এই কেন্দ্রীয় সংস্থার অন্ততপক্ষে ৫০ লাখ টাকার একটা তহবিল থাকতে হবে।

(তিন) এই কেন্দ্রীয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশের অধীনে দেশব্যাপী যুব দল ও স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে হবে। যাদের কাজ হবে সমাজ সেবা, রীতি-নীতির সংস্কার করা, শহরে ও পল্লীতে অর্থনৈতিক প্রচার চালানো এবং ব্যবসা সংক্রান্ত সংগঠন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন। এই পথেই ঈমানের আগুন তারুণ্যের শক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাবে।

(চার) সমস্ত বড় বড় শহরে পুরুষ ও মহিলাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। রাজনীতির সঙ্গে এসব শিক্ষা কেন্দ্রের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। মানব জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইসলাম ইতোমধ্যে কি কি কৃতিত্ব অর্জন করেছে এবং এখনো তার কি কি কৃতিত্ব অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা ধারণা দিয়ে আমাদের তরুণ সমাজের অন্তরের ঘুমন্ত উদ্যমকে সুসংহত করাই হবে তাদের প্রধান কাজ।

আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লামা ইকবাল এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকের পরিস্থিতিকে সামনে রেখে এসব প্রস্তাব রেখেছিলেন। আজকের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তার সব ক'টি প্রস্তাবের সমান উপযোগিতা রয়েছে এমন কথা নিশ্চয় কেউ বলবেন না। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইকবালের প্রস্তাবাবলীর মধ্যে এমন কিছু দিক-নির্দেশনা রয়েছে যা আজও যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। যেমন, রাজনৈতিক সংগঠনের ভেতরে গণতন্ত্র চর্চা সম্পর্কে তার অভিমত, নারী সমাজকে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ এবং যুব সমাজকে সেবামূলক, গঠনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ সেকালের মত আজও সমান গুরুত্ব বহন করে। অতীতের এক সংকট-সন্ধিক্ষণে ইকবাল উপমহাদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি মজবুত করার লক্ষ্যে এসব কার্যক্রম অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে মুসলিম জনগোষ্ঠী আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আত্ম-অধিকার অর্জনে সক্ষম হয়। ইতিহাস বলে, তাঁর পরামর্শ থেকে মুসলমানরা সুফল পেয়েছে, লাভবান হয়েছে।

আজ আমরা যে প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেটা কিছুটা ভিন্নতর। আজ বিশ্বে স্বাধীন মুসলিম দেশের সংখ্যা বেড়েছে। মুসলিম জনসংখ্যা এক শ' ত্রিশ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে পর ১৯৭১ সালে উপমহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র দ্বিতীয়বার পরিবর্তিত হয়েছে। উপমহাদেশের মানচিত্রে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশ মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ রক্ষায় গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারটিকে বাংলাদেশ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ও সহানুভূতিশীল। বিশ্বের যে-কোন প্রান্তের

মুসলিম দলন–পীড়ন ও নিধনের খবর বাংলাদেশের মুসলমানদের করে বিচলিত, ক্ষুব্দ ও প্রতিবাদী। আমাদের বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মুসলিম স্বার্থ–সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে আমাদের সরকার তার মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা সত্যি বুঝি না, আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বসনিয়া–হার্জেগভিনার মতো গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ইস্যুতে কেন নিয়মিতভাবে মতামত রাখে না? বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীরব কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি সরব কূটনৈতিক তৎপরতা থাকতে অসুবিধা কোথায়? জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার মুসলিম উম্মাহর স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে সম্ভাব্য সবকিছু করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম নর–নারীর উপর যে নগ্ন আগ্রাসন ও নিষ্ঠুর অত্যাচার চলছে তা বন্ধের চেষ্টা করবেন, নির্যাতিত মুসলমানদের আঘাত ও বেদনা কমাবার যথাসাধ্য উদ্যোগ নেবেন– তাঁর কাছে এই প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে মুসলিম দেশসমূহের যে–সব বিষয় গুরুত্বসহকারে ভাবতে হবে তা হলোঃ

এক. বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহকে নিজেদের মধ্যকার বিরোধ সঙ্কুচিত করে এমন একটা সমঝোতায় আসতে হবে যাতে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে সকলে একযোগে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। মুসলিম সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘের উপর খুব বেশী নির্ভর করা ঠিক হবে না। ফিলিস্তিন ইস্যু থেকে সর্বসাম্প্রতিক বসনিয়া ইস্যুতে জাতিসংঘের ভূমিকা মুসলিম উম্মাহকে নিরাশ করেছে। তাই শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ওআইসিকে শক্তিশালী করতে হবে। যাতে যে–কোন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ওআইসি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

দুই. যেহেতু বিশ্বে দুর্বলের কোনো বন্ধু নেই, সেহেতু প্রতিটি মুসলিম দেশকে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হবার ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী হতে হবে।

তিন. মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

চার. আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানের চর্চাকে সর্বাদিক গুরুত্ব দিতে হবে। জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে সব ব্যক্তি মৌলিক অবদান রাখতে সক্ষম হবেন তাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য একটা সাধারণ তহবিল গঠন করতে হবে।

পাঁচ. মুসলিম দেশসমূহের অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করার ব্যাপারে একটি সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। আর নারী শিক্ষার উপর সর্বাধিক জোর দিতে হবে।

ছয়. প্রতিটি মুসলিম দেশকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। অন্য ধর্মাবলম্বীরা যাতে নিরাপত্তার অভাব বোধ না করে, তারা যাতে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় এবং তাদের উপর যাতে কোনোভাবে জুলুম–নির্যাতন না হয় সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। মুসিলম দেশসমূহের ইসলামী নীতিমালা এমনভাবে অনুসরণ করতে হবে যাতে অন্য ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের অনুপম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়।

ইকবাল জীবনের শিক্ষা

সাইয়্যেদ মওদূদী

আবদুল ওয়াহিদ অনূদিত

আল্লামা ইকবালের মৃত্যুর পর দিল্লীর জামেয়া মিল্লিয়ার ছাত্রবৃন্দ তাদের মুখপত্র 'জাওহার'–এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এটা পরে 'জাওহারে ইকবাল' শিরোনামে বই আকারে ছাপা হয়। ঐ ইকবাল সংখ্যায় জামেয়ার ছাত্রবৃন্দ ছাড়াও লেখক সূচীতে ছিলেন হাফীজ জালন্ধরী, প্রফেসর সৈয়দ নওয়াব আলী, রশীদ আহমদ সিদ্দিকী, মুহাম্মদ মুজীব, খাজা গোলামুস্ সাইয়্যেদাঈন, সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, মুহাম্মদ আসলাম জীরাজপুরী এবং সাইয়্যেদ মওদূদীর মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলামিস্ট ও বিদ্বজ্জন। সাইয়্যেদ সাহেবের যে প্রবন্ধ 'জাওহার' ইকবাল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো তার তরজমা নিম্নরূপ।

নশ্বর এই ধরণীর উন্মুক্ত মনোহর ময়দান সেই আদিকাল থেকে আধুনিকতার যুগ পর্যন্ত বীর পূজার [Heroworship] দিকে ধাবিত হয়ে আসছে। বড় কোন জিনিসকে দেখে 'হাজা রাব্বী'–এই আমার প্রভু, 'হাজা আকবার' –এটা সর্ববৃহৎ বলার অভ্যাস অনেক আগ থেকেই প্রচলন হয়েছিল–আজও পর্যন্ত তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়নি। যেভাবে দু'হাজার বছর পূর্বে বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের দাবীতে নির্বোধ সৃষ্টিকুল অন্য কোন পন্থা উদ্ভাবন করতে না পেরে বীরের স্বীকারোক্তিতে তার আকৃতি তৈরি করে তারই অর্চনা–পূজা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এমনিভাবেই আজ, বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সবচাইতে জঘন্য দাস প্রথাবিরোধী জাতি (রুশ)– মনন–মেধা লেনিনের মাহাত্মের স্বীকারোক্তির পথ ও পন্থা ছাড়া চিন্তাই করতে পারে না যে, তার ব্যক্তিত্বের বাইরে মানবতার জয়গান কেউ গাইতে পারে।

অবশ্য, মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈ কি। বীর পূজার কল্পনা তাদের মনন–মেধায় অংকিত হয়ে কোনদিকে ঝুঁকে পড়ে না। মুসলমান বড়দের সাথে আচরণের একমাত্র দিকই চিন্তা করতে পারে। আর তা হলোঃ আল্লাহ তাদেরকে জীবন–চলার সঠিক পথ দেখিয়েছেন, যার উপর চলে তারা বুজুর্গীর উচ্চতর মার্গে উপনীত হবে। সে জন্য তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাঁদের ন্যায়ই আমল করা।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সংক্ষিপ্ত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমার দেশের যুবক সম্প্রদায়কে এই দিক–নির্দেশনা দিতে চাই, যে ইকবালের মহত্ত্বের বারতা তাদের হৃদয়ে মোহরাঙ্কিত হয়ে রয়েছে তাঁর জীবন আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়। এটা সবাই জানেন যে, ইকবাল ঐ পাশ্চাত্য শিক্ষাই অর্জন করেছিলেন, যে শিক্ষা আমাদের যুব–সম্প্রদায়ও ইংরেজদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গ্রহণ করছেন। সেই ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন এবং সেই দর্শন শাস্ত্রই তিনি পড়েছেন আর এসব বিষয়েই তিনি কেবল শিক্ষানবিস ছিলেন না, বরং

তিনি উল্লিখিত বিষয়ে বিজ্ঞ বলে খ্যাতিমান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে দর্শনশাস্ত্রে তো তিনি উচ্চতর মার্গে পৌঁছেছিলেন যার স্বীকারোক্তি অধুনাকালের খ্যাতিমান ফিলোসফাররাও করছেন। যে শরাবের দু'চার ঢোক পান করেই অনেক লোক বিপথে চালিত হতে থাকে–মরহুম ইকবাল তো সেই শরাবের মহাসাগরই পান করেছিলেন। আর পাশ্চাত্য সভ্যতা–সংস্কৃতি, কৃষ্টি–কালচারকে তিনি বাহ্যিকভাবে নিরীক্ষণ করেননি। যেমনটি আমাদের শতকরা ৯৯ ভাগ যুবক নিরীক্ষণ করছেন। তিনি সেই সমুদ্রে নেমে প্রতিটি দিকে এতো গভীরে পৌঁছেছেন, যেখানে পৌঁছে আমাদের অধুনাকালের তরুণ যুবক স্বীয় দ্বীন–ধর্ম, সভ্যতা–সংস্কৃতি, তাহজীব–তমদ্দুন এবং জাতীয় রীতি–নীতি বেমালুম শিকেয় তুলে পশ্চাৎগামী হয়ে যান। পাশ্চাত্য প্রভাবে তারা এমনই প্রভাবিত হন যে, মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলার রুচি পর্যন্ত তাদের লোপ পেয়ে যায়।

কিন্তু ঐ ব্যক্তিত্বের অবস্থা কি ছিলো? পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতির মহাসমুদ্রে পা রাখার সময় তিনি সেই মুসলমান ছিলেন, তার মধ্যভাগে গিয়ে তিনি আরো পাক্কা মুসলমানই বনে গেলেন। সমুদ্রের গভীরে যতই সাঁতার কাটছিলেন তিনি ততই খাঁটি মুসলমানরূপেই নিরূপিত হয়েছেন। এমনকি সমুদ্রের গভীরে যখন পৌঁছেন তখন বিশ্ব দেখেছিল তিনি কুরআনের মধ্যেই ডুবে গেলেন। আর যা–ই চিন্তা করতেন কুরআনের নিরিখেই তার বাস্তবায়ন করতেন। যা–ই নিরীক্ষণ করতেন, কুরআনের নিরিখেই নিরীক্ষণ করতেন। হাকীকত এবং কুরআন তাঁর দৃষ্টিতে ছিলো একই বস্তু। আর এই এক বস্তুর মধ্যেই তিনি এমনিভাবে ফানা হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর সমসাময়িক ওলামায়ে দ্বীনের মধ্যেও এমন কোন ব্যক্তিত্ব আমি দেখছি না যিনি 'কুরআনের মধ্যে বিলীন' হবার ক্ষেত্রে এই দর্শনের ইমাম, এই এম·এ, পিএইচডি, বার এটল' কে উতরে গেছেন। অল্পসংখ্যক লোকই এটা জানেন যে, জীবনের শেষ দিনগুলোতে ইকবাল কুরআন ব্যতীত সমুদয় বই পৃথক করে নিয়েছিলেন। একমাত্র কুরআন ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বই–ই তিনি সামনে রাখতেন না। বছরের পর বছর জ্ঞান–বিজ্ঞানের মধ্যে ডুবে থাকার পর চূড়ান্ত যে মার্গে পৌঁছেছিলেন তা হলো মূল জ্ঞান, কুরআন। আর অমূল্য এ সম্পদ যার হাতে আসবে সে দুনিয়ার অন্য সব কিতাব হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

একবার ইকবালের কাছে এক ব্যক্তি দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন করে উত্তরের প্রত্যাশা করেছিলেন যে, এখন আল্লামা তাঁর লাইব্রেবীর আলমিরা খোলাবেন এবং বড় বড় বই বের করিয়ে উদ্দিষ্ট প্রশ্নাবলীর উত্তর তালাশ করবেন। কিন্তু তারা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন যে, লাইব্রেরীর আলমিরাগুলোতে সেই তালাই লাগানো থাকলো, তিনি শুধু কুরআনুল কারীম হাতে নিয়েই জবাব লিখতে বসে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম–এর উপর তাঁর আকীদা–বিশ্বাসের বিষয়টি তো অনেকেরই জানা। সম্ভবত এটা কেউই জানেন না যে, তিনি তাঁর সম্পূর্ণ দর্শন এবং সমুদয় চিন্তা–চেতনাকে রাসূলে আরাবীর পবিত্র চরণে ক্ষুদ্র সম্পদ হিসেবেই উপঢৌকন স্বরূপ রেখে দিয়েছেন। হাদীসের যে সব দিকে শুধুমাত্র শিক্ষানবিসই নয়; লব্ধপ্রতিষ্ঠ আরবী শিক্ষাবিদও কান খাড়া করেন, বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে থাকেন এই ডঃ অফ ফিলোসফি হাদীসের নির্ভেজাল শাব্দিক ব্যাখ্যার উপরই ঈমান রাখতেন আর এ ধরনের কোন হাদীস শ্রবণ করার পর এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হতো না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁর (ইকবালের)

সামনে অতি বিস্ময়করভাবে ঐ হাদীস খানা উল্লেখ করেন, যাতে এই বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলে করীম তিনজন সাহাবীর সাথে ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করছিলেন। এ সময় ওহোদ পাহাড় কাঁপতে লাগলো। রাসূল (সঃ) পাহাড়কে নির্দেশ দিলেনঃ 'স্থির হয়ে যাও। তোমার উপর একজন নবী, একজন ছিদ্দীক এবং দু'জন শহীদ আরোহণ করেছেন। একথা শুনেই পাহাড় থেমে গেল।' হাদীসখানা শুনেই ইকবাল বললেনঃ 'এতে আশ্চর্য হবার এমন কী আছে। আমি একে রূপক বা অবাস্তব কিছুই মনে করছি না; বরং একে নিরেট বাস্তব বলেই মনে করছি। এ ঘটনাকে মেনে নেয়ার জন্যে আমার কোন ব্যাখ্যা-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তোমার কাছে মহাসত্যের সন্ধান যদি থাকতো, তা হলে তুমি বুঝতে পারতে কিভাবে একজন নবীর পবিত্র পদতলে এসে বড় বড় পাহাড়ের চূড়া প্রকম্পিত হয়ে যেতো, এ কম্পন রূপক কম্পন আদৌ নয়, বাস্তব ঘটনা বৈ কি।'

ইসলামী শরীয়তের যে সব আহকামকে অনেক স্বচ্ছ ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত ও পচনযুক্ত কানুন বলে মনে করেন, আর যে সব কানুনের বিশ্বাস করা তাদের নিকট এক ধরনের অন্ধকারে ডুবে থাকার শামিল যে, সভ্য সমাজে এর সাহায্য করা একজন শিক্ষিতের জন্য ডুবে মৃত্যুবরণ করার চাইতেও নিকৃষ্টতর। ইকবাল শুধু সেগুলোই মানতেন না এবং সেগুলোর উপরই আমল করতেন না; বরং প্রকাশ্যভাবে এগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আর কারো সামনে এগুলো সহায়তা করার ব্যাপারে তার ভয়-ভীতি ছিলো না। এর সাধারণ একটি উপমা শুনুন। একবার ভারতীয় গভর্নমেন্ট তাঁকে স্বীয় এজেন্ট করে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে এ প্রস্তাব দেয়াও হয়েছিলো, কিন্তু সাথে একটি শর্ত ছিলো এই যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে পর্দা করাতে পারবেন না। আর বক্তৃতার সময় লেডী ইকবালকে সাথে নিয়ে শরীক হতে হবে। ইকবাল সংশ্লিষ্ট শর্তসম্বলিত এই পদ গ্রহণ করার কথা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি স্বয়ং লর্ড ওলংডনকে বলেছিলেনঃ নিঃসন্দেহে আমি একজন গুনাহগার মানুষ, ইসলামী হুকুম-আহকাম পালনের ব্যাপারে অনেক অলসতাই আমার হয়ে থাকে, কিন্তু এ লাঞ্ছনা তো গ্রহণ করতে পারি না যে, আপনার নগণ্য পদ-পদবী গ্রহণ করার লোভে শরীয়তের হুকুমকে ছিন্ন করবো।

ইকবালের সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণার বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছে যে, তিনি শুধু আকীদার দিক থেকেই মুসলমান ছিলেন। আমলের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিলো না। এই ভুল ধারণা সৃষ্টির পেছনে তাঁর প্রকৃতিগত কিছু উপাদানও দায়ী। এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে ছিদ্রান্বেষীদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। আর ইকবাল নিজের বিরূপ সমালোচনায় তৃপ্তিও পেতেন। অবশ্য বাস্তবে তিনি আমলবিমুখ ছিলেন না।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে ছিলো তাঁর গভীর অনুরাগ। ফজরের সময়ে নামাজের পর পাক কালাম তেলাওয়াতে নিবিষ্ট হয়ে যেতেন। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে এসে স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে তিলাওয়াতের সময় অবিরত কান্নার ভারে তাঁর হিচকি বন্ধ হয়ে যেতো, তিনি তিলাওয়াতে আর এগুতে পারতেন না। নামাজও পড়তেন তিনি গভীর অভিনিবেশের সাথে। নীরব পরিবেশে। কিন্তু সাধারণ্যের মধ্যে রটে গিয়েছিলো 'কথার গাজী বলে।'

তাঁর সাদামাটা জীবন মান এবং তবীয়তের অবস্থা তাঁর ইন্তেকালের পর পরই মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এর আগে স্বাভাবিক ধারণা ছিলো যে, 'স্যার' সাহেব আর পাঁচজন যেমন ঠিক ইকবাল তদ্রূপই হবেন। আর এর উপর ভিত্তি করে অনেকে বিচার-বিশ্লেষণ না করেই লিখেও ছিলেন যে, আল্লাহর দরবারে তাঁর ক্ষমা কিভাবে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো এই ব্যক্তিত্ব মানুষের ধারণার বাইরে রিক্ত নিঃস্ব ও সাদাসিদা জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। যেমনটি তাঁর ইন্তেকালের পর মানুষ খবরের কাগজে বর্ণনা করেছেন।

একদিনের কাহিনী শুনুন। এর দ্বারা এ নাইট এবং ব্যারিস্টারের তবীয়ত সম্পর্কে আপনারা ধারণা করতে পারবেন। পাঞ্জাবের এক বিত্তশালী জমিদার একটি আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য ইকবাল ও স্যার ফজল হোসাইন মরহুমসহ আরো দু'জন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞকে তাঁর বাসায় আমন্ত্রণ জানান। আর তাঁর বিলাসবহুল প্রাসাদে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করেন। রাত্রে ইকবাল নির্ধারিত রুমে বিশ্রাম করতে গিয়ে চারদিকে বিলাস সামগ্রী দেখে এবং তাঁর পীঠের নীচে দামী নরম বিছানা পেয়ে সাথে সাথেই মনে মনে ভাবলেন, যেই রাসূলে পাক (সঃ)-এর জুতোর ছদকায় আজ আমাদের এই মর্যাদা নছীব হয়েছে। তিনি তো খেজুর পাতার উপর শুয়ে-বসেই জীবনাবসান ঘটিয়েছেন। এ চিন্তা করতে করতে তাঁর নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। ঐ বিছানায় শোয়া তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে গেলো। তিনি উঠে বসলেন এবং সামনের গোসলখানায় গিয়ে একটি চেয়ারে বসে পড়ে অবিরত কান্না আরম্ভ করলেন। কাঁদতে কাঁদতে মন কিছুটা হালকা হলে স্বীয় ভৃত্যকে ডেকে তাঁর লাগেজ খোলালেন এবং একটি চৌকি ঐ গোসলখানায় বিছিয়ে যতদিন পর্যন্ত ওখানে ছিলেন ঐ গোসল খানাতেই তিনি শুতেন। এটা মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বেকার ঘটনা। যখন বাইরের দুনিয়ায় তাঁকে স্যুট-বুটে সচরাচর দেখা যেতো, কেউ জানতোই না যে, ঐ স্যুটের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব লুকায়িত রয়েছে তার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব স্বরূপ কি? তিনি ঐ সব মানব দরদীর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না, যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সাদাসিধা এবং ফকীরী জীবন যাপনের ঘোষণা দিতো। আর সোশালিস্ট সেজে গরীব-নিঃস্বদের দুঃখে দুঃখী হবার গালভরা বুলি আওড়াতো, কিন্তু জনগণের দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে তাদের জীবন যাপন হয়ে উঠতো বাদশাহী এবং অভিলাষী।

ইকবালের নাইটবুড এবং স্যার সফী মরহুমের ন্যায় ব্যক্তিত্বের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক দেখে সাধারণ্যে এই ধারণা ছিলো আর এখনো বিদ্যমান যে, তিনি কবিতা রচনাতেই শুধু স্বাধীন ছিলেন আমলী জীবনে স্বাধিকার তাঁকে ঘেঁষতেও পারেনি, অধিকন্তু তিনি ছিলেন ইংরেজদের দাস। কিন্তু প্রকৃত সত্য ছিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা তাঁর সাহচর্যে ছিলেন, ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর যারা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে জানেন তাঁরা অবশ্যই জ্ঞাত যে, বৃটিশ রাজনীতি হতে তাঁর চিন্তাধারা এবং আমল দুটোই কঠোর বিরোধী। শাসনযন্ত্র হতে তিনি ছিলেন অতি অতি দূরে। সরকার এবং তার চাটুকার উভয়ই তাঁকে দেখতো বাঁকা চোখে। আর তাঁর ব্যক্তিত্বকে তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায়ই ধরে নিয়েছিলো।

রাজনীতিতে তাঁর চিন্তা-ধারাই শুধু স্বাধীন ছিলো না বরং তিনি স্বাধীন হিন্দুস্তানে দারুল ইসলামকে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। এ জন্যই তিনি এমন কোন

পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না, যা একটি দারুল কুফরকে আরেকটি দারুল কুফর–এ বদলে দেবে মাত্র।

শুধুমাত্র এ কারণেই তিনি রাজনীতির মাঠে ওসব লোকের সাথে বাধ্য হয়ে সহায়তা করেছেন যারা বৃটিশ–রাজ্যের ছায়াতলে হিন্দু–রাজ্যের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করছিলো। সে যা–ই হোক, উদ্দেশ্যের নিরিখে তাঁর মধ্যে এবং এ তবকার মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না তবে হ্যাঁ, এই বিবেচনায় তাঁকে এই দলের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন যে, যত সময় পর্যন্ত মুসলমান যুবকদের মধ্যে দারুল ইসলাম–এর একটি স্ফুলিঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলে না উঠবে, আর যুব সম্প্রদায় যতক্ষণ না এ ত্যাগ–তিতিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যূন বিষয়ের ধারা বিপরীত দিকে ধাবিত করার চাইতে এ ধারাকে ধরে রাখা যায়। এ কারণেই তিনি একদিকে তাঁর কবিতার দ্বারা মুসলিম যুবকদের অন্তরে এই রূহ ফোঁকার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, যে ব্যাপারে সবাই সম্যক ওয়াকিফহাল। অন্যদিকে রাজনীতির বাস্তব ময়দানে এই পথ অবলম্বন করেছেন যার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য হতে কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব ব্যতীত কেউ ওয়াকিফহাল নন। আর এর বাহ্যিক দিকের নিরিখে তিনি স্বয়ং অতি আপনজনেরও তিরস্কার পর্যন্ত শুনেছিলেন।

আল্লামা ইকবাল ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড প্রসঙ্গে

হোসেন মাহমুদ

ভাষার ভিন্নতা সত্ত্বেও ইকবালের সাথে আমাদের একটি নিবিড় সম্পর্ক রচিত হয়েছে দীর্ঘকাল আগেই। প্রাচীন আরবী কবি ইমরুল কায়েস যেমন আমাদের কাছে সমাদৃত, যেমন সমাদৃত ফারসী কবি ওমর খৈয়াম, ইংরেজ কবি শেক্সপীয়র, ফরাসী কবি শার্ল বোদলেয়ার, ইকবাল আমাদের কাছে সে রকম তো বটেই, বরঞ্চ আরো বেশিভাবে সমাদৃত। এর কারণ ইকবাল শুধু একজন কবি নন, তিনি একজন দার্শনিক এবং দূরদর্শী উম্মাহ্ দরদী মনীষী ব্যক্তিত্বও বটে। ফলে ভিন্নভাষী অন্য যে কোন কবির সাথে অতি সহজেই ইকবালের পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়। মুহাম্মদ ইকবাল সেই ব্যক্তিত্ব যাঁর হৃদযন্ত্রের ওঠা-নামার সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধন সূচিত হয়েছিল উম্মাহ্র উত্থান এবং পতনের। অথচ বিশেষ কোন দেশ-কাল-জাতির মধ্যে ইকবালকে সীমিত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ইকবাল তাঁর দর্শন, মানব প্রেম, উম্মাহ্প্রীতি, স্বধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্ব নিয়ে আজো অনন্য এবং আকর্ষণীয় হয়ে আছেন।

বলা দরকার, এক সময় পাকিস্তান নামক এক রোমান্টিক ধারণা বাস্তবে রূপ নিলে আমরাও তার সাথে শরীক হয়েছিলাম। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত দিনগুলোতে ইকবাল ছিলেন আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্ত চিন্তা ও চিত্তবৃত্তির প্রসার ঘটলেও প্রকারান্তরে তার সীমাবদ্ধতাও প্রকটিত হয়ে ওঠে। এর উদাহরণ ইকবাল। দুঃখজনক হলেও সত্য, কোন সংগত কারণ ছাড়াই বাংলাদেশে ইকবালকে বর্জন করা হয়। এতে কার কি স্বার্থ ছিল তা বলা মুশকিল। তবে ইকবালকে স্মরণ না করে, তাঁর দর্শন ও সাহিত্যকে বর্জন করে জাতি হিসেবে আমাদের কোন লাভ যে হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, '৭২ থেকে '৮০ পর্যন্ত বাংলাদেশে ইকবাল চর্চার তেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তি-প্রয়াস দেখা যায়নি। তাই জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকীতে অনুষ্ঠান আয়োজন বা লেখা-লেখির মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ করার উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বলা যায়, ইকবাল এ সময় প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলেন।

উল্লেখ্য, বাংলাভাষায় ইকবাল বহু পূর্বেই সমাদৃত হয়েছিলেন। আমাদের বরেণ্য লেখক ও কবিদের অনেকেরই মুগ্ধ চৈতন্যে আমরা ইকবালকে স্থাপিত দেখেছি। গোলাম মোস্তফা, আশরাফ আলী খান, মোহাম্মদ সুলতান, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, মনির উদ্দিন ইউসুফ, সৈয়দ আবদুল মান্নান, সিকান্দার আবু জাফর, আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, মীজানুর রহমান, আবদুস সাত্তার প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ ইকবালের বহু রচনার সৌরভ-সুষমা আমাদের উপহার দিয়েছেন। অন্যদিকে ইকবালের জীবন, সাহিত্য ও দর্শনকে ডালি ভরে হাজির করেছেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক অজিত গুহ, বে-নজীর আহমদ, অধ্যাপক গোলাম রসূল, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক,

অধ্যাপক আবুল ফজল, মুহম্মদ আবদুল হাই, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজিবর রহমান খাঁ, ডঃ হাসান জামান, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বর্মন, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌, ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব প্রমুখ।

স্মরণ করতে হয়, উপমহাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ শতকের শুরুর দিকে মুসলিম নব–জাগরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এরই এক পর্যায়ে ইকবালের সাথে বাংলাদেশের বাংলা ভাষা–ভাষী পাঠকের সংযোগ স্থাপিত হয়। মূলত ত্রিশের দশকের যুগ–সন্ধিক্ষণে বাংলা ভাষায় ইকবাল সাহিত্যের অধ্যয়ন ও চর্চা শুরু। ভিন্ন ভাষার মহাকবি, ইসলামী পুনর্জাগরণের এই অগ্রণী মুখপাত্র তখনি আমাদের চেতনায় তাঁর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর কাব্য ও দর্শনের সুরভি ছড়িয়ে পড়ে হৃদয়ে হৃদয়ে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ইকবাল চর্চার ধারাটি সতত প্রবহমান।

স্বাধীন বাংলাদেশে ইকবাল চর্চার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে প্রথম এগিয়ে আসে 'আল্লামা ইকবল সংসদ'। ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর সেমিনার, আলোচনা সভা আয়োজন, স্মরণিকা–সংকলন ও ত্রৈমাসিক 'আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা' প্রকাশের মধ্যদিয়ে সংসদ বাংলাদেশে ইকবাল চর্চার ক্ষেত্রে নন্দিত ভূমিকা পালন করে আসছে। ইকবাল চর্চার ক্ষেত্রে আল্লামা ইকবাল সংসদের সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য কাজ হল 'আল্লামা ইকবাল' শীর্ষক সংকলন সিরিজ প্রকাশ। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সংসদ প্রতি বছর একটি হিসেবে মোট ৪টি সংকলন প্রকাশ করেছে। ইকবালের দর্শন, সাহিত্য, চিন্তাধারা ও ইকবাল প্রতিভার বহুমুখী মূল্যায়ন ভিত্তিক বিভিন্ন লেখকের রচিত বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধ সংকলনগুলোতে স্থান পেয়েছে। ইকবালকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে এ সংকলনগুলো অত্যন্ত সহায়ক।

সংকলনের প্রথম খণ্ডে ১৪টি মৌলিক প্রবন্ধ, ২টি অনুবাদ প্রবন্ধ, ইকবাল রচনার অনুবাদ ২টি, ৩টি পুনর্মুদ্রিত লেখা, দু'জন বিশিষ্ট কবি ব্যক্তিত্বের সাক্ষাতকার, ২টি ইংরেজী প্রবন্ধ, সংসদের রিপোর্ট ও পুস্তক সমালোচনা রয়েছে। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন, আবদুল মান্নান তালিব, প্রফেসর আঃ আজিজ উল্যাহ, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, প্রফেসর এ এফ এম হোসাইন আহমদ, সৈয়দ তোসারফ আলী, ফারুক মাহমুদ, ফররুখ আহমদ, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌ প্রমুখ।

দ্বিতীয় খণ্ডে ১৪টি মৌলিক প্রবন্ধ, ৩টি অনুবাদ প্রবন্ধ, ৫টি পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ, ৩টি অনুবাদ ও ২টি ইংরেজী প্রবন্ধ রয়েছে। লেখক সূচীতে রয়েছেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ডঃ আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, আব্বাস আলী খান, আবদুল মান্নান তালিব, প্রফেসর এ এফ এম হোসাইন আহমদ, সৈয়দ তোসারফ আলী, আবদুল ওয়াহিদ, ছালেহ আহমাদ, ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ, হাসনাইন ইমতিয়াজ,. মতিউর রহমান মল্লিক, মনির উদ্দীন ইউসুফ, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন প্রমুখ।

তৃতীয় খণ্ডে মৌলিক প্রবন্ধ রয়েছে ৭টি, ৫টি অনুবাদ প্রবন্ধ, ৪টি পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ, ৭টি ইংরেজী প্রবন্ধ। এতে লিখেছেনঃ আহমদ নাদিম কাসিমীর মূল ইংরেজী লেখার অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক আবদুল গফুর, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, জুলফিকার আহমদ কিসমতী,

ফাহমিদ-উর-রহমান, মোজ্জাম্মেলুল হক, গোলাম মোস্তফা, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, প্রফেসর নাজির সিদ্দিকী, মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ডঃ ওহীদ ইশরাত, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন প্রমুখ।

চতুর্থ খন্ডে (প্রকাশকাল নভেম্বর '৯২) মৌলিক প্রবন্ধ রয়েছে ৯টি, ইকবালের কবিতার অনুবাদ ১০টি, অনুবাদ প্রবন্ধ ৩টি, সেমিনার প্রবন্ধ ২টি, ব্যক্তিত্ব ১টি, ভাষণ ১টি, ইংরেজী প্রবন্ধ ৩টি এবং রিপোর্ট ৩টি। এ খন্ডে লিখেছেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, শাহেদ আলী, আবদুল মান্নান তালিব, ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুহিউদ্দীন খান, জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রফেসর এ এফ এম হোসাইন আহমদ, শেখ দরবার আলম, সৈয়দ তোসারফ আলী, ফাহমিদ-উর-রহমান, এ কে এম মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ মোরশেদ আলী, আবু খালেদ, মোহাম্মদ রুহুল আমীন, শরীফুল মুজাহিদ, আনোয়ারুল হক, মোজ্জাম্মেলুল হক, ছালেহ আহমাদ, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন, আনওয়ার কামাল, মাহমুদ বায়াত, হাসান মাহমুদ ও কামরুল ইসলাম হুমায়ুন।

বলা প্রয়োজন যে প্রবন্ধ, অনুবাদ প্রবন্ধ ও পুনর্মুদ্রণ লেখাগুলোতে ইকবাল প্রতিভার বহু বিচিত্র দিকের পরিচয় ও মূল্যায়ন পরিলক্ষিত। এ সব লেখা থেকে কেন আজও আমাদের ইকবাল চর্চার প্রয়োজন, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলে।

ইকবাল কবি, দার্শনিক, জ্ঞানী, দূরদর্শী। উপমহাদেশের স্বাধীনতায় তাঁর ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। সব মিলিয়ে দেখা যায়, ইকবাল একাধারে পাকিস্তানের, উপমহাদেশের, মুসলমানদের, সর্ব মানুষের, সারা বিশ্বের। কোন ক্ষুদ্রতর গন্ডিতেই তিনি আবদ্ধ বা আবদ্ধযোগ্য নন। সারা জাহানই তাঁর, তিনিও সারা জাহানের। একশ্রেণীর সংকীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ছাড়া ইকবালের এ সার্বজনীনতার, সত্যের ভাবমূর্তি খণ্ডনের প্রয়োজন সম্ভবত কারো হবে না।

আমাদের এ দৈন্যপীড়িত সময় ও অবক্ষয় কবলিত সমাজে ইকবাল চর্চা ও অধ্যয়নের মহতী প্রয়াসে 'আল্লামা ইকবাল সংসদ' যে আয়াসসাধ্য ধারা বহমান রেখেছে, সে জন্যে সংসদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে সর্বান্তকরণে মোবারকবাদ পাবার যোগ্য। সংসদের প্রয়াস ইতিমধ্যেই উদাহরণযোগ্য নজীর স্থাপন করেছে। এ প্রয়াস আরো সংহত, বেগবান ও ফলপ্রসূ হোক এ-ই আমাদের কামনা।

সংকলনগুলোতে মুদ্রণজনিত ত্রুটির সাথে অপরাপর সামান্য কিছু ত্রুটিও চোখে পড়ে। যেমন প্রথম ও চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশকাল থাকলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে নেই। অন্যদিকে ইকবাল সংক্রান্ত সংকলনে ব্যক্তিত্ব কলামে অন্য ব্যক্তিদের উপস্থাপন না করলেই যেন ভাল হত। তবে যাঁরা ইকবাল সম্পর্কে বিশেষভাবে লেখা-লেখি করেছেন, এরকম ব্যক্তিদের এ কলামে আনা যেতে পারে।

এ সংকলনগুলো প্রকাশের জন্যে 'আল্লামা ইকবাল সংসদ' ও সংশ্লিষ্টদের সপ্রশংস অভিনন্দন জানাই। ভবিষ্যতে আরো সমৃদ্ধ ও সুন্দর সংকলন আমরা হাতে পাব, এ আশা করি।

বিশ্ব সভ্যতায় ইকবালের অবদান

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

বিশ্ব সভ্যতা এমন এক অবিচ্ছিন্ন বিষয় যে, তার অন্তর্গত দেশসমূহে পাহাড়, পর্বত, সাগর, জঙ্গল যা-ই থাক না কেন–তাতে এক ধারাবাহিকতা রয়েছে। সুদূর অতীতের ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত মিসরীয় লোকদের ধ্যান–ধারণার ছবি কোন না কোন সূত্রে যেমন চীন দেশে পৌছেছে, তেমনি ব্যাবিলনের বা গ্রীসের চিন্তাধারাও নানাভাবে বিকৃত হয়ে আমাদের এ উপমহাদেশে এসেছে। এতে প্রাকৃতিক কোন বিঘ্ন–প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেনি। এখানেই জ্ঞান–বিজ্ঞানের নানাবিধ ধারণার রয়েছে অভিযাত্রা (Adventure)। এ জন্য যখনই কোনো এক ধারণার মধ্যে বিকৃতি দেখা দেয়, তখন সে বিকৃতি কোনো এক দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার ফল সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে।

এ বিশ্বে স্রষ্টার ধারণা সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। কারণ পুরাকালের গ্রীকদের বা ভারতীয় আর্যদের ধারণায় এ পৃথিবী বা জড় জগত সৃষ্ট নয়। আদি থেকে তা বর্তমান এবং তার কেণ কল নেই। প্লেটো বা এ্যারিষ্টটল জড়কে কারো সৃষ্টবস্তু বলে ধারণা করেননি–অবর্ণনীয়, অনমনীয়, আকারবিহীন আদি বিষয় বলে গণ্য করেছেন। ভারতীয় দর্শনের আস্তিক্যবাদীদের মতানুসারে যেমন, তেমনি নাস্তিক্যবাদীদের দর্শনেও জড়পদার্থ অনাদি ও ধ্বংসের অতীত। বৈশেষিক দর্শনে 'ঈশ্বর'কে পরমাণুর নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, স্রষ্টা হিসাবে নয়। উপনিষদের ভাষ্য প্রসঙ্গে বৈদান্তিকগণ জড় জগতকে ব্রহ্মের মায়াপ্রসূত রূপ বলে ধারণা করেছেন, তাকে ব্রহ্মের শূন্য থেকে সৃষ্টি বলে ধারণা করেননি।

গ্রীক দর্শনের অপর বিশেষত্ব হচ্ছেঃ তাতে এ বিশ্বের আদিসত্তাকে ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন কোন সত্তা বলে ধারণা করা হয়নি। তাকে কোন কোন স্থলে আদি মঙ্গলময় সত্তারূপে, আবার কোথাও বা আদি সঞ্চালকরূপে ধারণা করা হয়েছে। প্লেটোর মঙ্গলময় ধারণা (Idea of the Good) এবং এ্যারিষ্টটলের আদি সঞ্চালক (The Prime Mover) মননশক্তিসম্পন্ন সত্তা। তাতে ইচ্ছার (will) কোন লক্ষণ নেই। তেমনি বৈদান্তিক দর্শনে পরম ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দম বা মদত চিত্তে আনন্দস্বরূপ বলে ধারণা করলেও তাতে ইচ্ছা শক্তির কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না।

প্রকৃতপক্ষে সেমেটিক চিন্তাধারা থেকেই এ গুরুত্ব প্রবর্তিত হয়েছে। সেমেটিক চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নরূপ পাওয়া যায় হযরত ইব্রাহীম নবীর (আঃ) আল্লাহ সংক্রান্ত ধারণা থেকে। আল্লাহকে তিনি সর্বশক্তিমান, প্রতিপালক, স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলে ধারণা করেন। তাঁর আহবানে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। পরবর্তীকালে হযরত মূসা নবীর (আঃ)–এর ধারণাতে এ আল্লাহ আবির্ভূত হয়েছেন এক সর্বশক্তিমান বিচারকরূপে। তিনি বিচারক হিসেবে কাউকে ক্ষমা করেন না। তাঁর কাছে উপর–নীচ, ধনী–দরিদ্র বলতে কোন ভেদ নেই। এ চিন্তাধারাই ক্রমবিকাশের

ফলে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের মধ্যে প্রেমের সন্ধান পায়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিকরূপে বিশ্বের সকলের প্রতিই স্নেহপরায়ণ। তাঁর চরিত্রের মধ্যে ক্ষমাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। হযরত ঈসা (আঃ) প্রতিশোধ গ্রহণকে তাঁর ধর্মে কোন স্থান দেন না। এ ধারণাগুলোর মধ্যে যেসব প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তারই পরিণতিতে এ বিশ্বে ইসলামের আবির্ভাব হয়। ন্যায় বিচার, প্রেম, দয়া–মায়া প্রভৃতি নৈতিক আদর্শের অনুশীলন সমাজ জীবনের ঐক্য রক্ষার জন্য অবশ্য পালনীয়। তবে শুধু এ সব ধারণার আলোকেই সমাজ–জীবন পরিচালিত হতে পারে না। তার জন্য চাই আরো নানাবিধ গুণাবলী, যেগুলোর রূপায়ণ ব্যতীত সমাজ জীবনের স্থিতি ও প্রগতি কিছুতেই সম্ভবপর নয়। ইসলাম তাই আল্লাহর গুণাবলী হিসেবে এগুলো ছাড়া আরো অনেক গুণ স্বীকার করে নিয়েছে। সর্বোপরি আল্লাহকে এক সর্বশক্তিমান ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন অস্তিত্ব বলে ধারণা করেছে। তাতে একদিকে সমাজ জীবনের মঙ্গলের জন্য যতগুলো আদর্শের স্বীকৃতির প্রয়োজন, তা যেমন গৃহীত হয়েছে, তেমনি আল্লাহকে মালিক বা সার্বভৌম বলে গ্রহণ করার ফলে, সমাজ জীবনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানেরও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। এজন্য ইতিহাসের আলোচনা করলে দেখা যায়, এ জাতীয় ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই মুসলিমরা এক মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

তবে তাদের এ গৌরব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। আশেপাশের নানা দেশ জয় করে, তারা মুসলিম সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করেছে সত্যি, তবে এ বিস্তৃতির সংগে সংগে আল্লাহর মৌলিক ধারণার সংগে দ্বন্দ্ব–মুখীন বিপরীত ধারণাগুলোও আত্মস্থ করে তাদের জীবনে আবার পতনের সূচনা করেছে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সম্বন্ধীয় এরূপ ধারণা শুধুমাত্র মুসলিম জীবনের জন্যই প্রয়োজনীয় ছিল না, এ ধারণা ছিল বিশ্বের সকল মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিলে, এ বিশ্বের সম্পদের উপর সকল মানুষের সম–অধিকারের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ফলে এতে কোন ব্যক্তি, গোত্র, জাতি বা রাষ্ট্রের মালিকানা থাকে না। সকল মানুষের সম–অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের কোন অবকাশ থাকে না। এরূপ বিরাট প্রতিশ্রুতিশীল একটা ধারণা সর্বপ্রথমে গ্রীক চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে ক্রমশঃ তার স্বকীয়ত্ব হারিয়ে ফেলে। সর্বশক্তিমান সর্বকল্যাণময় ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন এক তেজোদীপ্ত সার্বভৌম শক্তির স্থলে পূর্বোল্লেখিত মঙ্গলময়ের ধারণা (Idea of the good) এবং আদি সঞ্চালকের ধারণা (Prime mover) ক্রমশঃ মুসলিম জীবনে প্রভাব বিস্তার করে।

এতে একদিকে আল্লাহর ধারণাতে স্থানুত্ব দেখা দেয়। প্রতি মুহূর্তে তার যে কর্মচঞ্চলতা ও সৃষ্টিকুশলতা দেখা দিচ্ছে, যাকে পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে – কুল্লু ইয়াওমিন হুয়া ফি শান–রোজ তিনি চিরন্তন সৃষ্টিতে নিরত–তাতেও যেমন স্থবিরতা দেখা দেয়, তেমনি তার প্রতিক্রিয়ায় মানব জীবনেও কর্ম–বিমুখীনতার ভাব দেখা দেয়।

শুধু মুসলিমরাই গ্রীক চিন্তার প্রভাবের ফলে দিশাহারা হয়নি। গ্রীক চিন্তাধারার প্রভাবের ফলে খ্রীষ্টান সমাজে গডের যে ধারণা দেখা দেয় – তার ফলে খৃষ্টীয় সমাজে সর্বেশ্বরবাদ বা (Pantheism)-এর উৎপত্তি হয়। অধ্যাপক আলেসান্দ্রোবৌসানী সত্যিই বলেছেনঃ 'আল্লাহর ব্যক্তিসত্তার সেমেটিক ধারণা যা ইউরোপীয় চিন্তাকে বিভিন্ন ধারায় চালিত করতে পারতো,

এবং যা খৃষ্ট ধর্মের সংগে উদ্ভূত হয়ে হেগেনীয় সংস্কৃতি থেকে পাওয়া ধারণার আলোকে ব্যাখ্যাত হয়ে অতি প্রাচীনকালেই বিকৃত হয়, এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর করুণাময় পিতারূপে ঐশী শক্তির অবতাররূপে গ্রীক পরম পুরুষে রূপান্তরিত হয়।

সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস (মৃত্যু ১৪৭৪ খৃঃ) আরস্ত দর্শনকে খৃষ্টীয় ধর্ম দর্শনরূপে গ্রহণ করেন এবং তখন থেকে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সরকারী (official) দর্শনরূপে তা চলে আসছে। এমন কি ত্রয়োদশ পোপ লিও (১৮৭৮–১৯০৩ খৃঃ) তা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করেন।—— 'শামীয় বাইবেল বিরোধী বিভিন্ন ধারার দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রোটেসটানট মত বাছাই বোধ হয় গ্রীক চিন্তাধারার উপর বেশী মুখোমুখি আক্রমণ। এতে সুফল পাওয়া গেছে। গুণবান ও সজীব আল্লাহ'র দর্শনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা আবার মানব হৃদয়ে কর্মোদ্যম দান করে এবং তথাকথিত আধুনিক জগতের পত্তন হয়। কিন্তু নিউ টেস্টামেন্টস্থিত গ্রীক চিন্তাধারার বীজ [অর্থাৎ সেন্টপলের বাণী ও চতুর্থ গস্‌পেল] গোড়া প্রটেসট্যান্টের ব্যক্তিগত প্রায়শ্চিত্তের ধারণাধীন রেখে তাদের মধ্যে সংকীর্ণ মানসিক অসহিষ্ণুতার জন্ম দেয়, আর অপরদিকে উদার মতবাদীরা সে যুগে প্রচলিত দর্শনের অনুসরণে অধিকমাত্রায় যুক্তিবাদী হয়ে উঠে। এদের মতবাদ এখন প্রধানত হেগেলীয় দর্শনভিত্তিক। হেগেল দর্শন বুদ্ধিলব্ধ সর্বেশ্বরবাদের সুসংবাদ ও নিখুঁত রূপের অন্যতম। তা থেকেই জন্ম নিয়েছে আধুনিক নিরপেক্ষ ভাববাদ [Absalute Meousm] যা সর্ববস্তুকে এক ভাবরূপে লীন করে দেয়। যার যুক্তিনির্ভর মীমাংসা দিয়েছেন ইতালীয় দার্শনিক জিয়োভানো জেন্টিলী [মৃত্যু ১৯৫৩] এবং তা থেকেই জন্ম নিয়েছে মার্কসবাদ।*

ইকবালের কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি দীর্ঘকালের সর্বেশ্বরবাদী চিন্তাধারার স্তূপের মধ্যে থেকে ইসলাম প্রচারিত আল্লাহর ধারণাকে উদ্ধার করে তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। স্থানু সর্বেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন আশারিয়া অণুতত্ত্ববাদ (atomism) আলোচনায় তিনি স্পষ্টভাষায় কুরআন-উল করীমে বর্ণিত আল্লাহর স্বরূপের বর্ণনা করে তার অবিরাম ও অনন্ত সৃষ্টিকুশলতা আবার মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা করার সাধনা করেছেন। এখানেই রয়েছে তাঁর অবদানের বিশ্বজনীনতা। কারণ গড বা আল্লাহ'র সৃষ্টিশীলতা, সতত কর্মকুশলতার যে ধারণা খৃষ্টান সমাজে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল এবং গ্রীক ও ভারতীয় চিন্তার প্রভাবের ফলে যাতে নানাভাবে মালিন্য দেখা দিয়েছিল, ইকবাল তার সজীবতা আবার জাগ্রত সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজীবন সাধনা করেছেন।

ইকবালের দ্বিতীয় অবদান হচ্ছে ব্যক্তিত্ব বা খূদী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। ইউরোপীয় দর্শনে আমরা অহম বা Ego'র যে পরিচয় পাই, তাকে সর্বতোভাবে পাশবিক শক্তিরও এক মানবিক রূপ বলা যেতে পারে। এতে মানুষকে গণ্য করা হয়েছে, এক সুখান্বেষী জীব হিসেবে। সে সর্বদাই তার আত্মসুখের জন্য লালায়িত। সে তার নিজের জন্য অপরের সুখ–সুবিধার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করে না। তার মনের একান্ত কামনা রয়েছে, তার নিজের জন্য সে যত সুখ আয়ত্ত করতে পারে, ততই সে করবে। এ অহম্ থেকেই সুখবাদের উৎপত্তি হয়। জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে (১৮৪৪–১৯০০) এ অহমের প্রকৃতির এক অভিনব ব্যাখ্যা দান করেছেন। তাঁর মতে, এ অহমের প্রকৃতি হচ্ছে শক্তির জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা। নীটশে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেনঃ 'মানুষ অধিকতর শক্তি লাভের জন্য মুখে জলাঞ্জলী দিতে সর্বদাই প্রস্তুত এবং যে শক্তি সৃষ্টিধর্মী

ক্রিয়াকলাপে আত্মপ্রকাশ করে, তা থেকে মানুষেরা তাদের সকলের কাম্য সে পরম সুখ লাভ করতে পারে। তবে তার পথে মানুষের অনেক দুঃখ-কষ্টও ভোগ করতে হয়।* এ শক্তি লাভ করেই মানুষ অতিমানুষে পরিণত হয়। নীটশের একান্ত কামনা ছিল, এ অতিমানুষেরাই পৃথিবীকে শাসন করবে।

এতে অবশ্য মানব-মানসের সম্মুখে শক্তির মহান আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। তবে সে অতিমানুষের জীবন কিভাবে গঠিত হবে নীটশে তার কোন নির্দেশ দেননি। মানবজীবনে যতসব আবেগ রয়েছে তাদের সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে অতি মানুষ হয়ে সমাজ জীবনের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে মানুষ নিয়োজিত হতে পারে। তবে শক্তিলাভের পরে সে মানুষ যদি আবার তার অধীনস্থ লোককে সর্বতোভাবে দলন বা পীড়ন করতে চায়, তা হলে সমাজ জীবন হয়ে পড়বে দুর্বিসহ। নীটশে দর্শনের আলোকে গঠিত সিনব মসোলিনী বা এডলফ হিটলার সে রূপ 'মহামানবে' পরিণত হয়ে বিশ্ব সভ্যতার যে দারুণ ক্ষতি করেছেন - তা আজকের দিনে কারো কাছে বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখে না।

ইকবাল যে খূদীর দর্শনের প্রবর্তক ছিলেন - তা পূর্বোক্ত অহমবাদ নয়, অথবা নীটশে প্রবর্তিত শক্তি লাভের জন্য অদম্য আকাঙক্ষাও নয়। তিনি চেয়েছিলেন-মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ। তা সম্ভবপর হয় মানুষের পক্ষে ইনসান-ই-কামিল হওয়ার সাধনার দ্বারা। আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায় কুরআন-উল-করীমের মধ্যে বলেছেন, তাঁর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি এ জগতে তাঁর প্রতিনিধিকে সৃষ্টি করতে চান। যে প্রতিনিধিত্বকে ইনসান-ই-কামিল এবং সে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে তাঁরই নীতির দ্বারা চালিত হয়ে এ বিশ্বকে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাবে। এ ইনসান-ই-কামিল হতে হলে আলাহর রাসূল্লের (সাঃ) নির্দেশ পালন করে আল্লাহ'র গুণে গুণান্বিত হতে হবে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন -'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্' 'আল্লাহ'র গুণে গুণান্বিত হও।' মানুষ আল্লাহ'র গুণে গুণান্বিত হলেই ইনসান-ই-কামিল হতে পারে। ইকবাল তাই মানুষকে সে আল্লাহ'র গুণে গুণান্বিত হয়ে ইনসান-ই-কামিল হওয়ার জন্য আহবান করেছেন। তাঁর ধারণা মতে, মানবাত্মা জন্মের সংগে সংগে এক পর্যায়ে থাকে না। মানুষ তার চেষ্টার দ্বারা বিকশিত হয়। এজন্য মানবিক চেষ্টার উপর এতো গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেছেনঃ

খুদী কো কর বুলন্দ ইতনা, কে হর তকদীর সে পহলে খোদা বান্দেসে খোদ পুছে কে বাতা তেরি রেজা কিয়া হ্যায়।

এ খুদী সম্বন্ধে তাঁর নিজের বক্তব্য হচ্ছে ঃ 'খুদী প্রেমকে সবল করে। সত্তা সুসম্বদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত হলেই প্রেমের সৃষ্টি হয়। এ স্তরে জগতের অল্প মানুষ আরোহণ করতে পারেন। প্রথম স্তরে সহজাত বৃত্তি মানুষকে পরিচালিত করে। ভালবাসার বস্তু আমাদের সত্তাকে রূপান্তরিত করে। এ জন্য তিনি বলছেন- যে কিরণ উৎসারী বিন্দুকে আমরা আত্মা বলি প্রেম থেকেই সেই বিন্দুর কিরণ আসে। এবং সে প্রেম থেকেই ভবিষ্যতের অগণিত সম্ভাবনার বিকাশ হয়। তোমার এক মুষ্টি মৃত্তিকাকে স্বর্ণে পরিণত কর-পূর্ণ মানুষের দরজাতে চুম্বন কর- মানুষের জন্য সে পূর্ণ মানুষ আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন নবী-ই-কারীম।"

এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইকবালের কাছে আমাদের নবী–ই–কারীম (সাঃ) ছিলেন ইনসান–ই–কামিল এবং ইকবাল তাঁরই আদর্শে মানব জাতিকে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য আহবান করেছেন। তাঁর ধারণা ছিল নবী–ই–কারীমের (সাঃ) আদর্শে মানুষ পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠলে, এ জগতে আদল বা ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা হতো এবং অন্যায়, অবিচার, অনাচার ও অত্যাচার সব কিছুই লয় পেতো।

এ প্রসংগে ইকবালের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধেও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি স্থানু সর্বেশ্বরবাদের স্থলে সতত–ক্রিয়াশীল কর্মচঞ্চল, গতিশীল আল্লাহর অস্তিত্বের দর্শন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে আদিসত্তা গতিশীল বলে এ বিশ্বের সর্বত্র রয়েছে গতির অনন্ত খেলা। যেখানে গতির বিরতি দেখা দেয় সেখানেই মৃত্যু দেখা দেয়। তিনি অতি চমৎকার একটা উপমার মাধ্যমে তাঁর সে ধারণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

দুর্বার তরঙ্গ এক বলে গেল তীব্র তীর বেগে–
বলে গেল– যতদিন গতি মোর আছে–
তত দিন আমি বেঁচে আছি–
যখন হারাই গতি সেই ক্ষণে আমি আর নাই।

সতত সৃষ্টিশীল আল্লাহর ধারণার সংগে সতত গতিশীল এ বিশ্বের ধারণার কোন থেকে একে মহাগতিশীল ও পরিবর্তনশীল সত্তা বলেই স্বীকার করতে হয়। এ ধারণাগুলোর আলোকে খুদী বিকাশের ধারণার ব্যাখ্যা করলে জগত সভ্যতাকে সতত বিবর্তিত বিষয় বলে গ্রহণ করা যেতো এবং এ বিশ্বে উন্নত থেকে উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতো। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিশীল হলে তাঁরই আদর্শে মানুষও সৃষ্টিশীল হতো এবং সৃষ্টিশীল হতে হলে তাঁর পক্ষে সে ক্ষমতা আহরণের জন্য খুদীর বিকাশ হত অবশ্য প্রয়োজনীয়। পরম পুরুষ আল্লাহ'র রাসূলের (সাঃ) আদর্শে বিকশিত হয়ে উঠলে এ জগতে অনাচার, অবিচার বলতে কিছুই থাকতো না। এ দুনিয়া এক আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হত।

আজকের দিনে এ বিশ্বে যে দ্বন্দ্ব ও কোলাহল দেখা দিচ্ছে – তার মূলে রয়েছে মানুষের পক্ষে তার সত্যিকার রূপ লাভে অসামর্থ্য। মানুষ কখনো তাকে এক বৃত্তির আলোকে তার নিজের জীবনের ব্যাখ্যা করছে, আবার কখনো অপর বৃত্তির আলোকে সে একই জীবনের ব্যাখ্যা করছে বলে এ দ্বন্দ্ব এত প্রখর হয়ে দেখা দিচ্ছে। কোথাও অহমবাদীদের (egoist) মত তাকে অহম–সর্বস্ব, কোথাও ফ্রয়েডের অনুসরণে তাকে কামসর্বস্ব আবার কোথাও ম্যাকডুনালের অনুসরণে তাকে যুদ্ধ স্পৃহা–পরিচালিত, আবার কোন কোন সময় এ্যাডলারের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তাকে শক্তিলাভের জন্য অদম্য আগ্রহশীল বলে ধারণা করে একে অপরের সংগে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। আপনাকে অহম–সর্বস্ব ভাবার ফলেই সে শোষকে পরিণত হয় এবং পরার্থপর বলে ধারণা করার ফলেই সামন্তের মাধ্যমে বিলীন হয়। ইকবালের নির্দেশ হচ্ছে–তোমার মধ্যে যে মাটি রয়েছে – তাকে স্বর্ণে পরিণত কর অর্থাৎ তোমার মধ্যে যে রিপু রয়েছে সেগুলোকে পরিশোধ করে তোমার ব্যক্তিগত জীবন অথবা সামাজিক জীবনে তাদের ব্যবহার কর। তবে সর্বাবস্থায় তোমার সামনে আদল রূপে বিরাজ করবেন– সে ইনসান–ই–কামিল। তুমি নিজে ইনসান–ই–কামিলে পরিণত হও।

বিশ্ব সভ্যতায় ইকবালের তৃতীয় অবদান হচ্ছে বোম [Intuition] সম্বন্ধে তাঁর মতবাদের প্রকাশ। এক্ষেত্রে তার, চিন্তা একদিকে যেমন প্লটিনাস, স্পিনোজা হমানুয়েল ক্যান্ট বা বের্গসোঁর মত আধুনিক চিন্তানায়কের চিন্তা থেকে ভিন্ন, তেমনি অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদদের মতবাদ থেকেও ভিন্ন।

ইসলামী দর্শনে গাযালীই সর্বপ্রথম বোধকে জ্ঞানের সর্বোচ্চ সোপান বলে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে আত্মার বিকাশের সূত্র অনুসারে মানুষের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। যে ব্যক্তির আত্মা বিকাশের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থিত সে কেবল পরিদৃশ্যমান বিষয়ের জ্ঞান লাভেই সন্তুষ্ট। তার পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের চর্চা মোটেই সহজ নয়। গাযালীর মতে, সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত মানুষের মধ্যে বোধ লাভে সমর্থ এক শক্তির সৃষ্টি হয়। এ স্তরে মানুষ আবেশে বিভোর অবস্থায় নূর-ই-ইলাহীর সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয়। মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে ইব্‌নে তোফায়েলের ধারণা ছিল- বহুর মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার করার চেষ্টায় তত্ত্বজ্ঞানী অনবরত তাঁর দেহ ও মনকে বিশুদ্ধ করে তোলার প্রয়াস পান এবং পরিশেষে আবেশে বিভোর হয়ে আল্লাহ'র সত্তায় বিলীন হয়ে যান।

সূফীরাও তেমনি বোধকে জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। সূফীদের এ অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসংগে ইকবাল নিম্নোক্ত লক্ষণগুলোর উল্লেখ করেছেন –

প্রথমত ঃ এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অন্যান্য অভিজ্ঞতার মত যুক্তিলব্ধ নয়। দ্বিতীয়ত ঃ এ জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তৃতীয়তঃ এ জ্ঞান অন্য একটা আত্মার সংগে গুরুতর অনুভূতির সম্বন্ধে সংশ্লিষ্টও, ফলে ব্যক্তি-সত্তার পৃথক অস্তিত্বের সাময়িক বিলুপ্তি ঘটে এবং সে সত্তা আল্লাহর সত্তায় বিলীন হয়। এ জ্ঞান আত্মমুখীন বা (Sulyictine) নয়। একে উচ্চস্তরের বিষয় মুনীন বা (Objectue) অভিজ্ঞতাও বলা যায়।

দর্শনশাস্ত্রে বোধ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করেছেন প্লটিনাস। গ্রীক দর্শনের পতন যুগে আলেকজান্দ্রিয়ায় ধর্ম দর্শনের যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় তারই পরিণত ফল রূপে দেখা দেয় নব্য প্লেটোবাদ। এ মতবাদের প্রবর্তক প্লটিনাস। তিনি প্লেটোর দার্শনিক মতবাদকে একটা বিশিষ্ট ধর্মে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় কিভাবে বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে উৎসরণের ধারায় বিশ্ব আত্মা ও জড় পদার্থের সৃষ্টি হয়- তা প্রদর্শন করেছেন। মানবাত্মার বর্ণনা প্রসংগে তিনি বিশ্ব আত্মা থেকে তার উৎপত্তি এবং সেই আদি সত্তায় তার লয় প্রসংগে বলেছেনঃ দেহ শুদ্ধির পরে মানবাত্মা অজদ বা (Ecstasy)-এর মাধ্যমে তার মূল সত্তার সংগে ঐক্যমূলে আবদ্ধ হতে পারে।* প্লটিনাস মানবাত্মার এ স্তরকে বুদ্ধির স্তর থেকে উচ্চ পর্যায়ের বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে এ পর্যায়ের জ্ঞান লাভের সংগে বুদ্ধিজাত জ্ঞানের কি সম্পর্ক বিদ্যমান তা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেননি। প্লটিনাসের আধুনিক ভাষ্যকার ডীন হীনজের মতে, দ্বন্দ্বমূলক ন্যায়শাস্ত্রের মাধ্যমে মানব-মানস সত্যের দোর গোড়ায় উপস্থিত হতে পারে। তবে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। সত্যের সদর কামরায় উপস্থিত হতে হলে স্বজ্ঞা বা Intuitin -এর মাধ্যমেই তা সম্ভবপর হয়।

আধুনিক যুগের সূচনায় স্পিনোজাও স্বজ্ঞা বা বোধ সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে আমাদের সংবেদন ও কল্পনা থেকে অস্পষ্ট ধারণার উৎপত্তি হয়। যুক্তি-জাত

জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা পরিচ্ছন্ন ধারণা করতে সমর্থ হই। কারণ যুক্তিই আমাদের বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে এবং তারা কিভাবে পরস্পরের সংগে অনিবার্যভাবে এবং চিরন্তনকালে সংযুক্ত সে জ্ঞানলাভে সমর্থ করে। তবে এ স্তরের উর্ধ্বে রয়েছে স্বজ্ঞার স্তর। এ স্তরে আরোহণ করেই আদিসত্তা থেকে কিভাবে অনিবার্যভাবে বিশ্বের সব কিছুর উৎপত্তি হয়-সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

যদিও স্পিনোজা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য প্রদর্শন করেননি, তবু তাঁর চিন্তার সূত্র থেকে বোঝা যায় যুক্তির স্তরে মানব-মন যেভাবে এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে আরোহণ করে বোধির স্তরে, সেভাবে ধাপে ধাপে আরোহণ করার প্রয়োজন হয় না। এ স্তরে এক সংগেই মানব-মানসের পক্ষে এ বিশ্বের সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য লাভ সম্ভব। আধুনিক দর্শনে ইমানুয়েল ক্যান্ট স্থান ও কালকে সংবেদন বিন্যাসের দুটো আকার (twus) বলেছেন। তাঁর মতানুসারে আমরা আমাদের সংবেদনগুলোকে স্থান-কালে বিন্যস্ত করি। এ বিন্যাস বুদ্ধিজাত নয়, এটা বোধির ব্যাপার।

অতি আধুনিক দর্শনে বোধি সম্বন্ধে বের্গসোঁর মতবাদ তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতবাদ অনুসারে বুদ্ধি (Intellect) ও সহজাত (Instuct) জ্ঞানের মধ্যবর্তী অপর একটা জ্ঞান রয়েছে- যাকে বোধি বলা যায়। সে জ্ঞানের মাধ্যমেই সতত সৃষ্টিশীল বিরাট জীবনী শক্তির সঙ্গে সাক্ষাত লাভে মানুষ সমর্থ হয়। বের্গসোঁ আবার বোধিকে দুই অর্থে ব্যবহার করেছেন। এক অর্থে তাকে বলেছেন বুদ্ধিজাত সহানুভূতি। [Intellecttual Sympathy]। এ সহানুভূতির দ্বারাই জ্ঞাতাকেস বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তার মধ্যে যা একান্ত নিজস্ব এবং অনির্বাচনীয় তার সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করে। আবার অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন-বোধি বলতে আদিম ও মৌলিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান বোঝায়। এ জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ সম্ভবপর হয়।

ইকবাল বোধি সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন - তা এসব ধারণা থেকে পৃথক। তাঁর মতবাদ অনুসারে আমাদের জ্ঞান জগত প্রপঞ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সম্বন্ধে তিনি ক্যান্টের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তবে ক্যান্টের মতবাদ অনুসারে মানব-মানসের পক্ষে কোনকালেই যার সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কিছুতেই সম্ভবপর নয়। ইকবালের মতে স্থান-কাল আত্মমুখ হলে তারা স্থিতিশীল বা (Etatic) নয়। মানব-মানসের প্রসার ও সঙ্কোচনের ফলে স্থান-কালের রূপেও পরিবর্তন দেখা দেয়। এভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই মানব বিকাশের চরম স্তরে বিষয়গুলোকে স্থান-কাল নিরপেক্ষ হিসেবে বুঝবার সুবিধা রয়েছে। এ স্তরকে বোধি বলা যায়।

ইকবাল সূফীদের মতো মনে করেন যে, বোধিজাত জ্ঞান প্রত্যক্ষ (Direct) অন্যান্য অভিজ্ঞতার মতো যুক্তিলব্ধ বা অপ্রত্যক্ষ (indirect) নয়। ইকবালের মতে, বোধি হৃদয়ের বা কলবের এক বিশেষ শক্তি। মননশীলতার ক্ষেত্রে কতকগুলো চিন্তার ও সম্বন্ধের মাধ্যমে বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান লাভ হয়। এসব কে আমাদের মানসই বিষয়গুলোর উপর আরোপ করে। বোধিতে অনুভূতির মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সত্যিকার রূপ প্রকাশ পায়। এ জন্যই বোধিকে আত্মমুখীন জ্ঞান বা Enbyectine Knowlege বলা যায়। এ জ্ঞান আমাদের প্রায়োগিক (Empirical) সত্তাকে অতিক্রম করে। এতে আমাদের কাছে আমাদের আত্মা

তুরীয় (Transcedant) ও মধ্যব্যাপী (immanent) রূপে প্রকাশিত হয়। সাধারণত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বলে যে বিভিন্নতা করা হয়, বোধিতে সে পার্থক্য করা সম্ভবপর নয়। বোধিকে ক্রমিক ধারায় প্রকাশিত (Serial) সময় অন্তর্হিত হয়। সময় বোধিতে দেখা দেয় চিরস্থায়ী কালরূপে।

এ ক্ষেত্রেই দেখা দিচ্ছে বোধি সম্বন্ধে ইকবাল দর্শনের বৈশিষ্ট্য। তার ধারণা, বোধিজাত জ্ঞান লাভে সকল মানুষই সাধনার দ্বারা সমর্থ হতে পারে। তবে এ সাধনা বের্গসোঁ প্রদর্শিত সাধনার রূপে কিছুতেই সফল হতে পারে না। বের্গসোঁ বলেছেন, বোধিজাত জ্ঞান লাভ করতে হলে স্মৃতির সবগুলো উপাদান মুছে ফেলতে হবে। তার প্রতিবাদ স্বরূপ ইকবাল বলছেন– এভাবে স্মৃতি থেকে উপাদানগুলো মুছে নিলে আত্মারই নির্বাণ লাভ হবে।

ইকবাল প্রদর্শিত বোধির কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা হলে বর্তমানকালে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে– তার নিরসন হতো। কারণ ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন বোধির প্রাধান্য, তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির এবং দর্শনের ক্ষেত্রে উভয়ের কার্যকারিতা রয়েছে। তবে সকল পর্যায়ে বুদ্ধি ও বোধির কার্যকারিতা অল্পাধিক বর্তমান। তাই আজকের দিনে ইকবালের এ অবদান বিশ্বসভ্যতার বিকাশে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রমাণপঞ্জী :

(১) অধ্যাপক আলেসান্দ্রোবৌসানীঃ ইকবাল তার ধর্ম দর্শন ও প্রতীচ্য

(২) Trank Thilly History of Philosophy

(৩) ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহঃ ইকবাল।

(৪) অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ–ইকবল দর্শনে বোধি; বাংলা একাডেমী পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ; ১ম সংখ্যা

* অধ্যাপক আলসান্দ্রে বৌ সানী–ইকবাল ঃ তার ধর্ম দর্শন ও প্রতীচ্য

* Trauk Thilly-History of Philosophy- P 504

* ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ ইকবাল

* Trauk-Thilly-History of Philosopy- P154

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পাঠ্য পুস্তকে ইকবালের স্থান

এ কে এম মাহবুবুর রহমান

مرگ را در حضرت اقبال هرگز راه نیست
تا زبان فارسی زنده است او هم زنده است

হযরত ইকবাল এমনই অমর
যতদিন ফার্সী ভাষা জীবন্ত থাকবে
তিনিও অমর থাকবেন।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ফার্সী সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ডঃ জনাব গোলাম আলী হাদ্দাদ আদেলের উক্ত দু'টি স্তবক ফার্সী ভাষায় ইকবালের অবদান এবং ইরানী সাহিত্য ও জ্ঞানী মনীষীদের মাঝে আল্লামা ইকবালের স্থান যে কত উর্ধ্বে তারই প্রমাণ বহন করছে।

এই মনীষী ইকবাল সম্পর্কে আরো লিখেছেনঃ

اقبال منادیٔ اسلام و ایمان و انسانیت وآزادگی وخود شناسی
وخود سازی درمیان مسلمانان عصرحاضر و خصوصاً مسلمانان
هند و پاکستان و ایران و فارسی زبانان است

ইকবাল ছিলেন অধুনা যুগের মুসলমান
বিশেষ করে
পাক–ভারত উপমহাদেশ, ইরানের মুসলমান ও ফার্সী ভাষাভাষী
জনগোষ্ঠীর জন্য ইসলাম, ঈমান, মানবতা, স্বাধীনতা
আত্মপরিচয়, আত্মগঠনের ঘোষক।
ডঃ হাদ্দাদ তাঁর লেখার ভূমিকায় আরো লিখেন ঃ

در قرن اخیر به تاریخ ادبیات کهن فارسی نامی افروده شده که
هرگز محو نخواهد شد و آن نام محمد اقبال لاهوری شاعر بزرگ
پاکستانی است - نه تنها فارسی زبانان ایران
وهم میهنان پاکستانی اقبال او را هرگز فراموش نخواهند کرد
بلکه مسلمانان جهان نیز یاد او را همواره در خاطر خویش حفظ

خواهند کرد - زیرا اندیشه های معنوی او که از قرآن وحکمت
اسلامی سرچشمه گرفته است هرگز کهنگی نمی پذیرد و فرموده نمی شود

এ শতাব্দীর প্রাচীন ফার্সী সাহিত্যে এমন একটি নাম সংযোজিত হয়েছে যা কখনও বিস্মৃত হবে না। সে নামটি হলো পাকিস্তানের মহান কবি মুহাম্মদ ইকবাল। ইরানের ফার্সীভাষী এবং পাকিস্তানের স্বদেশীরাই শুধু ইকবালের স্মৃতিকে চিরজাগরুক রাখবে না বরং বিশ্ব মুসলিমের কাছে ইকবালের স্মৃতি থাকবে অমর। কেননা তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা কোরআন ও ইসলামী হেকমত থেকে উৎসারিত যা কোনদিন পুরনো হবে না এবং লয় হবে না।

আল্লামা ইকবাল যদিও সর্বকালেই ইরানী সাহিত্যিকদের মন আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন, কম-বেশী তাঁর সাহিত্য নিয়ে চর্চা হয়েছে তবে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের পর ইকবাল কাব্য জাতীয় ও সামগ্রিক ভাবে সমাদৃত হয়। বিপ্লবোত্তর পাঠ্য পুস্তকে মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর স্তর এমনকি গবেষণা পর্যায়েও ইকবাল অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিভাত হন। যেমন ষষ্ঠ শ্রেণীর ফার্সী সাহিত্য পুস্তকের পঞ্চম পৃষ্ঠায়ই ইকবালের 'আপনাতে প্রত্যাবর্তন' নামক কবিতা স্থান পেয়েছে। যে কবিতায় এক পর্যায়ে ইকবাল বলেছেনঃ

چون مسلمانان اگر داری جگر - در ضمیر خویش و در قرآن نگر
صد جهان تازه در آیات اوست - عصرها پیچیده در آیات اوست

মুসলিম যদি থাকে তোমার কলিজা (আত্মা)
নিজ সত্তা ও কোরআনের দিকে তাকাও
তার আয়াতসমূহে রয়েছে শতশত নয়া বিশ্ব
তার আয়াতে রয়েছে যুগের পর যুগ।

ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের অন্যত্র تقلید از غرب 'পাশ্চাত্যের অনুকরণ' কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে, যেখানে তিনি পাশ্চাত্যের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ

گرچه دارد شیوه های رنگ رنگ - من بجز عبرت نگیرم از فرنگ
ای به تقلیدش اسیر آزاد شو - دامن قران بگیر آزاد شو

যদিও রয়েছে তাতে রং বেরং-এর পদ্ধতি
আমি ফিরিঙ্গীদের দেখে নিজের জন্য
উপদেশ গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করব না।
ওহে
যারা তাদের অনুকরণে বন্দী হয়ে আছো

মুক্ত হও।
কোরআনের দামান ধর
স্বাধীন হও

অষ্টম শ্রেণীর ফার্সী সাহিত্যে আল্লামা ইকবাল দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছেন। সেখানে রয়েছে ইকবালের دل چیست 'অন্তর কাকে বলে?' এ কবিতা অধ্যয়নের মাধ্যমে ইরানের কিশোর সমাজ প্রকৃত অন্তরের পরিচয় লাভ করে। এ কবিতায় তিনি বলেনঃ

چه می پرسی میان سینه دل چیست - خرد چون سوز پیدا کرد دل شد
دل از ذوق تپش دل بود لیکن - چو یکدم از تپش افتاد گل شد

'সিনার মাঝে অন্তরটা কি তা–ই জিজ্ঞেস করছ?
বুদ্ধি যখন দগ্ধ হয় তখনই তা হয় অন্তর
অন্তর তো তা–ই যা স্পন্দিত হবে
আর যখন তাতে স্পন্দন থাকবে না তা হবে মাটি।'

একই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠায় রয়েছে ইকবালের সাড়া জাগানো কবিতা « از خواب گران خیز » 'গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠ।'
হে ঘুমন্ত কলি নার্গিসের মত উদ্বেগ নিয়ে জেগে উঠ
আমাদের বাসস্থান লুট হয়ে গেছে
চিন্তিত মন নিয়ে জেগে উঠ।

ইসলামী ইরানের নবম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে আল্লামা ইকবালের যে বিশ্বদর্শনমূলক কবিতা স্থান পেয়েছে তার মূল বক্তব্যই এদেশের জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। কবিতাটির শিরোনাম « نه شرقی نه غربی » 'প্রাচ্যও নয় পাশ্চাত্যও নয়।' এ কবিতার একাংশে তিনি বলেছেনঃ

خدا ان ملتی را سروری داد - که تقدیرش به دست خویش نبوشت
به آن ملت سروکاری ندارد - که دهقانش برای دیگر ان کشت
بیا ساقی نقاب از رخ برافکن - چکید از چشم من خون دل من
نه ان لحنی که لی شرقی نه غربی ات - نوابی از مقام لاتخف زن

আল্লাহ্ ঐ জাতিকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন যারা নিজেদের
ভাগ্য নিজেরাই লিখেছে
ঐ জাতির সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক নেই, যারা
নিজের ক্ষেতে অন্যের ফসল চাষ করছে।
হে সাকী! আস, চেহারা থেকে নেকাব খোল
আমার অন্তরের খুনই আমার চোখ দিয়ে চুষে নেয়া হয়েছে।

নির্ভয়ে প্রাচ্য নয় প্রতীচ্য নয়–এ ফরিয়াদ তোল।

নবম শ্রেণীর পাঠ্য বইতে ইকবালের قرآن 'কোরআন' নামক কবিতা স্থান পেয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেনঃ

گر تو میخواهی مسلمان زیستن - نیست ممکن جزبه قرآن زیستن
بر خور از قرآن اگر خواهی ثبات - در ضمیرش دیده ام آب حیات
صد جهان باقی است در قرآن هنوز - اندر آیاتش یکی خود را بسوز

তুমি যদি চাও মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকবে
কোরআন ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।
যদি চাও স্থিতিশীল থাকবে কোরআনকে আঁকড়ে ধর
এর অভ্যন্তরেই আমি দেখেছি জীবনী শক্তি
কোরআনের মাঝে এখনও শত শত বিশ্ব বিদ্যমান
এর আয়াতসমূহের যে কোন একটিতে নিজে দগ্ধ হও।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে আল্লামা ইকবালের পরিচয় দিয়ে লেখা হয়েছেঃ

یکی از ستارگانی که در شب تاریك هندوستان در خشید و تیرگیها را شکافت ونور امید به جانها بخشید وپایان تباهیها را در شبه قاره هند اعلام داشت اقبال لاهوری بود-
اقبال معلم است معلم جانشین خداست وهرکس که به حق معلم باشد جانشین خدا است و وارث پیامبر یعنی کسی که انسان می سازد و اندیشه مر پردا زد وجامعه می پروراند
وبالاخره اقبال مفسر قرآن است واز این کتاب بزرگ و جاوید آسمانی درسها فراگرفته و حقیقتها آموخته در نوشته ها و شعرها و سخنانش همه جاتلأتو قرآن نمودار است وسالهای آخرعمر را همدم قرآن بوده است

হিন্দুস্তানের তিমির আকাশে যে সব উজ্জ্বল নক্ষত্র
অন্ধকার দূর করে আশার আলো জ্বালিয়েছেন,
ভারত উপমহাদেশের বিপর্যয় অবসান অত্যাসন্ন–এ ঘোষণা দিয়েছেন
ইকবাল লাহোরী ছিলেন তাদের অন্যতম।
ইকবাল শিক্ষক ছিলেন শিক্ষক আল্লাহ্'র প্রতিনিধি।
যে কেউ সত্যের শিক্ষক হবে সেই আল্লাহ্'র প্রতিনিধি এবং নবীর ওয়ারিস।

অর্থাৎ যারা মানুষ গড়ে
চিন্তার উন্মেষ ঘটায় এবং সমাজকে
লালন করে তিনি ছিলেন তাদেরই একজন।

এক কথায় বলা যায়, ইকবাল ছিলেন কোরআনের মুফাসসির (ভাষ্যকার)। তিনি মহান ও চিরন্তন গ্রন্থ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর লেখা কবিতায় এবং ভাষণে সর্বত্র কোরআনের আলোক রশ্মি উদ্ভাসিত হয়েছে। জীবনের শেষ দিনগুলোও তিনি কোরআন নিয়েই কাটিয়েছেন।

ইরানের বিপ্লব-পূর্ব সাহিত্যে আল্লামা ইকবাল ছিলেন একজন চিন্তাবিদ ও খ্যাতনামা কবি। কিন্তু বিপ্লবোত্তর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ দর্শনে ইকবাল উদ্ভাসিত হয়েছেন একজন জাতীয় শিক্ষক হিসেবে। বিপ্লবের চেতনা, জাগরণ ও তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে মর্দে মুমিনের শাশ্বত কৃপাণ ইকবালের তেজোদীপ্ত কবিতার ছন্দে স্পন্দিত হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে। আল্লামা ইকবালকে চেনে না এমন শিক্ষিত নাগরিক ইসলামী ইরানে নেই বললেই চলে। কারণ ইকবাল ইরানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শ্রেণী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসার প্রথম জামায়াত থেকে শুরু করে হুজ্জাতুল ইসলাম হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরে বিচরণ করছেন। ইকবাল ছিলেন আপোষহীন ও পাশ্চাত্য তন্ত্রমন্ত্র মুক্ত নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্ঠার অগ্রসেনানী। ইসলামের আধ্যাত্মিক ও সমাজ দর্শন যত গভীর ইকবালের চিন্তা-চেতনাও তত গভীর। ইসলামকে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করার ফলেই ইকবাল ইরানের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এক কথায় বলতে গেলে ইকবালের স্বপ্ন ছিল বিশ্বজনীন, যেখানেই তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটবে সেখানেই হবে তাঁর কদর। পাক ভারত উপমহাদেশের কবি হলেও ইকবাল আজ নিছক একজন কবি হিসেবেই রয়ে গেছেন। তাঁর স্বপ্ন ও দর্শন বাস্তবায়িত হলেই ইরানের মুসলনমানদের মত এ ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীও ইকবালের মর্যাদা দিতে সক্ষম হবে-এতে সন্দেহ নেই।

[illegible]দের চিন্তা, লাহোর প্রস্তাব এবং পাকিস্তান

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইকবালের চিন্তা, লাহোর প্রস্তাব এবং পাকিস্তান

শেখ দরবার আলম

আমার আব্বা চিরদিন ভারতে ছিলেন। পাকিস্তানে আসার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য তাঁর হয়নি। উনিশ শ' সাত চল্লিশের পর আরো চব্বিশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। ১৯৭১-এর ৯ জুলাই শুক্রবার তিনি ইন্তেকাল করেন। অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির পর আরো দুই যুগ তিনি সুস্থাবস্থায় বেঁচেছিলেন। কিন্তু কোনো দিন পাকিস্তানে আসেন নি। সেই তাঁর কাছেই একটা ঘটনার কথা শুনেছিলামঃ

একজন মুসলমান ট্যাক্সি ড্রাইভার অনেক রাতে তাঁর শেষ যাত্রীটিকে কলকাতার চৌরঙ্গী এলাকায় তাঁর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যখন নিজের বাড়ীতে ফিরলেন, তখন দেখলেন ট্যাক্সির মধ্যে টাকা ভর্তি একটা ব্যাগ পড়ে আছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার তাঁর গাড়ী ঘোরালেন। ট্যাক্সি পথে নামিয়ে সেই রাতে আবার সেই ভদ্রলোকের বাড়ী গেলেন। টাকা ভর্তি ব্যাগটি তাঁর হাতে পৌঁছে দিয়ে বললেন, 'দেখে নিন সব ঠিকঠাক্ আছে কিনা।'

ভদ্রলোক বিস্ময়ে হতবাক। প্রশ্ন করলেনঃ 'এ সব দেখেও তুমি ফেরত দিতে এসেছো? তুমি কে?'

ট্যাক্সি ড্রাইভার জবাব দিলেনঃ 'আমি মুসলমান। আমরা যে পাকিস্তান সৃষ্টি করবো।'

ভাবতে শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসেঃ কত পবিত্র, কত মহৎ ছিলো সেই ধারণা। কত বড় আদর্শের ছিলো সেই ধারণা।

কিন্তু তবু আমার আব্বা কেনো আসেন নি পাকিস্তানে? তাঁর অভিমানটা যে কোথায় ছিলো সেটার সবটুকু তিনি মুখে বলেন নি। সেটা জানতে উনিশ শ' সাতচল্লিশ পর্যন্ত বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের ইতিহাস বিষয়ে আমাকে কিছু পড়াশুনা করতে হয়েছে। সে সময়কার পুরোনো দৈনিক এবং সাময়িক পত্রের পাতাগুলো উল্টালে হতবাক হওয়ার মতো এমন অনেক কঠিন সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

যে সত্য ১৯৪৭-উত্তরকালে কয়েকটি প্রজন্মের মানুষকে জানতে দেওয়া হয়নি, ইতিহাসের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন যেটুকু বলা হয় তার সবটুকুকেই নথি-তথ্য বিবর্জিত অন্ধ আবেগের বিষয় করে তোলা হচ্ছে। কিন্তু তারিখ-তথ্যগুলো সময়ানুক্রমিক সাজিয়ে জানার এবং জানানোর সুযোগ না দিলে কোনো প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীদের পক্ষেই কি সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

একটা কথা হাজারো নথি-তথ্য দিয়েই প্রমাণ করা যায় যে, মুসলমানদের অর্থনৈতিক অস্তিত্ব এবং সাংস্কৃতিক সত্তা ধ্বংস করার লক্ষ্যে কংগ্রেস তথা হিন্দু নেতৃবৃন্দ, অতিরিক্ত অমানবিক এবং অনুদার না হলে উপমহাদেশের রাজনীতিতে 'পাকিস্তান' শব্দটার জন্মই হতো না। তবু 'পাকিস্তান' শব্দটার জন্ম কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেননি। মুসলিম লীগও

নয়। শব্দটির জন্ম দিয়েছিলেন অন্যেরা এবং তা ১৯৪০–এর লাহোর অধিবেশনের অনেক আগে। ১৯৪০–এর ২৩ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে শের–ই–বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক কর্তৃক উথাপিত এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবেও এই 'পাকিস্তান' শব্দটার কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে এই অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে কায়েদ–ই–আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ হিন্দু ও মুসলমান– এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক জাতিসত্তা সম্পর্কে যে তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য পেশ করেন এবং পরে এর সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে যে প্রস্তাব উথাপন ও গ্রহণ করা হয়, সেটিকেই তৎকালীন ভারতের হিন্দু সাংবাদিকরা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাব বলে অভিহিত করেন। পরে তাই দেখা যায়, কায়েদ–ই–আজমও বিবৃতি দিয়েছেনঃ লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান কথাটা নেই। ওটা হিন্দু প্রেসের দান।

বিশেষত হিন্দু–মুসলিম সমন্বয়ে গঠিত অসহযোগ আন্দোলন ও হিন্দু–মুসলিম প্যাক্ট এক শ্রেণীর অনুদার হিন্দু নেতৃবৃন্দের বদৌলতে বানচাল হওয়ার পর থেকে কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত আগ্রাসী ও নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। তারা মূল সমস্যাটির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সেটা আর সমাধানের চেষ্টা করলেন না। বরং সমস্যাটিকে প্রশ্রয় ও মদদ দিয়ে সেগুলিকে একদিকে যেমন আরো বাড়িয়ে তুলে ক্রমান্বয়ে জটিল করে তুলতে থাকলেন, অন্যদিকে উল্টো এ সব কিছুর জন্য মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দকে দোষারোপ করে যাওয়াটাই বিচক্ষণতার পরিচায়ক বলে মনে করলেন। সাতচল্লিশ–পূর্ব এবং সাতচল্লিশউত্তরকালে কংগ্রেস এই তাসের ঘরটাই নির্মাণ করেছে। আজো ভারতের যেটা মৌলিক সমস্যা, সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটা নিহিত রয়েছে এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই। জওহর লাল নেহরুর এবং তাঁর পরিবারের অর্থাৎ তাঁর কন্যা দৌহিত্রের শাসনের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক, সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ঠিক এখানেই। তাঁরা নিষ্ঠাবান হিন্দু হলে কোনো মুসলমানের কোনো ক্ষতি ছিলো না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নামে একতরফাভাবে কেবলমাত্র হিন্দু ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিতে আমল করানোর এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের নামে কেবলমাত্র বর্ণহিন্দুর শাসন, বর্ণহিন্দুর ইচ্ছা–অনিচ্ছা, বর্ণহিন্দুর অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক আগ্রহ প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের কোটি কোটি মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্তটা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, শিবসেনা এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের স্থূল তৎপরতার তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক। কংগ্রেস যে বরাবরই কোয়ালিশন সরকারের পরিবর্তে একদলীয় সরকারের কথা বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পরিবর্তে এককেন্দ্রিক সরকারের কথা বলেছে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে বলেছে, এমন কি, মুসলমানদের তরফে উথাপিত চাকরি বাকরি সংরক্ষণের দাবী নস্যাৎ করে দিতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছে, এই সব কিছুরই মূল লক্ষ্য এক কথায় হিন্দু সম্প্রদায়ের তরফে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর, বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর আর্থ–সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানো। এই ইচ্ছাটা যে কত নিরাবরণ হতে পারে তার একটা উদাহরণ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামল থেকেও দেওয়া চলে।

সংখ্যালঘু বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় ভোটযুদ্ধে সংখ্যাগুরু হওয়ার তাগিদে শিডিউল্ড কাস্ট এবং শিডিউল্ড ট্রাইব্স অর্থাৎ তফসিলী জাতি ও উপজাতির লোকদের জন্য চাকরি–বাকরি

সংরক্ষণের এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় আসন সংরক্ষণের একটা বন্দোবস্ত আজো ভারতীয় সংবিধানে রেখেছে। কিন্তু বর্ণহিন্দুদের প্রত্যক্ষ অত্যাচারে দক্ষিণ ভারতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যখন দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করলেন, তখন ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইনসভায় সঙ্কোচ–শরমের তোয়াক্কা না করে এই বিলটা পাস করা হলো যে, তফসিলী জাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের কোনো হিন্দু ধর্মান্তরিত হলে আর সংরক্ষণের কোনো সুযোগ–সুবিধা পাবেন না। এর নাম ধর্মনিরপেক্ষতা?

কংগ্রেসের এই স্বরূপটাই হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গিয়েছিলো ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন মোতাবেক নির্বাচনে ১৯৩৭ সালে ভারতের ছয়টি প্রদেশে যখন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কায়েম হলো তারপর লাহোর অধিবেশনের সময় পর্যন্ত আড়াই বছর।

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসী হিন্দুদের মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর এই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন ও অনুমোদন করেছিলেন।

কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশন এবং মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন

মওলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে বিহারের রামগড়ে সারা ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনে বলা হয় যে, মুসলমানরা কোনো রাজনৈতিক সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু নয় ("A small minority")। এর তিন দিন পর ৯ চৈত্র ১৩৪৬ঃ ১২ সফর ১৩৫৯ হিজরীঃ ২২ মার্চ ১৯৪০ তারিখ শুক্রবার লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের তিন দিনব্যাপী ২৭তম অধিবেশন কায়েদ–ই–আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে শুরু হয়। শের–ই–বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ নেতার সক্রিয় উপস্থিতিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত এই ২৭তম অধিবেশনে কায়েদ–ই–আজম ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান– এই দুই বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য দু'টি আলাদা আলাদা জাতীয় রাষ্ট্র কায়েম করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করলেন। প্রতিটি রাষ্ট্রই হবে স্বয়ং শাসিত। কিন্তু উভয়কেই সংযুক্ত থাকতে হবে আন্তর্জাতিক চুক্তি মোতাবেক। তিনি উল্লেখ করেন যে, আড়াই বছরের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুসলমানদের জন্য আর্থ–সাংস্কৃতিক রক্ষাকবচগুলো কাজ দেয় না। বৃটিশ ও কংগ্রেস – এই উভয়ের কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। মুসলমানদেরকে তিনি তাঁদের অন্তর্নিহিত শক্তির উপরই কেবল নির্ভর করার পরামর্শ দিলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সুস্পষ্ট দাবী জানালেন, মুসলিম সৈন্যদেরকে কোথাও কোনো মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া চলবে না। প্যালেস্টাইন প্রশ্নে বৃটিশ সরকারকে আরব জনগণের জাতীয় দাবীর প্রতি সাড়া দিতে হবে। তাঁর উক্তিঃ হিন্দু ও মুসলমান, এই উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ফারাক এত মৌলিক যে, ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের মারফত তাঁদেরকে এক রাষ্ট্রের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কেননা, উভয়ের সংস্কৃতি স্পষ্টতই পৃথক। উভয়ের ধর্মীয় দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা। উভয়ের সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি পৃথক। উভয়ের ঐতিহ্য, ইতিহাস, জীবন ব্যবস্থা এবং সাহিত্যও আলাদা। উভয়ের সমাজ ব্যবস্থা এক নয়। মুসলমানরা অনুপ্রেরণা লাভ করে তাঁদের নিজস্ব ইতিহাস থেকে। এ বিষয়ে ২৪ মার্চ ১৯৪০ তারিখ রবিবারের 'স্টেটস্‌ম্যান'–এর অষ্টম পৃষ্ঠায় তৃতীয় ও চতুর্থ কলামে খবর ঃ

ALL INDIA MOSLEM LEAGUE

Mr Jinnah's Plans For Future : Two Separate States in India.

Lahore, Mr 22

Much of Mr Jinnah's address as President to the 27th Session of the All India Muslim League here today dealt with the plan for forming two separate states- one Hindu and one Moslem in India .

The fundamental difference between Hindus and Muslims were so wide as to make them separate nations. Any hope of uniting them under a dramatic system such as that envisaged in the India Act was only a dream. The only solution for India was the establishment of two national states, each autonomous but bound together by international agreements.

Mr Jinnah advised Moslems to depend upon their inherent strength and nothing else; that was their best and only safeguard. They could trust neither British Government nor the Congress. Two and a half years of provincial autonomy had proved that safeguards were a dead letter.

Regarding Palestine, Mr Jinnah said that the British Government must meet the national demands of the Arabs. They could not be satisfied with earnest or best endeavour. As regards the despatch of Indian troops overseas, he said that the definite demand was that Indian troops should not be used against any Muslem power.

Mr Jinnah characterised the constituent assembly proposal as impracticable.

Two Nations

The problem of India is not an inter-communal character, but manifestly of an international one and it must be treated as such . . . '

"There is no reason why these states should be antagonistic to one another. On the other hand, the rivalry and the natural desire and efforts on the part of one to dominate the social order and establish political supremacy over the other in the Government of the country

will disappear. It will tend more towards natural goodwill by international pacts between them and they can live in complete harmony with their neighbours."

DISTINCT CULTURES

"The Hindus and Moslems have different religious philosophies, social customs, literature. They neither inter-marry nor live together and indeed, they belong to two different civilisations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their views on life and of life are different. It is quite clear that Hindus and Muslems derive their inspiration from different sources of history. They have different epics, their heroes are different and they have different episodes. Very often the hero of one is a foe of the other and likewise, their victories and defeats overlap. To yoke together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built up for the government of such a state."

লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সভাপতির অভিভাষণে কায়েদ–ই–আজম ভারতে দুটো পৃথক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেন। এই দু'টি রাষ্ট্রের একটি হবে হিন্দু রাষ্ট্র এবং অন্যটি হবে মুসলিম রাষ্ট্র।

দুই জাতি

তিনি বললেনঃ হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য এত ব্যাপক যে, এই উভয়ই এক একটি পৃথক জাতি। ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন দুটো পৃথক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এর প্রত্যেকটি হবে স্বয়ংশাসিত, কিন্তু আন্তর্জাতিক চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ।

নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি ছাড়া আর কোনো কিছুর ওপর নির্ভর না করার উপদেশ দিয়ে এক কালের কংগ্রেস নেতা কায়েদ–ই–আজম বললেন, মুসলমানরা বৃটিশ সরকারকে কিংবা কংগ্রেসকে, এই উভয়ের কোনোটিকেই বিশ্বাস করতে পারে না।

দু'টি পৃথক জাতি, এ সম্পর্কে কায়েদ–ই–আজম বললেন যে, ভারতীয় সমস্যা কোনো আন্তঃসাম্প্রদায়িক সমস্যা নয়। এ সমস্যা স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক এবং সেভাবেই এটাকে দেখতে হবে।

এই উভয় রাষ্ট্র যে একে অন্যের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হবে, এমনটা ভাবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। বরং প্রতিপক্ষসুলভ আচরণ এবং সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার আকাঙ্ক্ষা ও তৎপরতার এবং দেশের সরকারের ওপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করার বাসনার অবসান ঘটবে। উভয়

সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বদৌলতে বরং একটা শুভেচ্ছার মনোভাব দেখা দেবে। এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ই তখন একে অন্যের প্রতি পুরোপুরি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করতে পারবে।

দুটো স্বতন্ত্র সংস্কৃতি

এই ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে কায়েদ-ই-আজম বললেনঃ 'হিন্দু ও মুসলমান- এই উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়েরই আছে দুটো স্বতন্ত্র ধর্মীয় দর্শন, পৃথক দু'ধরনের সামাজিক রীতিনীতি, আলাদা আলাদা সাহিত্য। তাদের মধ্যে আন্তঃসাম্প্রদায়িক বৈবাহিক সম্পর্ক নেই, তারা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন না এবং এটা সত্য যে, তারা একে অন্যের থেকে পৃথক এমন দুটো সভ্যতা থেকে এসেছেন, যে দু'টি সভ্যতা মূলত পরস্পর বৈরী আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক পৃথকভাবে তাদের নিজ নিজ ইতিহাসের উৎসমুখ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাদের মহাকাব্য আলাদা আলাদা, তাদের নায়করা আলাদা আলাদা এবং তাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলোও আলাদা। প্রায়শই একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আদর্শ নায়ক প্রতিবেশী অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে শত্রু কিংবা শত্রুতুল্য। একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিজয় অনেক সময়ই অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে পরাজয়। অনুরূপভাবে একের পরাজয় প্রায়শই অন্যের কাছে বিজয় বলে পরিগণিত হয়। এভাবে একে অন্যের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন দু'টি জাতির একটিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে এবং অন্যটিকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিসাবে একই রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে রেখে দেশ গড়তে চাইলে সে প্রয়াস ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের আগুনে জ্বলে চরম ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। . . . ."

লাহোরে তিন দিনব্যাপী নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে (২৩ মার্চ ১৯৪০ তারিখে) অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক ভারত বিভাগের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাতে এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ

' . . . . that it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to Muslims unless it is designed on the following basic principle, namely, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, [and] that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North-Western Zones of India, should he grouped to constitute 'Independent States' in which the constituent units shall be autonomous and sovereign'. "Jinnah/Creator of Pakistan" By Hector Bolitho (Pakistan Branch/Oxford University Press/Lahore Karachi Dacca) (Printed in Pakistan by arrangement with John Murry, 1966), Reprinted, 1969 (Page 128-29).

হেক্টর বলিথো'র 'জিন্নাহ্' গ্রন্থ (পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৯, পৃ ১২৮–২৯)–এ যে উদ্ধৃতি আছে তাতে দেখা যাচ্ছে, লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর–পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চল সন্নিহিত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা (ইউনিট) সমূহের পুনর্বিন্যাসের এমন সংস্থানের কথা বলা হয়েছে, যেখানে মুসলমানরাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। মুসলিম অধ্যুষিত ইউনিটগুলির গ্রুপের গঠন–প্রকৃতি এমন হবে, যাতে সেগুলি স্বাধীন প্রদেশসমূহের গঠনের উপযোগী হয় এবং এর ইউনিটগুলি হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।

হেক্টর বলিথো তাঁর গ্রন্থের ১২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, মতলুব সাঈদ এই লাহোর অধিবেশনে ছিলেন। অধিবেশনের কয়েকদিন পরে কায়েদ–ই–আজম নাকি তাঁকে বলেছিলেন :

Iqbal is no more amongst us, but had he been alive he would have been happy to know that we did exactly what he wanted us to do.'

লাহোর অধিবেশনের কয়েক দিন পর মতলুব সাঈদ–এর কাছে কায়েদ–ই–আজমের উক্তিঃ 'ইকবাল আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, তিনি আমাদেরকে দিয়ে যা করাতে চেয়েছিলেন তা আমরা করেছি।'

হেক্টর বলিথো'র উক্ত গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠায় আছেঃ জিন্নাহ্ ১৯৪০-এর মার্চের গোড়ার দিকে একটি ইংরেজী দৈনিকের সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে এবং ৯ মার্চ ১৯৪০–এর 'টাইম অ্যাণ্ড টাইড' পত্রিকায় তাঁর নিজের লেখা নিবন্ধে ভারতের আর্থ–সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে অনুভবের কথা ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিলো অত্যন্ত বিশ্লেষণাত্মক, সূক্ষ্ম ও গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচায়ক। ইংরেজ সাংবাদিককে তিনি বলেন, এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনকে ধ্বংস করা। কংগ্রেস নিজেকে একটি ফ্যাসিবাদী এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা–বিরোধী ও প্রভুত্বকামী সবচেয়ে জঘন্যতম একনায়কতান্ত্রিক সংগঠন হিসাবে দাঁড় করাতে চায়।

তিনি দেশের পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ভোটারের কথা বলেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞ, নিরক্ষর এবং কোনো রকম শিক্ষণ প্রাপ্ত নন। তাঁরা কয়েক শতাব্দীর পরস্পর বিরোধী কুসংস্কার নিয়ে আছেন। ভারতে যে একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার কার্যকর হওয়া আদৌ সম্ভব নয়, সে কথাও তিনি বলেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র বলতে সারা ভারতে কেবলমাত্র হিন্দুরাজ কায়েম হওয়াকেই বোঝায়। এটা মুসলমানদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ অবস্থার মধ্যে মুসলমানরা কখনোই আত্মসমর্পণ করতে পারে না। ইংরেজ পাঠকদেরকে কায়েদ–ই–আজম স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই নিরঙ্কুশ হিন্দু শাসিত সরকারের শিকার কেবলমাত্র মুসলমানরাই হবেন না। ষাট মিলিয়ন অস্পৃশ্য আছেন, ছয় মিলিয়ন খ্রীষ্টান, ইহুদী , পার্সী এবং বসবাসকারী বৃটিশ বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরাও আছেন। তিনি আরো বলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ইংরেজদের উচিত তাদের নিজেদের মাথা থেকে কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উদাহরণগুলো দূর করা। কেননা, এই দেশগুলোতে বৃটিশ গণতন্ত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক ও গভীর শিকড় গাড়তে পেরেছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয়

সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেসের আগ্রাসী তৎপরতার দরুন ভারতীয় পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব নয় এবং লর্ড মর্লির একটি উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "কানাডার কোমল পশু চর্মে নির্মিত কোট' ভারতের চরম গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়ায় কাজ দেবে না।"

'টাইম অ্যান্ড টাইড'–এ লেখা তাঁর নিবন্ধে কায়েদ–ই–আযম বলেনঃ ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী? বৃটিশ সরকারের ঘোষিত নীতি হচ্ছে এই যে, ভারত যত শীঘ্র সম্ভব ওয়েষ্টমিনষ্টার ধাঁচের ডমিনিয়ন ষ্টেটাস পাবে। বৃটেন চাইবে যে, ভারত ঠিক সেই ধরনের সংবিধানই পাক, যে ধরনের সংবিধান বৃটেনের আছে বা যে ধরনের সংবিধানের কথা বৃটেন বুঝতে পারে। কিন্তু ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে বৃটিশ পার্লামেন্টেরও যে কোনো সঠিক ধারণা নেই, সেটা অতীতে দেখা গেছে, সব সময়ই দেখা গেছে। বৃটেন হচ্ছে এক জাতির দেশ, তাই সেখানে যে ধরনের সংবিধান উপযুক্ত ঠিক সেই ধরনের সংবিধান ভারতের মতো বহু জাতির দেশে প্রযুক্ত হতে পারে না।

ইংরেজ সাংবাদিককে ১৯৪০–এর মার্চের গোড়ার দিকে কায়েদ–ই–আযম বলেনঃ 'It has been established beyond doubt . . . that the sole aim of the Congress is to annihilate every other organisation in the country and to set itself up as a Fascist and authoritarian organisation of the worst type.' He spoke of 'the thirty five millions of voters, the bulk of whom are totally ignorant, illiterate and untutored' living in centuries old superstitions thoroughly antagonistic to each other' and of the impossibility of working a democratic parliamentary government in India. He said, '. . . . democracy can only mean Hindu Raj all over India. Then this challenge - 'This is a position to which Muslims will never submit'. Jinnah reminded English readers that Muslims would not be the only victim of such absolute government by Hindus. There were also 'sixty millions of 'Untouchables,' six million Christians, Jews, Parsees and the domiciled British. He also said that in envisaging the political future of India, the English should 'dismiss' from their minds the examples of federal government in Canada and Australia where British democracy had planted natural and thriving roots, and he quoted Lord Morley's dictum that the 'fur coat of Canada', would not do for the extremely tropical climate of India.

In his article in Time and Tide, Jinnah wrote:

'What is the political future of India? The declared aim of the British government is that India should enjoy Dominion Status in accordance with the Stature of Westminster in the shortest practicable time. In order that this end should be brought about, the British Government,

very naturally, would like to see in India the form of democratic constitution it knows best and thinks best, under which the government of the country is entrusted to one or other political Party in accordance with the turn of the elections.

Such, however, is the ignorance about Indian conditions among even the members of the British Parliament that, in spite of all the experience of the past, it is even yet not realised that this form of government is totally unsuited to India. Democratic systems based on the concept of a homogeneous nation such as England are definitely not applicable to heterogeneous countries such as India, and this simple fact is the root cause of India's constitutional ills'.

['JINNAH', Hector Bolitho, Reprinted 1969, P.125-26]

'টাইম অ্যান্ড টাইড'–এ লেখা উক্ত নিবন্ধে জিন্নাহ্ ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কারের ওপর ১৯৩৩–৩৪ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি দেনঃ

'India is inhabited by many races . . . .often as distinct from one another in origin, tradition and manner of life as are the nations of Europe. Two thirds of its inhabitants profess Hinduism in one form or another as their religion, over 77 millions are followers of Islam and the difference between the two is not only of religion in the stricter sense but also of law and culture. They may be said indeed, to represent two distinct and separate civilisations. Hinduism is distinguished by the phenomenon of its caste, which is the basis of its religious and social system, and, save in a very restricted field, remains unaffected by contract with the philosophies of the West; the religion of Islam, on the other hand, is based upon the conception of the equality of man'.

ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কার (ইন্ডিয়ান কন্সটিটিউশনাল রিফর্মস)–এর ওপর ১৯৩৩–৩৪–এ বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ইউরোপ মহাদেশের মতোই ভারতে বিভিন্ন জাতির বাস। এ জাতিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্ভব, ঐতিহ্য ও জীবনধারায় একে অন্যের থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র। ভারতের মোট জনগণের দুই–তৃতীয়াংশ হিন্দু। আর মুসলমান আছেন ৭৭ মিলিয়নের বেশী। হিন্দু ও মুসলমান, এই উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল ধর্মগত কারণে নয়। আইন ও সংস্কৃতির দিক দিয়েও রয়েছে অতি সুস্পষ্ট পার্থক্য। বলা যেতে পারে, উভয়ে প্রতিনিধিত্ব করে পৃথক পৃথকভাবে দুটো স্বতন্ত্র ও আলাদা সভ্যতার। হিন্দুত্বের স্বাতন্ত্র্য তার বর্ণভেদ প্রথায়। হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিই হলো বর্ণভেদ প্রথা। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হলো মানুষের সাম্যের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড–এর সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার ১ অক্টোবর ১৯৮৮ তারিখের সংখ্যায় 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস (১৯০৮–১৯৪৭)' শিরোনামে তাঁর ধারাবাহিক রচনায় অমলেশ ত্রিপাঠী ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে লিখেছেনঃ

'এই প্রসঙ্গে তিনটি কথা মনে রাখতে হবে।

১) লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটা নেই।

২) দেশভাগের আভাসও নেই, আর

৩) এ প্রস্তাব শুধু অস্পষ্ট নয়, স্ববিরোধী। এর তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পূর্বে ও উত্তর–পশ্চিমে দু'টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হবে, যার অংশ (Unit) গুলি হবে 'autonomous and sovereign' স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌম অংশ বলতে কি বোঝায়? দ্বিতীয়ত, মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি নিজেরা সার্বভৌম হবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পর। তবে কি মাঝখানে আর একটা স্তর আছে, অর্থাৎ জিন্নার পক্ষে দর কষাকষির অবসর? তৃতীয়ত, হিন্দু শাসিত অঞ্চলে সংখ্যালঘুর ওপর সুবিচার ও মুসলিম শাসিত অঞ্চলে হিন্দুদের প্রতি সুবিচারের উল্লেখ কি এক ধরনের কেন্দ্রের ইঙ্গিত বহন করছে না? কেন্দ্র থাকবে, দুটো স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হবে, তার আবার সার্বভৌম ইউনিট থাকবে, এ কি অদ্ভুত ব্যবস্থা? সব ভাল করে বিশ্লেষণ করে আমার সিদ্ধান্ত – এটা জিন্নার একটা চাল (ploy বা gambit)। ১৯৪৬ পর্যন্ত জিন্না তথা লীগ অস্পষ্ট ও স্ববিরোধী প্রস্তাবের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি। জিন্না শুধু বলেছেন, হিন্দু ও মুসলমান দুটো আলাদা জাতি, এদের নিয়ে এক রাষ্ট্র গড়া যায় না। বড় লাটেরও মনে হয়েছিলো এটা দর কষাকষির হাতিয়ার, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজ ও গণপরিষদের 'অসম্ভব' দাবির 'অসম্ভব' পাল্টা জবাব।'

মুসলমানদের কেবল ঐতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি নয়, মুসলিম পারিবারিক আইনও হিন্দুদের থেকে বহুলাংশেই আলাদা অর্থাৎ মুসলমানদের সব দিক দিয়েই রয়েছে একটা পৃথক জাতিসত্তা। লাহোর প্রস্তাবে এটা অতি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে এটাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, একটি পৃথক সংবিধানের অধীনে উত্তর–পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলোকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় একটি স্বাধীন–সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না, যদি না ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায় এবং এর সহযোগী ও সুবিধাভোগী প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ–সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের কর্মসূচী গ্রহণ করে।

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবটা পেশ করছিঃ

RESOLUTION ADOPTED BY THE ALL INDIA MUSLIM LEAGUE AT LAHORE IN ITS TWENTY SEVENTH ANNUAL SESSION ON 23RD MARCH 1940, COMMONLY KNOWN AS 'PAKISTAN RESOLUTION'

While approving and endorsing the action taken by the Council and the Working Committee of the All India Muslim League, as indicated in

their resolution dated 27th of August, 17th and 18th of September and 22nd October 1939, and 3rd of February 1940 on the Constitutional issue. This Session of All India Muslim League emphatically reiterates that the scheme of federation embodied in the Government of India Act 1935 is totally unsuited to and unworkable in the peculiar conditions of this country and is altogether unacceptable to Muslim India.

It further records its emphatic view that while the declaration dated the 18th of October 1939 made by the Viceroy on behalf of His Majesty's government is reassuring in so far as it declares that the policy and plan on which the Government of India Act 1939 is based will be reconsidered in consultation with the various parties, interests and communities in India. Muslim India will not be satisfied unless the whole constitutional plan is reconsidered de novo and that no revised plan would be acceptable to the Muslims unless it is framed with their approval and consent.

Resolved that it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles viz, that geograhically contiguous units are demarcated into reigns which should be so constituted, with such territorial re-adjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern Zones of India, should be grouped to constitute 'Independent States' in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for minorities in these units and in the regions for the protection of their religious, cultural, political, administrative and other rights and interests in consultation with them and in other parts of India where the Muslims are in a minority adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

This session further authorises the Working Committee to frame a scheme of constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption finally by the respective regions of all powers such as defence, external affairs, communication, customs, and such other matters as may be necessary.

Proposed by - The Hon'ble Moulvi A K Fazlul Huqe, Premier of Bengal. Seconded by Choudhuri Khaliquzzaman Saheb, M L A (U P)

Supported by Maulana Zafar Ali Khan Saheb (Central).

Supported by - Sardar Aurangzeb Khan Saheb. M L A (N W F Province)

Supported by - Haji Sir Abdoola Haroon M L A (Central)

Supported by - K. B. Nawab Ismail Khan Saheb M L C. (Bihar).

Supported by - Kazi Mohammad Isa Khan Saheb, President of Baluchistan Provincial Muslim League.

Supported by - I. I. Chundrigar Saheb. M L A (Bombay)
Supported by - Syed Abdur Rauf Shah Saheb, M L A (C.P.)
Supported by - Dr Mohammed Alam. M L A (Punjab)
Supported by - Syed Zakir Ali Saheb (U. P.)
Supported by- Begum Sahiba Maulana Mohammad Ali.
Supported by- Maulana Abdul Hamid Saheb Qadri (U. P.)

লাহোর প্রস্তাবে যে আশা-আকাঙক্ষা এবং সঙ্কল্প ব্যক্ত করা হয়েছে, সেটা আরো সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছিলো এর ছ' বছর পর ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসের ৭, ৮ ও ৯ তারিখ- এই তিন দিনব্যাপী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের সম্মেলনে। কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই দিল্লী কন্ভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বাঙলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

দিল্লী প্রস্তাবে অনেকগুলো বিষয় সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। পূর্ব 'জোন' পূর্বাঞ্চল মুসলিম প্রধান অবিভক্ত বাঙলা এবং মুসলিম প্রধান অবিভক্ত আসামকে নিয়ে গঠন করার কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে মুসলিম প্রধান অবিভক্ত পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসমূহ, সিন্ধু এবং বালুচিস্তানকে নিয়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল গঠনের কথা আছে। লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে পরিপূর্ণ সঙ্গতি বজায় রেখেই মূল আকাঙক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে দিল্লী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিলো। কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবও এই মৌলিক আশা-আকাঙক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখেই প্রণীত হয়েছিলো। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত

আনন্দবাজার পত্রিকা. লিমিটেডের সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার 'কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা'য় প্যাটেলপন্থী প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা অতুল ঘোষ 'ভারত বিভাগ/ (কার্য ও কারণ)' শীর্ষক তাঁর নিবন্ধে কেবিনেট মিশন প্রস্তাব সম্পর্কে লেখেন, 'কেবিনেট মিশন প্রদেশগুলিকে তিনটি Group-এ ভাগ করার প্রস্তাব দেন। Group A - মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যা; Group B - উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, বালুচিস্তান, Group ; C - বঙ্গ দেশ ও আসাম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ই মে ১৯৪৬ তারিখে মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব দেনঃ

কেবিনেট মিশনের এই প্রস্তাব ৬ জুন ১৯৪৬ তারিখে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল এটা গ্রহণ করে এবং পরে সংখ্যাগুরুর শাসন চাপিয়ে দেওয়ার সুবিধার্থে পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর নেতৃত্বে ১০ জুলাই ১৯৪৬ তারিখে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। কায়েদ-ই-আযমের নেতৃত্বাধীন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ আবার ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চের লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ৯ এপ্রিল ১৯৪৬ তারিখের দিল্লী প্রস্তাবে ফিরে গেলেন। এ প্রসঙ্গে অতুল ঘোষ তাঁর উক্ত নিবন্ধে লিখেছেনঃ

'মিঃ জিন্না বলেন, 'লীগের দাবী হলো, প্রথমত উত্তর-পূর্বে বাংলা, আসাম ও উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ ও বালুচিস্তান নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র হবে এবং সত্বর সেই রাষ্ট্র গড়ার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।'

'দ্বিতীয়, পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সংবিধানের জন্য আলাদা আলাদা সংবিধান রচনাকারী সংস্থা তৈরী করবে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের জনগণ।'

'তৃতীয়, লাহোরে গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।''

'চতুর্থত, লীগের দাবী মানা ও তা কাজে পরিণত করাই হলো লীগের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেওয়ার অপরিহার্য শর্ত।'

'পঞ্চমত, সংযুক্ত ভারতবর্ষের ভিত্তিতে কোনো সংবিধান বাধ্যতামূলক করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বা কেন্দ্রে লীগের দাবিবিরোধী কোনো অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা অবলম্বনের বিরুদ্ধেও বৃটিশ সরকারকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে, এইরূপ কোনো প্রচেষ্টায় মুসলিম ভারত বাধা দেবে।'

কিন্তু মুসলিম ভারতের বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ রাখা হলো না, ৩ জুন ১৯৪৭ তারিখে কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ যখন ভি পি মেনন, জওহর লাল নেহরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল, মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী অনুমোদিত উপমহাদেশ বিভক্তির মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান মেনে নিলেন।

১৯৪০-এর ২৩ মার্চের লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৬-এর ৯ এপ্রিলের দিল্লী প্রস্তাব, ১৯৪৬-এর ১৬ মে'র কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার মূল চিন্তাধারার কোনো ধার না ধেরে,কোনো তোয়াক্কা না করে ভি পি মেননের সহযোগিতায় এবং নেহরু, প্যাটেল, গান্ধীর অনুমোদনক্রমে মাউন্টব্যাটেন অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন সেটাই তিনি ১৯৪৭ সালের জুন

মাসের ৩ তারিখে কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে ডেকে এই হুমকির মুখে মানতে বাধ্য করলেন যে, এটা না মানলে শাসন ক্ষমতা তারা হিন্দুদের হাতে দিয়ে চলে যাবেন। এই মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা, আসাম এবং পাঞ্জাবকে ভাগ করা হলো, এমনকি মুসলিম প্রধান এই প্রদেশগুলির অনেক মুসলিম প্রধান জেলা যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হলো এ সবই ১৯৪০ -এর ২৩ মার্চের লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৬-এর ৯ এপ্রিলের দিল্লী প্রস্তাব এবং ১৯৪৬-এর ১৬ মে'র কেবিনেট মিশন প্রস্তাবের পরিপন্থী।'

এ প্রসঙ্গে কেবল এটুকুই সত্য যে, মুসলিম লীগের আর্থ-সাংস্কৃতিক দাবী-দাওয়া কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন তুঙ্গে না উঠলে ঐ পোকায় কাটা ভঙ্গুর পাকিস্তানটুকুও পাওয়া যেতো না। অন্তত আবুল হাশিমের লেখা 'INTEGRATION OF PAKISTAN', হেক্টর বলিথো'র লেখা 'JINNAH/Creator of Pakistan,'-এম আকবর উদ্দীনের লেখা 'কায়েদে আযম' এবং হামিদুল হক চৌধুরীর 'MEMOIRS' যাঁরা পড়েছেন তাঁদের পক্ষে এটা অস্বীকার করা খুবই কঠিন হবে যে, উপমহাদেশ বিভক্তির প্রস্তুতি কংগ্রেসের থাকলেও মুসলিম লীগের তা আদৌ ছিলো না। এই প্রেক্ষিতে অমলেশ ত্রিপাঠীর সঙ্গে আমিও একমত যে, লাহোর প্রস্তাবটি ছিলো মুসলিম লীগের তরফে আদতে চাপ সৃষ্টির একটা কৌশল। তদুপরি আবুল হাশিম সাহেব তাঁর 'ইন্টিগ্রেশন অব পাকিস্তান' গ্রন্থে ঠিকই লিখেছেন যে, ৩ জুন ১৯৪৭ তারিখে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব যেমন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেলো ঠিক তেমনি কংগ্রেসের অবিভক্ত ভারতের দাবীও নিতান্তই মেকী বলে প্রমাণিত হলো। আবুল হাশিম সাহেবের ভাষায়ঃ

'Some are of opinion that East Pakistan should constitute an independent state Inter alia the burden of their argument is that the Lahore resolution of 1940 which was aopted in 1941 in the Madras Session of the Muslim League as the creed of the Muslim League, contemplated creation of two independent and sovereign homelands for the Muslims of the sub-continent, one comprising of Bengal and Assam and the other comprising of the Punjab, Sind, Baluchistan, North West Frontier Province and Kashmir. Muslim League movement for freedom on the basis of a united India is also dead. They were buried jointly by the Congress and the Muslim League at Delhi on the 3rd of June, 1947 when they accepted Mountbatten Plan. It is therefore, futile to think of their resurrection. It is as much ridiculous now for the peoples of India to think of a United India as it is for the Pakistanis to think of dividing Pakistan on the basis of Lahore Resolution. Referring back to 'the Lahore Resolution is merely a political camouflage for liquidation of Pakistan'.

[INTEGRATION OF PAKISTAN/ABUL HASHIM. P-29-3o]

আবুল হাশিমের দেওয়া বিবরণঃ

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে উত্থাপিত পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে। সেখানে উত্তর পূর্বে অবিভক্ত বাংলা এবং অবিভক্ত আসামকে নিয়ে উত্তর-পশ্চিমে অবিভক্ত পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং কাশ্মীরকে নিয়ে দুটো স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম আবাসভূমি গঠন করার কথা ছিলো। কিন্তু লাহোর প্রস্তাব অনুসারে মুসলিম লীগের স্বাধীনতা আন্দোলনের এবং অবিভক্ত ভারত কেন্দ্রিক কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের দেহাবসান ঘটেছে এবং এই উভয়ই সমাধিস্থ হয়েছে ৩ জুন ১৯৪৭ তারিখে দিল্লীতে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করার সাথে সাথে। লাহোর প্রস্তাবকে কবর দেওয়া হয়েছে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। এরপর আবার লাহোর প্রস্তাবের কথা বলা কংগ্রেসের তরফে মহাভারতের স্বপ্ন দেখার মতোই হাস্যকর। তবে পাকিস্তানে যারা লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের কথা বলেছেন তারা যে আদতে পাকিস্তানের অস্তিত্বের অবসান ঘটনোর লক্ষ্যেই সে কথা বলেছেন- এ বিষয়ে আবুল হাশিম সাহেব সুনির্দিষ্ট ধারণা পোষণ করতেন।

অন্যদিকে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান কীভাবে রচনা করা হয়েছিলো সে বিষয়টা জানা থাকলে আর লাহোর প্রস্তাবের তথাকথিত বাস্তবায়নের প্রশ্ন ওঠার কথা নয়। হামিদুল হক চৌধুরী ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'মেময়ার্স'-এ লিখেছেন, ওয়াভেলের জায়গায় ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ২৪ মার্চ ১৯৪৭ তারিখে। তাঁর আসায় উপমহাদেশের দেশগুলোর ভাগ্য সিলমোহরাঙ্কিত হয়ে গেলো। তাঁর আসার পনেরো মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে বলে বৃটিশ সরকার তাঁকে অবহিত করেছেন। কোনো প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা মাউন্টব্যাটেনের ছিলো না। তিনি ছিলেন রাজপরিবারের আত্মীয় এবং সামরিক বাহিনীর লোক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে বর্মা সীমান্তে তিনি কমাণ্ডার-ইন-চীফ ছিলেন। সেই সময় হিন্দু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর একটা যোগাযোগ ঘটে এবং সেই সময়েই কংগ্রেসের দিকে তিনি ঝুঁকে পড়েন অথচ ভারতীয় রাজনীতি, ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক স্বার্থ, ভারতের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুভূতি সম্পর্কে তিনি কিছু বিন্দুমাত্র অবহিত ছিলেন না; ১৯৪৬'র ডিসেম্বরের লণ্ডন কনফারেন্স ব্যর্থ হওয়ার পর এমন একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন লোককে ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেলের দায়িত্বভার দিয়ে যে পাঠানো হলো তা কেবলমাত্র বৃটেনের শ্রমিক দল, রক্ষণশীল দল এবং ভারতীয় কংগ্রেস দলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার সুবিধার্থে। হামিদুল হক চৌধুরী আরো লিখেছেনঃ

'The choice was unfortunate. Mountbatten was not neutral or objective. During his Burma days he had established contact with the Hindus and his bias tended in favour of the Congress. Mountbatten came seized with the single minded objective to associate his name with India's freedom. His purpose was to hand over power and his immediate objective was to be a friend to those politicians that would enhance his own name and role. The Congress became his

immediate target and Jawaharlal Nehru the means. Nehru had become Congress President when Maulana Azad stepped down in May 1946 after seven years as President believing that India was at last about to obtain freedom. All previous Governor General had sought Azad's guidance and moderation. Now the leadership was polarized with Jinnah on the one hand, Nehru on the other. Mountbatten realised that Azad like Wavell was deeply committed to the Cabinet Mission Plan and so he effectively bypassed him.'

ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল হিসাবে মাউন্টব্যাটেনের নির্বাচনটা বিশেষত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হয়েছে। মাউন্টব্যাটেন কোনোক্রমেই নিরপেক্ষ ছিলেন না এবং কোনো ব্যাপারেই নিরপেক্ষতার পরিচয় দেননি। বর্মায় থাকতে হিন্দুদের প্রতি তিনি যে বিশেষ যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং কংগ্রেসের প্রতি তিনি যে রকম ঝুঁকে পড়েছিলেন, তাঁর সেই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণই ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল হওয়ার পর তার সমস্ত সিদ্ধান্তে, সমস্ত কাজকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর লক্ষ্য কেবল একটাই ছিলো এবং সেটা এই যে, ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে তাঁর নিজের নামটা সংযুক্ত করা। শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব নিয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর নাম ও ভূমিকাকে যাঁরা গৌরবান্বিত ও সম্প্রসারিত করার সুযোগ দেবেন তিনি কেবল তাঁদেরই বন্ধু হতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস তাঁকে সেই সুযোগ দিয়েছে এবং এ বিষয়ে বিশেষ মাধ্যম এবং সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন জওহরলাল নেহরুকে। নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই উভয়েরই একজন অন্যজনকে প্রভাবিত অবশ্যই করেছেন।

মওলানা আবুল কালাম আজাদের স্মৃতিকথা 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' পড়লে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, কেবিনেট মিশন প্ল্যানকে তিনি ভারতীয় সমস্যাদি সমাধানের ভারতীয় হিন্দু মুসলমানদের আর্থ–সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও সহনীয় পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু একটা কঠিন সময়ে সাত বছর কংগ্রেসের দায়িত্বভার পালনের পর অতিরিক্ত আস্থা ও বিশ্বাসের দরুন সে দায়িত্বভার তিনি যখন নেহরুর হাতে তুলে দেন তখন তিনি বুঝতে পারেন নি যে, নেহরু এবং অন্যান্য হিন্দু নেতৃবৃন্দ কেবিনেট মিশন প্ল্যান বানচাল করতে চাইবেন। ওয়াভেলের মতো মওলানা আবুল কালাম আজাদ যে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনাকে কতখানি গুরুত্ব দেন, সেটা মাউন্টব্যাটেন জানতেন বলে মওলানা আজাদকে তিনি এড়িয়ে গেছেন এবং কাজকর্ম যা করেছেন তা ভি পি মেননের সহযোগিতায়, নেহরুর মারফত এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে।

মাউন্টব্যাটেন তাঁর সহযোগী এবং পথ প্রদর্শক হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন একজন ভারতীয় হিন্দু আমলাকে, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। এই ভি পি মেননকে তিনি পেয়েছিলেন কেবল সচিব হিসাবে নয়, কংগ্রেসের সঙ্গে নির্ভরযোগ্য যোগাযোগের একটা উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবেও।

হামিদুল হক চৌধুরী তাঁর 'মেময়ার্স'—এ লিখেছেন :

'Mountbatten picked up as his aide and guide an Indian bureaucrat, one VP Menon, who was Secretary in the Delhi Secretariat for Commonwealth Relations. He was a man closely associated with Sardar Vallavbhai Patel and therefore, constituted a useful contact point with the Congress clearly, the tilt in favour of the Congress took root from the very beginning .

Mountbatten meanwhile evolved his own plan for transfer of power, to be tested shaped by Congress advice. His initial idea was a plan of partition in which the Province of Bengal would become a free and independent state. On 9 May, 1947 he invited Nehru to stay with him for a day or two in Simla to elicit his reactions to the plan prepared by him with the help of Menon. At 9 P M that night he handed Nehru the plan for reading Nehru's reaction was one of outraged rejection. He opposed any possibility of giving up Calcutta from a Hindu India. Mountbatten quickly retracted the proposal and asked Menon to draw up an alternate plan before Nehru left Simla that night. On the evening of 10 May, 1947 a new proposal was drawn up by Menon. Ironically, what the Cabinet Mission had taken four months to draw up in a workable plan, Menon and Mountbatten accomplished in Simla, in less than fourteen hours. Nehru agreed to this proposal an hour before he left the Viceroy's house for New Delhi. This was the birth of the infamous 'Dicky Bird' Plan,

[MEMOIRS, HAMIDUL HUQ CHOWDHURY, 1989, P.110-111]

অতএব সুস্পষ্ট যে, ১৯৪০–এর ২৩ মার্চের লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৬–এর ৯ এপিলের দিল্লী প্রস্তাব, ১৯৪৬–এর ১৬ মে'র কেবিনেট মিশন প্রস্তাব, এই সব কিছুই নাকচ করে দিয়ে বা এড়িয়ে গিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেছিলেন এবং সেটাই বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের পরামর্শে একটা আকার বা রূপ দিয়েছেন। তিনি শুরুতেই এই অনড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি উপমহাদেশ ভাগ করবেন। তবে তাঁর এই বিভাগ পরিকল্পনায় গোড়ার দিকে বাংলা বিভাগের পরিকল্পনাটা আসেনি। গোড়াতে তাঁর মাথায় এটাই ছিলো যে, বাংলা প্রদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম হবে। ১৯৪৭–এর মে মাসের ৯ তারিখে তিনি জওহর লাল নেহরুকে তাঁর সাথে সিমলায় দু'এক দিন থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ভি পি মেননের সহযোগিতায় তিনি যে বিভাগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন, সে বিষয়ে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জওহর লাল নেহরুর প্রতিক্রিয়া জানাটাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। ১৯৪৭–এর মে মাসের ৯ তারিখের ঐ রাতেই তাঁর পরিকল্পনাটা নেহরুকে পড়তে দিলেন। নেহরু এ পরিকল্পনাটার

ওপর চোখ বুলিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি জানালেন যে, হিন্দু ভারত থেকে কলকাতাকে বিচ্ছিন্ন করে ত্যাগ করার যে কোনো সম্ভাবনারই তিনি বিরোধী। নেহরু এ প্রতিক্রিয়ায় তন্মুহূর্তেই সাড়া দিলেন এবং ভি পি মেননকে সত্বর একটা বিকল্প পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বললেন, যাতে ঐ রাতে নেহরুর সিমলা ত্যাগের আগেই তাঁর সামনে পেশ করা যায়। পর দিন অর্থাৎ ১৯৪৭-এর ১০ মে'র সন্ধ্যায় ভি পি মেনন একটা নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেন। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসটা এখানে এই যে, একটা কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে কেবিনেট মিশন যে বিষয়ে চার মাস সময় নিয়েছিলো, গুরুত্বপূর্ণ সেই একই বিষয়ের কাজটা ভি পি মেনন এবং মাউন্টব্যাটেন সেরে দিলেন মাত্র চৌদ্দ ঘন্টায়। সিমলায় বড় লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বাসা থেকে রওয়ানা হওয়ার মাত্র এক ঘন্টা আগে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে নেহরু নয়া দিল্লী রওয়ানা হন। কুখ্যাত 'ডি কি বার্ড' পরিকল্পনার জন্ম এভাবেই হয়।

উক্ত গ্রন্থের ১১১ এবং ১১২ পৃষ্ঠায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন লিখেছেনঃ

'Knowing that the Congress would not swallow such a proposition wholesale, Mountbatten elaborated a scheme that would cripple the importance and territorial extent of the Muslim majority Provinces.He stated that he himself would propose that both Bengal and Punjab be partitioned with only Muslim majority areas going to Pakistan and the residual parts forming Hindu India. Ironically again, the idea of Partition of Bengal and Punjab did not come from any non-Muslim, Bengalee or Punjabi interest, it was Mountbatten's own idea which he subsequently forced the Muslim League to accept it. Congress leaders meanwhile including Patel, Nehru and Gandhi in that order hastened to follow it opposing it bitterly and incessantly till the last was Abul Kalam Azad. MEMOIRS.[Hamidul Huq Chowdhury, 1989, P111-112]

মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান কংগ্রেস যাতে খুশী হয়ে গলধঃকরণ করে সেই লক্ষ্যে মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেসকে সুনিশ্চিত করেছিলেন যে, এমন একটা খর্বীকৃত, পোকায় কাটা পাকিস্তান দেওয়া হবে যাতে তার অস্তিত্বের কোনো গুরুত্ব না থাকে এবং যাতে সে সদাই বিপন্ন বোধ করে, মুসলিম প্রধান প্রদেশ বাংলা এবং পাঞ্জাব ভাগ করার প্রস্তাব তিনি নিজেই দেবেন। এই মুসলিম প্রধান এদেশগুলো ভাগ করার প্রস্তাব পরে মুসলিম লীগকে মানতে বাধ্য করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন।যথাক্রমে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহরু এবং মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী এই প্রস্তাব ইতোমধ্যে তড়িঘড়ি করে অনুমোদন করেছিলেন। অত্যন্ত তীব্রভাবে বরাবর এই প্রস্তাবটির আপ্রাণ বিরোধিতা যিনি করেছিলেন, তিনি কংগ্রেসের এক সময়কার সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ।

হামিদুল হক চৌধুরী তাঁর ঐ গ্রন্থের ১১২ এবং ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

'Having secured Nehru's agreement, Mountbatten finalised his plan. He now had to get the concurrence of his own Government and the Muslim eague. For this purpose not only to sell the plan to the British Cabinet but also to radically advance the date for its implementation, so that the British would give up their responsibility in India within only 64 days of Attlee's announcement to hand over powers, i e, instead of 30 June 1948 he now advocated 15 August 1947. The purpose behind this drastic manoeuvre was to preclude any time for discussion or rethinking over the consequences of the plan and the division of India. British withdrawal would be made a fait accompli and any second thoughts however necessary, would be ruled out.

Mountbatten succeeded in his efforts. He was to win over both the Conservative leaders as well as Labour, in going along with the plan. Churchill was advanced in age and the Conservative leaders had too little time to demur or discuss the issues among themselves. They went along with Mountbatten whom they considered one of their own.

Attlee, finding that the Conservatives would not place any barriers in the path of necessary legislation for advancing the date of transfer of British power, easily agreed to the proposal. Everything was accomplished before Mountbatten left London. He reached Delhi on 2 June, 1947. This within a week after securing Congress acceptance he had sold his plan to the British. The Muslim League had until then been left in the cold. On 3 June 1947 Mountbatten summoned Jinnah and Nehru and placed before them the plan of partition. Jinnah was faced with no alternative but to take it or to leave it. Both leaders were asked to give their decision within the hour.

Thus the partition plan was conceived and imposed on the Indian leaders. A host of questions remain unanswered to this day In its wake was engendered a tremendous cycle of massacre, murder, kidnapping, rape and riot extending over six months and unparalleled in the history of the world. Four million people died. Many times that number were displaced and rendered homeless. Refugees were forced to move accompanied by economic and social havoc, suffering

and ever present danger to life and property. These were to leave scares that never really healed and were transmitted to succeeding generations. The migration would be the largest in human history.

Mountbatten remained indifferent to the human misery that he had unleashed.'

জওহরলাল নেহরুর সম্মতি নিয়ে মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছিলেন। আবার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তারিখও তিনি অস্বাভাবিকভাবে এগিয়ে নিয়ে এলেন। অ্যাটলি ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৯৪৮ সালের ৩০ জুনের মধ্যে স্বাধীনতা দেবেন। মাউন্টব্যাটেন সেই তারিখটা এগিয়ে নিয়ে এলেন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টে। অর্থাৎ অ্যাটলির ঘোষণার চৌষট্টি দিনের মধ্যে তিনি এটা কার্যকর করার তৎপরতা চালালেন। ভারতীয় জনগণকে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে, বিশেষত ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে তিনি এই বিভাগ এবং এর পরিণাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার, আলোচনা করার কিংবা তা পুনর্বিবেচনা করার কোনো সময় ও সুযোগ দিতে চাননি বলেই তিনি কাজটা এত তড়িঘড়ি সারতে চেয়েছিলেন।

মাউন্টব্যাটেন তাঁর এই পরিকল্পনায় সার্থক হয়েছিলেন। বৃটেনে তিনি রক্ষণশীল দল এবং শ্রমিক দল, উভয় দলেরই সমর্থন পেয়েছিলেন। চার্চিল তখন বয়সের ভারে আক্রান্ত। তদুপরি রক্ষণশীল দলের তখন আর এ নিয়ে সময় নষ্ট করার মতো সময়ও ছিলো না, এ কথা ঠিক সত্য না হলেও এটা ঠিক যে, মাউন্টব্যাটেনকে তারা রক্ষণশীল দলেরই একজন বলে মনে করতেন।

ভারতের স্বাধীনতা দেওয়ার তারিখ প্রায় এগারো মাস এগিয়ে নিয়ে এসে তাঁর ঘোষণার মাত্র চৌষট্টি দিনের মধ্যে তা কার্যকর করার ব্যাপারে রক্ষণশীল দলও আর আপত্তি করবে না জেনে শ্রমিক দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিও আর আপত্তি করলেন না। বিশেষত তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক নেহরুজীদের প্রতি শ্রমিক দলের একটা পক্ষপাতিত্বও কাজ করেছিলো। সংশ্লিষ্ট সবার অনুমোদন নেওয়ার কাজটাও মাউন্টব্যাটেন লণ্ডনে থাকতে থাকতেই খুব সহজে করিয়ে নিতে পারলেন।। মাউন্টব্যাটেন দিল্লী পৌঁছলেন ১৯৪৭-এর জুন মাসের ২ তারিখে। এ ভাবে কংগ্রেসের অনুমোদন লাভের মাত্র এক সপ্তার মধ্যে বৃটিশ অনুমোদন তিনি পেয়ে গেলেন। ষড়যন্ত্রের চেহারাটা ছিলো এই রকম যে, তখনও পর্যন্ত মুসলিম লীগ কিংবা মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাউকে এ বিষয়ে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানতে দেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ৩ জুন ১৯৪৭ তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লীতে আনুষ্ঠানিকভাবে নেহরুকে এবং কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে ডেকে পাঠালেন। ভি পি মেননের সহযোগিতায় এবং নেহরু, প্যাটেল, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী প্রমুখের পরামর্শক্রমে প্রণীত এই পরিকল্পনা লর্ড মাউন্টব্যাটেন আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস সভাপতি জওহর লাল নেহরু এবং মুসলিম লীগ সভাপতি কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সামনে পেশ করে তা এক ঘন্টার মধ্যে পুরোপুরি গ্রহণ কিংবা বর্জন করতে বললেন। গ্রহণ না করলে শাসনক্ষমতা তিনি কংগ্রেস তথা হিন্দুদের হাতে দিয়ে যাবেন বলে হুমকিও দিলেন। এই পরিস্থিতিতে কায়েদ-ই-আযম মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অযৌক্তিকভাবে দেশ

বিভাগের এই অপরিণামদর্শী কুখ্যাত মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান কয়েক কোটি লোককে ভিটেমাটি ছাড়া, ঘরছাড়া, নিঃস্ব, সর্বহারা করেছে। দেশ বিভাগের সময় একটানা বৎসরাধিককাল সাম্প্রদায়িক-খুন, জখম, অপহরণ, ধর্ষণ, ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তির জবরদখল, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির যে উন্মত্ততা চলেছে, তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। অন্তত চল্লিশ লক্ষ লোক এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে। বিভাগজনিত কারণে যে ব্যাপক দেশ ত্যাগের ঘটনা ঘটেছে, এত বড় নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। এই হত্যাযজ্ঞ, বলাৎকার এবং লুটপাটের এই মহোৎসব, এই নারকীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে কুখ্যাত মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানের উদ্ভাবক, বৃটিশ ভারতের বড়লাট, স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন সাহেব বরাবর নির্বিকার ছিলেন। ষড়যন্ত্রপ্রিয় অপরিণামদর্শী পাষণ্ডপ্রতীম এই রাজপুরুষ এবং তাঁর কুখ্যাত পরিকল্পনার কারণে আজো কোটি কোটি মজলুম দীর্ঘশ্বাস, চোখের পানি ফেলে। বাঙলা, আসাম, পাঞ্জাবের বিভক্তি, বিশেষত বাঙলা এবং পাঞ্জাব বিভাগজনিত কারণে সারা ভারতব্যাপী যে হত্যাযজ্ঞ, লুটপাট, ধর্ষণ, দখলদারি, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি চলে সেই মর্মান্তিক দৃশ্যের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও আছে বলে অন্তত প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ, সমসাময়িকদের কেউ বিশ্বাস করেন না। কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে বাঙলা বিভাগ চাননি এবং বাঙলা বিভক্ত না হয়ে স্বাধীন হলেও যে তাঁর আপত্তি ছিলো না সে কথা হামিদুল হক চৌধুরী তাঁর গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

'Many Muslims and an important section of Hindus were opposed to the partition of Bengal. Indeed, Jinnah conceded that if the Bengalees did not want partition he would have no objection to their having an independent state altogether, as was envisaged in the earlier plan'.

তাঁর উক্ত স্মৃতিকথার ১১৫ থেকে ১১৭ পৃষ্ঠায় হামিদুল হক চৌধুরী লিখেছেন যে, ১৯৪৭ সালের ৩ জুন তারিখে ঘোষিত ভারত বিভাগ সম্পর্কিত মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানের অন্যতম বিষয় ছিলো এই যে, উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিম প্রধান এলাকাগুলো নিয়ে পাকিস্তান হবে। কিন্তু হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট মাউন্টব্যাটেন পরে ১৯৪৭-এর ৩ জুনে ঘোষিত এই প্ল্যানেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। বাঙলা বিভাগ বিশেষত বাঙলার মুসলমানদের কাছে এক প্রচণ্ড আঘাত হিসাবেই এসেছিলো। বাংলার সমস্ত মুসলিম নেতা, বিশেষত বাঙলার আইনসভার নির্বাচিত মুসলিম সদস্যদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নেহরু, প্যাটেল, গান্ধী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীদেরকে খুশী করার জন্য বাঙলায় মুসলিম লীগ শাসনের অবসান ঘটিয়ে কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন জেলাগুলোকে হিন্দু ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেন এর পরও কার্যকর প্রভাব খাটিয়েছেন। বাঙলার চূড়ান্ত বিভাজন এবং সীমানা নির্ধারণের ভার মাউন্টব্যাটেন অবিবেচকের মতো অর্পণ করেছিলেন তারই এক বশংবদ কেবলমাত্র সিরিল র‍্যাডক্লিফেরই ওপর। এ রকম একটা ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে সেরেছিলেন। র‍্যাডক্লিফ থাকতেন বৃটিশ ভারতের বড়লাট এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বাসভবনেরই একটি কক্ষে। হামিদুল হক চৌধুরীর নিজের ভাষায়ঃ

'The 3 June, 1947 announcement on the partition of India, also defined the boundaries of the two emerging states. The established formula was that all contiguous Muslim majority areas in the Eastern and Western Zone of the Sub-continent would go to Pakistan. However, Mountbatten altered the formula of the 3 June announcement and left open the possibility that the pockets of non-Muslim majority areas within the Muslim majority territory could be allocated to India. This created shock waves among the Muslims of Bengal. Not only was Calcutta to go to India but also some of the districts where the Muslims were in a majority or constituted half the population. This division was however tentative. The final division and marking of the boundary was to be made by Cyril Radcliffe.

Radcliffe's appointment legged controversy. He was Mountbatten's choice and therefore was biased in favour of the Hindus. The Muslim League had suggested that the boundary should be entrusted to three Judges of the Privy Council. Alternately, they held that a team to be selected by the United Nation's Security Council could be used. Mountbatten overruled these suggestions with the advancement of the date from June 1948, originally announced by Clement Attlee to 15 August 1947 by Mountbatten, all subsequent developments were to be controlled by that date irrespective of its effects on millions of people of the whole sub-continent the appointment of a single person to arbitrate in such a vital matter as boundary demarcation and in such haste was obviously brought with danger. I expressed my serious apprehensions to Jinnah on this question. Strangely, Jinnah assured me that Cyril Radcliffe was known to him and had his full confidence. Ironically enough the Congress was itself initially critical of giving such a big responsibility to one man. Jinnah told me not to persist with my objections and asserted that Radcliffe was a very dependable man. Jinnah was wrong, and it proved unfortunate for the country.

Radcliffe was to deal with Muslim rights in the most cavalier manner. It became apparent that his award was dictated at the instance of Mountbatten. He spent most of his time in India (less than six weeks) with Mountbatten. He stayed in Viceroy's house occupying a room which became his office. He physically visited Bengal only once and

that only for a day. He never heard the representatives of the parties who appeared before the Judges appointed for the purpose, two from each party. Radcliffe never sat even once with the Tribunal, when I or anybody else addressed the 4 Judges.

Radcliffe had a cut and dried task. He had to secure Calcutta for India, as much of the surrounding area, be it Muslim majority or not, so as to make Calcutta viable'

[MEMOIRS, HAMIDUL HUQ CHOWDHURY,1989, p 115-116]

৩ জুন, ১৯৪৭ তারিখের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় বলা হয়েছিলো, ভারত বিভাগ এই ফরমুলা অনুসারে হবে যে, উপমহাদেশের পূর্ব এবং পশ্চিমাঞ্চলের সংলগ্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলি নিয়ে পাকিস্তান হবে। ৩ জুন, ১৯৪৭ তারিখে ঘোষিত এই পরিকল্পনার অনেক রদবদল আবার মাউন্টব্যাটেন পরে নিজেই করেছেন। কেননা, পরে তিনি আবার এই সম্ভাবনার কথাও বললেন যে, মুসলিম প্রধান ভূখণ্ডগুলোর মধ্যে যে অমুসলিম প্রধান পকেটগুলি রয়েছে সেগুলি ভারতের ভাগে বরাদ্দ করা হতে পারে। বিশেষত বাংলার মুসলমানদের কাছে এটা এক চরম আঘাত হিসাবে এলো। নেহরুজীদের আবদার মোতাবেক ভারতকে যে কলকাতা দিতে হবে, কেবল তা-ই নয়, কলকাতা সংলগ্ন মুসলিম প্রধান জেলাগুলিকে এবং যে সব জেলায় মুসলমানরা আধাআধি সে সব জেলাগুলিকেও নিছক কলকাতার নিরাপত্তা রক্ষার্থে ভারতকে দিতে চাইলেন পক্ষপাতদুষ্ট বড়লাট মাউন্টব্যাটেন। তবে চূড়ান্ত বিভাগ এবং সীমান্ত নির্ধারণের কাজটা মাউন্টব্যাটেন সরকারীভাবে দিলেন তারই অন্যতম বশংবদ সিরিল র‍্যাডক্লিফের হাতে।

র‍্যাডক্লিফের এই নিয়োগ অবশ্য বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলো। আজ্ঞাবহ হবেন জেনে মাউন্টব্যাটেনই তাঁকে পছন্দ করে এনেছিলেন এবং লোকটি ছিলেন বড্ড বেশী হিন্দু ঘেঁষা এবং হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতপুষ্ট। নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে মুসলিম লীগ কিন্তু সুপারিশ করেছিলো যে, সীমান্ত নির্ধারণের কাজটা প্রিভি কাউন্সিলের তিনজন বিচারপতির ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক। আর সেটা যদি না হয়, এর বিকল্প হিসাবে মুসলিম লীগ সুপারিশ করলো যে, সীমানা নির্ধারণের এই কাজটা জাতিসংঘ নির্বাচিত একটা টীমের হাতে দেওয়া হোক। মাউন্টব্যাটেন এ সব সুপারিশের কোনো তোয়াক্কা করলেন না। মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে এই গর্হিত কাজটা তিনি অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলকভাবে তড়িঘড়ি করতে চাইলেন। বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা দেওয়ার তারিখ খোদ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী যেখানে ধার্য করেছিলেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসে, মাউন্টব্যাটেন সেখানে উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষের ওপর এর বিরূপ প্রভাবের কথা চিন্তা না করে তারিখটা এগিয়ে নিয়ে এলেন ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টে। সীমানা নির্ধারণের মতো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িত্ব ও অধিকার কোনো ব্যক্তিবিশেষের ওপর ছেড়ে দেওয়াটা যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে, সেটা পরে সিরিল র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ থেকে দেখা গেছে। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ থেকে পরে এটা সুস্পষ্ট বোঝা গেছে যে, সীমানা নির্ধারণের কাজটা তিনি করেছেন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশ্যমূলক নির্দেশাবলী মোতাবেক। ভারতে তিনি কাটিয়েছেন ছ' সপ্তাহেরও কম সময় এবং প্রায় পুরো সময়টাই তিনি কাটিয়েছেন

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে। বড়লাট মাউন্টব্যাটেনেরই বাসভবনের একটা কামরায় তিনি থাকতেন এবং এটাই তাঁর অফিসে পরিণত হয়েছিল। তিনি নিজে বাঙলা সফর করেছেন মাত্র একবার এবং তা মাত্র একদিনের জন্য। মুসলিম লীগসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষের যে সব প্রতিনিধি এ বিষয়ে নিয়োজিত চারজন বিচারপতির সামনে বক্তব্য পেশ করেছিলেন, তাদের কথাবার্তা তিনি কখনো শোনেননি। এ বিষয়ে নিযুক্ত ট্রাইবুনালের সঙ্গে তিনি একবারও বসেন নি। চারজন বিচারপতির সামনে মুসলিম লীগের তরফ থেকে বক্তব্য পেশ করেছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী। হিন্দুদের পক্ষে অনেক দল এবং সংগঠন বক্তব্য পেশ করেছিলেন। হামিদুল হক চৌধুরী সে সময় কখনই র‍্যাডক্লিফকে বিচারপতি চারজনের পাশে দেখতে পাননি।

র‍্যাডক্লিফের কাজটা ছিলো খুবই সহজ এবং সংক্ষিপ্ত। যেমন, কলকাতাকে হিন্দুদের হাতে তুলে দিতে হবে এবং কলকাতাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এর পার্শ্ববর্তী মুসলিম প্রধান জেলাগুলোকেও তুলে দিতে হবে হিন্দু ভারতের হাতে। মুসলিম প্রধান জেলা চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া, দিনাজপুর দিয়ে দেওয়া হলো হিন্দু শাসিত ভারতকে। যশোর থেকে মুসলিম প্রধান মহকুমা বনগাঁ কেটে নিয়ে জুড়ে দেওয়া হলো ভারতের সাথে। এ সব কিছুই করা হলো ৩ জুন ১৯৪৭ তারিখে দেওয়া মাউন্টব্যাটেনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। এই একই কাজ আসামের ক্ষেত্রেও করা হলো। সিলেটের করিমগঞ্জ এবং এর সংলগ্ন কাছাড় জেলার মুসলিম প্রধান মহকুমা ভারতকে দিয়ে দেওয়া হলো ত্রিপুরা স্টেটের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার সুবিধার্থে। ত্রিপুরার মহারাজা যাতে ভারতে যোগ দেন সেই লক্ষ্যে মাউন্টব্যাটেন তাঁর ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। ট্রাইবুনাল যখন শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরার ভারতে যোগদানের পক্ষে রায় দিল তখন অগত্যা তিনি তা মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৪৮–এর জুন থেকে ১৯৪৭–এর ১৫ ই আগস্টে সময় এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটাও ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়কে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলো। মাউন্টব্যাটেনের পক্ষপাতপুষ্ট খেয়ালখুশী মোতাবেক র‍্যাডক্লিফও তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার সপক্ষে অজুহাত খুঁজে পেয়েছিলেন। ১৯৪৭–এর আগস্টে মাত্র একটি দিনে খেয়ালখুশী মোতাবেক হিন্দুদের মনস্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে লাল দাগ মেরে তিনি বাঙলাকে ভাগ করেছিলেন। এই পুরো কাজটা সমাধা করতে তাঁর তিন সপ্তাহেরও কম সময় লেগেছিলো। ম্যাপের ওপর লাল কালি দিয়ে র‍্যাডক্লিফ লাইন টানা হলো। ইতিহাসের সবচেয়ে অবিবেচনাপ্রসূত ও নিষ্ঠুরতম সীমান্ত রেখা টানা হলো এইভাবে। হামিদুল হক চৌধুরী এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, মাউন্টব্যাটেন কেবল ভারতের নয়, একই সঙ্গে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হতে চেয়েছিলেন। কায়েদ–ই–আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এতে সম্মত হননি। মাউন্টব্যাটেন এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কায়েদ–ই–আযমকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। অবশ্য কায়েদ–ই–আযম বিষয়টির অন্য একটা দিকের কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, গভর্নর জেনারেল হলে মাউন্টব্যাটেন হয়তো আরো অনেক বেশী ক্ষতি করবেন।

গ্রন্থের ১১৬ থেকে ১২১ পৃষ্ঠায় হামিদুল হক চৌধুরী লিখেছেন যে, বাউন্ডারী কমিশনে বাংলার মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। বাঙলার হিন্দুদের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন অতুল গুপ্ত। মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানের ঘোষিত নীতি, আদর্শ বা চিন্তাধারা মোতাবেক মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, মালদহ, চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, খুলনা, নদীয়া প্রভৃতি

সীমান্তবর্তী মুসলিম প্রধান জেলা এবং দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারটার পক্ষে তিনি সাফল্যের সঙ্গে ওকালতি করেছিলেন। কমিশনের দু'জন হিন্দু সদস্য বিষয়টি মেনেও নিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরেও অনেক কিছু যে পাওয়া গেলো না এর কারণ, মাউন্টব্যাটেনের গোপন নির্দেশ মোতাবেক স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ বাঙলা বিভাগের ব্যাপারটি আগেভাগে এক দিনেই ম্যাপের ওপর লাল দাগ কেটে নিষ্পত্তি করে রেখেছিলেন। ঐ একই ব্যাপার ঘটেছিলো আসাম এবং পাঞ্জাব বিভাগের ক্ষেত্রেও। নেহরুজীদের পক্ষে মাউন্টব্যাটেনের উদ্যোগ ও আগ্রহাতিশয্যের বিষয় উল্লেখ প্রসঙ্গে হামিদুল হক চৌধুরী লিখেছেনঃ

'Mountbatten exercised sufficient pressure on the Maharajah of Tripura, who had not opted for India till the time the Tribunals meeting were in the final session, to finally declare for India'.

দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরা যাতে ভারতে যোগ দেয় সে বিষয়ে ত্রিপুরার মহারাজার ওপর মাউন্টব্যাটেন অযথা অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও ত্রিপুরার মহারাজা অবশ্য ট্রাইবুনালের শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতে যোগ দেওয়ার পক্ষে রায় দেননি। কাশ্মীরের বিষয়ে এবং এ রকম আরো অনেক বিষয়েই ভারতের পক্ষে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এটা একটা দিক। এর আরো একটা দিক আছে। সেটা সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের কথা।

১৯৪৭-এর ৩ জুনের আগে পর্যন্ত কংগ্রেস অখন্ড ভারত, অবিভক্ত ভারতের কথা বলেছে। কিন্তু মুসলিম লীগ এর অন্তত এক দশক আগে থেকে ভারতের মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক সমস্যাদির সমাধানকল্পে উপমহাদেশ বিভক্তির হুমকি দিয়ে এসেছে। কিন্তু ১৯৪৭-এ মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান ঘোষণার সময় থেকে দেখা গেলো ভিতরে ভিতরে ব্যাপারটি ছিলো ঠিক উল্টো। ইতোপূর্বে প্রকাশ্যে ভারতের অখণ্ডতার পক্ষে মুখে বললেও কংগ্রেস আদতে ভারত বিভাগের মাধ্যমেই তার লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছে। অন্যদিকে দাবী-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে কৌশল হিসাবে ভারত বিভাগের কথা বলে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করলেও মুসলিম লীগ আদৌ দেশ বিভাগের জন্য প্রস্তুত ছিলো না। ফলে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান ঘোষণার পর দেখা গেলো মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেই অপ্রস্তুত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তা না হলে ১৯৪৭-এর তিন জুনের পর আবুল হাশিম, সোহরাওয়ার্দী, শের-ই বাংলা 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল' অর্থাৎ 'স্বাধীন বাংলার' জন্য চেষ্টা করবেন কেন এবং চেষ্টা করে ব্যর্থই-বা হবেন কেন? ভাবতে অবাক লাগে যে, উপমহাদেশ বিভক্তির এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে রেষারেষি এবং বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত ছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর মতো মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা অবিভক্ত বাংলার আশায় মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীরও মুখাপেক্ষী হয়েছিলেন। কিন্তু কেবল ১৯৪৭-এর ৩ জুনের পর শরৎ বসুর কাছে লেখা চিঠিতে নয়। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ তারিখ রবিবার, সপ্তমী, দুর্গাপূজার দিন কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে লেখা

চিঠিতে গান্ধী বাংলা, আসাম এবং পাঞ্জাব বিভাগের পক্ষেই ওকালতি করেছিলেন। অথচ কায়েদ-ই-আযম ছিলেন বরাবরই বাংলা, আসাম এবং পাঞ্জাব ভাগের বিপক্ষে।

৩ জুন ১৯৪৭-এর মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানের প্রায় বছর তিনেক আগেই ১৯৪৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র কাছে লেখা চিঠিতে মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী লিখেছিলেনঃ, বাঙলা, আসাম, পাঞ্জাব যেমন আছে তাঁরা তেমনটা রাখতে চান না, অর্থাৎ ভাগ করতে চান। আমি ১৯৬৯ সালে পুনর্মুদ্রিত হেক্টর বলিথো'র 'জিন্নাহ' গ্রন্থের ১৪৯ এবং ১৫০ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

'On the evening of September 24 (1944), Gandhi returned to his humble abode, from which he wrote Jinnah a long letter, saying that he was willing to recommend to the Congress and the country the acceptance of the claim for separation contained in the Muslim League Resolution of 1940, on the following terms.'

Gandhi began:

I proceed on the assumption that India is not to be regarded as two or more nations but as one family consisting of many members of whom the Muslims living in the North-West Zones i.e Baluchistan, Sindh, North-West Frontier Province and that part of Punjab where they are in absolute majority over all other elements and in parts of Bengal and Assam where they are in absolute majority, desire to live in separation from the rest of India'.

কিন্তু কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ চেয়েছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান, সিন্ধুর মতো পাকিস্তানে পাঞ্জাব, বাঙলা এবং আসামও যেমন আছে হুবহু ঠিক তেমনি সার্বভৌম ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে থাকবে। ৪ অক্টোবর ১৯৪৪ তারিখে লন্ডনের নিউজ ক্রনিক্‌ল (News Chronicle) পত্রিকায় এক সাক্ষাতকারে কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছেন ঃ

'There is only one practical, realistic way of resolving Muslim-Hindu differences. This is to divide India into two sovereign parts of Pakistan and Hindustan, by the recognition of the whole of the North-West Frontier Province, Baluchistan, Sindh, Punjab, Bengal and Assam as sovereign Muslim territories, as they now stand, and for each of us to trust the other to give equitable treatment to Hindu minorities in Pakistan and Muslim minorities in Hindustan.'

[উদ্ধৃতি ঃ ১৯৬৯ সালে পুনর্মুদ্রিত হেক্টর বলিথো'র 'জিন্নাহ'' গ্রন্থের ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে।]

১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসের ২৯ ও ৩০ তারিখে স্যার ডক্টর শেখ মুহম্মদ ইকবালের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের একবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মিস্টার মুহম্মদ হোসেন। আল্লামা ইকবাল এই অধিবেশনে উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে তাঁর এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারত বিভাগ ছাড়া এই সমস্যা সমাধানের আর কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ১৯৩৫-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে ১৯৩৭ সালে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে সাধারণ নির্বাচন হয়, আল্লামা ইকবালের প্রস্তাব এর সাত বছর আগের কথা। কায়েদ-ই-আযম তখন আল্লামা ইকবালের প্রস্তাবে সাড়া দেন নি। আল্লামা ইকবাল তাঁর এই প্রস্তাবে বলেছিলেনঃ পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্তানকে নিয়ে অন্তত উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। হেক্টর বলিথো'র উক্ত গ্রন্থের ৯৮ এবং ৯৯ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

'One of the delegates to the Round Table Conference was Sir Muhammad Iqbal, the greatest Muslim philosopher and Poet of his time. Iqbal, who was born in 1876, had been educated in Lahore, Cambridge and Munich:" his politics had grown out of scholarship and a deep sense of history. He was a Philosopher- never a fanatic - and his influence over the fortunes of the Muslim people, and on Mohammed Ali Jinnah, was profound and enduring.

Iqbal had already studied the miserable dilemma of the Muslims in India, and he had dismissed as impossible the unity that Jinnah had believed in, and argued for, during more than twenty years. He said at the Muslim League session in Allahabad in 1930, 'To base a constitution on the conception of a homogeneous India, or to apply to India the principles dictated by British democratic sentiments, is unwrittingly to prepare her for a civil war."

Iqbal advocated partition : he even demanded and defined the frontiers of a proposed "Consolidated Muslim State," which, he believed would be "in the best interests of India and Islam." He said, "I would like to see the Punjab, the North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan, amalgamated into a single state. . . . . . . The formation of a consolidated North-West Indian Muslim State appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India."

Jinnah met Sir Muhammad Iqbal many times in London, and they were good friends. But, despite his disillusionment, Jinnah did not yield to Iqbal's arguments. Almost a decade was to pass before he admitted that he had "finally been led to Iqbal's conclusions, as a result of careful examinations and study of the constitutional problems facing India."

আল্লামা ইকবাল উত্তর–পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের নিয়ে যে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করার কথা বলেছেন, তাতে পাঞ্জাবকে ভাগ করার সংস্থান ছিলো না। ইকবাল ভারত বিভাগের অপরিহার্যতার কথা বললেও সম্ভাব্য রাষ্ট্রটির নাম পাকিস্তান বা অন্য কিছু দিয়ে যান নি। 'পাকিস্তান' নামটি পাওয়া যায় চৌধুরী রহমত আলীর 'পাকিস্তান' নামক একটি পুস্তিকায়। সেখানে বলা হয়েছে 'পাকিস্তান' শব্দটি একাধারে পার্সী এবং উর্দু। পাঞ্জাব, আফগানিয়া (উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, ইরান, সিন্ধু (কচ্ছ এবং কাথিয়ারসহ), তুখারিস্তান, আফগানিস্তান এবং বালুচিস্তান। হেক্টর বলিথো'র গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

'Pakistan is both a Persian and Urdu word. It is composed of letters taken from the names of all of our homelands - 'Indian' and 'Asian'. That is, Punjab, Afghania (North-West Frontier Province), Kashmir, Iran, Sindh (including Kutch and Kathiawar), Tukharistan, Afghanistan and Balochistan. It means the land of Paks-the spiritually pure and clean. It symbolizes the religious beliefs and ethnical stocks of our people; and it stands for all the territorial constituents of our original Fatherland.

From Pakistan, Choudhury Rahmat Ali.

চৌধুরী রহমত আলীর পাকিস্তান পরিকল্পনায় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা চিন্তা করা হয়নি। অনুরূপভাবে মধ্য ভারত এবং উপমহাদেশের আরো অনেক অঞ্চল বাদ পড়ে গেছে। অতএব এটাকে উপমহাদেশের মুসলমানের সমস্যা সমাধানের পূর্ণাঙ্গ পন্থা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

অন্যদিকে আল্লামা ইকবাল উত্তর–পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের নিয়ে একটা আলাদা রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্যতার কথা বললেও–সমগ্র উপমহাদেশ কেনো, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর কী পরিকল্পনা ছিলো, সেটা সুস্পষ্ট জানা যায় না। এর পর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাব, দিল্লী সম্মেলনের প্রস্তাব, কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব ইত্যাদির একটার সঙ্গে অন্যটির অমিল নজর এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। যেমন, লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটাও ব্যবহার করা হয়নি। কোন্ কোন্ প্রদেশ নিয়ে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হবে, সে উল্লেখও ছিলো না। দিল্লী সম্মেলনের প্রস্তাবে সেটা সুস্পষ্ট বলা হলো বটে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলো সম্পর্কে আভাস–ইঙ্গিতটুকুও পাওয়া গেলো না।

পরে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান যখন ঘোষিত হলো, তখন সেটা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া গেলো যে, উপমহাদেশ বিভক্তির ব্যাপারে মুসলিম লীগ তথা মুসলিম নেতৃবৃন্দের কোনো প্রস্তুতি ছিলো না। অন্যদিকে মঞ্চে-ময়দানে অখণ্ড ভারতের পক্ষে তথা ভারত বিভাগের বিপক্ষে কথা বললেও আদতে ভারত বিভাগের প্রস্তুতিই কংগ্রেসের ছিলো। আসলে কংগ্রেস চেয়েছিলো মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক দাবী-দাওয়ার কিছুই না মেনে মুসলিম রাষ্ট্রের নামে খানিকটা ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং সচেতন মুসলিম নাগরিকদের খেদিয়ে দিয়ে মুসলমানদের সর্বভারতীয় আর্থ-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে মার খাওয়াতে। পরে ছিন্ন-ভিন্ন, অসংগঠিত মুসলমানকে পদানত করে মহাভারত গড়বে।

অন্যদিকে মুসলিম লীগ কার্যত ভারত বিভক্তির কথা বলে মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক দাবী-দাওয়া আদায়ের বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো। তাই মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান ঘোষণার পর দেখা গেলো মুসলিম নেতৃবৃন্দ বহুধাবিভক্ত এবং উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা-জমি বুঝে নেওয়ার মতো কোনো সাংগঠনিক প্রস্তুতি তাদের নেই।

দিল্লী কনভেনশনে উত্থাপিত ও গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাব

১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লীর অ্যাংলো-অ্যারাবিয়ান কলেজে অনুষ্ঠিত ভারতের আইন পরিষদের মুসলিম লীগ সদস্যদের কনভেনশনে জনাব সোহরাওয়ার্দী যে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার পূর্ণ বিবরণ ঃ

Whereas in this vast sub-continent of India 100 million Muslims are adherents of a Faith which, regulates every department of their life, educational, social, economic and political, which is not confined merely to spiritual doctrines and tenets or rituals and ceremonies, and which stands in sharp contrasts to the exclusive nature of the Hindu Dharma and Philosophy which has lined and maintained for thousands of year a rigid caste system resulting in the degradation of 60 million human beings to the position of untouchables, creation of unnatural barriers between man and man and superimposition of social and economic inequalities on a large body of the people of the country, and which threatens to reduce Muslims, Christians and other minorities to the status of irredeemable Helots, socially and economically; whereas the Hindu Caste System is a direct negation of nationalism, equality, democracy and all the noble ideals that Islam stands for;

Whereas, different historical backgrounds, traditions, cultures, social and economic orders of the Hindus and the Muslims made impossible the evolution of a single Indian nation inspired by common

aspirations and ideals and whereas after centuries they still remain two distinct major nations;

'Whereas soon after the introduction by the British of the policy of setting up Political institutions in India on lives of western democracies based on majority rule which means that the majority of the nation or society could impose its will on the majority of the other nation or society inspite of their opposition as amply demonstrated during the two and a half years' regime of Congress governments in the Hindu Majority Provinces, under the government of India Act. 1935, when the Muslims were subjected to untold harrasments and oppositions as a result of which they were convinced of the futility and ineffectiveness of the so-called safeguards provided in the constitution and in the Instrument of Instructions to the Governors and where driven to the irresistable concution that in a United India Federation, if established the Muslims, even in the Muslim Majority Provinces, could meet with no better fate and their rights and interests could never be adequately protected against the perpetual Hindu majority in the Centre;'

"Whereas the Muslims are convinced that with a view to saving Muslim India from the domination of the Hindu and in order to afford them full scope to develop themselves according to their genius, it is necessary to constitute a sovereign independent state comprising Bengal and Assam in the North East Zone and the Punjab, North West Frontier Provinces, Sind and Baluchistan in the North West Zone;

"This Convention of the Muslim Legislators of India, Central and Provincial, after careful consideration hereby declares that the Muslim Nation will never submit to any constitution for a United India and will never participate in any single Constitution Making machinery set up for the purpose, 'and any formula devised by the British Government for transferring power from the British to the Peoples of India, which does not conform to the following just and equitable principles calculated to maintain internal peace and tranquility in the country will not contribute to the solution of the Indian Problem :-

(1) That the Zones comprising Bengal and Assam in the North-East and the Punjab, the North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan in North-West of India, namely the Pakistan Zones, where the Muslims are a dominant majority be constituted into one sovereign independent state and that an unequivocal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay;

(2) That two separate constitution making bodies be set up by the peoples of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing their respective constitutions;

(3) That the minorities in Pakistan and Hindustan be provided with safeguards on the line of the All India Muslim League Resolution passed on the 23rd March 1940 at Lahore;

(4) That the acceptance of the Muslim League demand for Pakistan and its implementation whithout delay are the sine-qua-non for the Muslim League Co-operation and participation in the formation of an Interim Government at the Centre.

This convention further emphatically declares that an attempt to impose a constitution on a United India basis or to force any interim arrangement at the Centre, contrary to the Muslim demand, will leave the Muslim no alternative but to resist such imposition by possible means for their servival and national existence.'

The resolution was passed unanimously.'

১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসের ৭, ৮ ও ৯ তারিখে দিল্লীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পরিষদ-সদস্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লীর এই সম্মেলনে পাকিস্তানের সুস্পষ্ট রূপরেখা সম্বলিত মূল প্রস্তাব উত্থাপন করে বক্তৃতা দেন বাঙলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

১৯৬৪-এর মার্চে প্রকাশিত 'ইত্তেফাক ঃ সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা'য় '৪৬-এর ঐতিহাসিক দিল্লী সম্মেলনে জনাব সোহরাওয়ার্দী' শিরোনামে এই ঐতিহাসিক বক্তৃতা পরিবেশনের শুরুতে ইত্তেফাক লিখেছে ঃ

'১৯৪৬ সাল। পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নির্বাচনী যুদ্ধ শেষ করে সারা ভারতের আইনসভার সদ্য নির্বাচিত মুসলিম লীগ সদস্যদের কনভেনশন বসেছে নয়া দিল্লীতে। সভাপতির আসনে স্বয়ং কায়েদে আযম। মুসলিম-ভারতের ভাগ্য কোন্ পথে নির্ধারিত হবে, তার ওপর তুমুল বিতর্কের ঝড় বইছে। কায়েদে আযমের ধমকে অনেকেই অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়েছেন। বাংলার নির্বাচন

যুদ্ধজয়ী 'বীর মুজাহিদ' জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উঠলেন মূল প্রস্তাব পেশ করতে। গগনবিদারী উল্লাসধ্বনিতে ফেটে পড়লো সমগ্র জনতা। সোহরাওয়ার্দী বক্তৃতা করলেন। কারো মুখে টু শব্দ নেই। কেবল মাঝে মাঝে তুমুল করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান তাঁর ঘোষণাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে সবাই ছুটে চললো দিকে দিকে। দিল্লীর সেদিনের সে সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা জানেন, তুমুল বিতর্কের মাঝে সেদিন সোহরাওয়ার্দীর কণ্ঠই ছিলসর্বোচ্চ।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন (ইত্তেফাক-এর উক্ত সংখ্যা থেকে এর পর উদ্ধৃতি)ঃ 'সারা ভারতের আইনসভাসমূহের নির্বাচিত মুসলিম সদস্যদের এই সমাবেশে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি উথাপনের সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত এবং গৌরবান্বিত। সবচেয়ে বড় কথা, মুসলিম জাতির যে প্রতিনিধিবৃন্দ আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, তাঁদের সকলকেই ভারতের মুসলিম জনসাধারণ পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নির্বাচিত করেছেন।

ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ-সন্ধিক্ষণে আজ আমাদের এই কনভেনশনের কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে।— বৃটেন আজ ভারতের হাতে তাদের হৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়েছে। বৃটিশ কেবিনেট মিশন এখন এদেশে এসেছেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি নিরূপণ করতে। কেবিনেট মিশনের আগমন এ কথাই প্রমাণ করছে যে, বৃটিশ সরকার অন্তত এইবার ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে সদিচ্ছাশীল। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ প্লাটফর্ম থেকে নিজেদের দাবী-দাওয়া পেশ করতে এগিয়ে এসেছে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে – বৃটিশ সরকার ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত করবেন? কংগ্রেস চেষ্টা করছে – ক্ষমতা এককভাবে নিজেই দখল করতে, যাতে তারা মুসলমান ও দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙক্ষা পিষে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। কংগ্রেস বলছেঃ সরকার বাহাদুর, ক্ষমতা আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা সব বিরোধিতা শেষ করে দেবো। মুসলমানদের আমরা পিষে ফেলবো। ····· কংগ্রেস বলছেঃ পুলিশ বাহিনীকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে দাও তা হলে তারা পারবে অখণ্ড ভারত কায়েমের নামে সারা দেশে কাটাকাটি, খুনোখুনি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুদ্ধ ও নরহত্যার বাজার সরগরম করে তুলতে।·····

বৃটেন যদি এই রক্তলোলুপ গোত্রের হাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ এবং ভাগ্য ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে – তা হলে সেটা হবে তার চরম অন্ধত্ব ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। আমি বলবো ঃ এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আর পাকিস্তান ছাড়া দ্বিতীয় কোনো লক্ষ্যও নেই তাদের সামনে। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে যদি কেউ 'গাদ্দার' বনে থাকে–সে কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু তারাও তো পাকিস্তানের বিরোধী নয়। এমন কি সীমান্তের কংগ্রেসী মুসলমানরাও পাকিস্তানের বিরোধী নয়। বরং তারা নিজেদের প্রদেশে সম্ভবত ইতোমধ্যেই পাকিস্তান কায়েম করে বসেছেন। এ দেশে আজ এমন কোনো মুসলমানের স্থান নেই, যিনি পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী নন; মালিক খিজির হায়াত খানও কি এ কথা বলেন নি যে, তিনি পাকিস্তানের আদর্শে আস্থাবান! আমি তাঁকে বলবো ঃ কওমের একজন খাদেম হিসেবে আপনি এখন মুসলিম লীগে শামিল হন।···· দুনিয়ায় আজ আর এমন

কোনো শক্তি নেই, যা দশ কোটি মুসলমানের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং বিকাশের ধারায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি।----

এখন প্রশ্ন হলো, পাকিস্তান কি আমাদের সর্বশেষ দাবী? আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে যাব না। তবে এ কথা আমি অবশ্যই বলবো যে, পাকিস্তান আমাদের হাল আমলের প্রধান দাবী। গোড়ার দিকে হিন্দু মানসিকতা এমন ছিলো যে, তারা মুসলমানদের বলতোঃ এ দেশের সঙ্গে তোমাদের কোনো নাড়ীর যোগ নেই। জবাবে আমরা বলেছি ঃ ভারতবর্ষ যেমন তোমাদের, ঠিক তেমনি আমাদেরও। কংগ্রেসকে এ প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ঃ গত কয়েক বছর ধরে আমরা সর্ব রকমে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টা করেছি। ন্যায্য পাওনার চেয়ে আমরা তখন অনেক কমই দাবী করেছি। একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অধীনে আমরা হিন্দুদের সংখ্যাভিত্তিক অধিকার মেনে নিতে এত দিন প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু বরাবরই তারা আমাদের সে একান্ত ন্যায়সঙ্গত দাবীও প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। আমাদের একটা কথাতেও তারা কর্ণপাত করেনি, নিজেদের জিদই তারা অক্ষুণ্ন রেখে এসেছে।

আজ স্বাধীনতা ও শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের লগ্ন সমুপস্থিত। তাই সময় বুঝে কংগ্রেস এবং হিন্দুরা এখন বলছে ঃ ভাই মুসলমান! তোমরা আমাদের সাথী, তোমরা আর আমরা দু'য়ে মিলে এক জাতি। কংগ্রেসের এই দাবীর মুখে আমাদের সামনে আজ আর দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। তাই আমরা স্বাতন্ত্র্য ও বিভাগের দাবী তুলেছি। আমাদের এই দাবী সংগত, ন্যায্য এবং সুবিচারের ভিত্তিতেই উথাপিত হয়েছে।

আমরা, ভারতের মুসলমানরা আজ গোটা দেশের মধ্যে মাত্র সামান্য দু'টি অংশ দাবী করছি। এই দাবীর ভিত্তিতে একমাত্র কায়েদ–ই–আযমের নেতৃত্বে ভারতের দশ কোটি মুসলমান আজ মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ – সমগ্র কওমের লক্ষ্য ও আদর্শ আজ এক ও অভিন্ন। এ জন্য খোদা তাআলার দরবারে হাজার শোকর। ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে কোনো চেষ্টা, যে কোনো ষড়যন্ত্র আমরা, মুসলমানরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবো। মুসলমান আজ আর মুর্দা কওম নয়, তাদের প্রতিরোধ শক্তি আজ আর কেবল দুর্বল কণ্ঠের চিৎকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাই শান্তি ও সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হলে কংগ্রেসের আজ কর্তব্য হলো পাকিস্তানের দাবী সসম্মানে স্বীকার করে নেওয়া।---- তাই, আজ আমরা ওই বিরাট উপমহাদেশের দুই প্রান্তের দু'টি এলাকা পেতে চাই।------ এখন প্রশ্ন হলো ঃ আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম কি? এ সম্পর্কে কায়েদে আযম বলেছেন ঃ আমাদের সম্মতি না নিয়ে কোনো শাসনতন্ত্র আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলে সর্বশক্তিতে আমরা তা প্রতিহত করবো, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো।

মুসলিম জাতি আজ সজাগ, তারা আজ সচেতন। তাদের মতামতে আমল না দিয়ে কোনো ব্যবস্থা চালু করা হলে তারা তার মোকাবিলা করতে ওয়াদাবদ্ধ। মুসলিম লীগ মুসলমানদের ঈমানকে শক্তিশালী করেছে, বিশ্বাসকে করে তুলেছে দুর্জয়। মুসলিম লীগ তাদের নবজীবন দান করেছে। সাম্প্রতিক নির্বাচন প্রমাণ করেছে মুসলমানদের কাছে মুসলিম লীগ কী! দুর্বল, বিকলাঙ্গ, খঞ্জ এবং অসুস্থ মুসলমানরাও মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে নির্বাচন কেন্দ্রে এসে মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট দিয়েছে। তারা উপলব্ধি করেছে, অনুভব করেছে যে, একমাত্র

মুসলিম লীগের শক্তি ও সংগঠনের মধ্যে মুসলমান তথা ইসলামের স্বার্থ নিহিত। মুসলিম লীগই তাদের চূড়ান্ত জয়ের পতাকাবাহী। যে জাতি ঈমান ও বিশ্বাসে বলীয়ান, স্বকীয় শক্তির রূপে আস্থাবান, সে জাতিকে কখনও পরাভূত করা যায় না। মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছবার জন্য গৃহযুদ্ধের ইচ্ছা আমাদের নেই। আপস রফা এবং শান্তির সঙ্গে বসবাস করাই আমাদের কাম্য। সেই সঙ্গে আমরা মান-ইজ্জতের সঙ্গেও বাঁচতে চাই। নিজেদের জন্য আজ আমরা এমন একটু জায়গা চাই, যেখানে আমরা নিরাপদ এবং শান্তিতে বসবাস করতে পারবো।

- কংগ্রেস শুধু বিত্তবান শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এরা যোগ্য বটে; কিন্তু বাকসর্বস্ব পাঁচালী বিশারদ। হুমকির সাথে বিবৃতি দিচ্ছেন। অন্যদিকে তাঁরা শ্বেত কপোতের মতো নিষ্কলঙ্ক সাজছেন, ভেজা-বিড়ালের মতো নির্জীব বনছেন।--- বাংলাদেশে আড়াই কোটি অধিবাসীও অস্পৃশ্য রয়েছেন, যাঁরা আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে চান। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, পাকিস্তান কায়েম হলে তাঁদের দারিদ্র্য এবং বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। তাঁদের মনে এখন আর কংগ্রেসের ওপর আস্থা মোটেই নেই। এমন অনেক হিন্দু আছেন, যাঁরা মুসলিম লীগকেই মুক্তি লাভের একমাত্র আশ্রয়স্থল বলে ভাবছেন। পাকিস্তানকে তাঁরা মজলুম, সর্বস্বান্ত, পর্যুদস্ত মানুষের জান্নাত বলে ভাবছেন' (বিপুল করতালি)।

- মুসলমানরা দেশের দুই প্রান্তের দু'টি ছোট্ট এলাকাই মাত্র চাইছে, যেখানে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কওম একটি সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেনা।

আজ প্রশ্ন হচ্ছে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এবং হিন্দু কংগ্রেস শান্তিপূর্ণভাবে মর্যাদার সঙ্গে পাকিস্তান মেনে নিতে রাজী আছে কিনা। আমি এ নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। অনুধাবন করতে চেষ্টাও করেছি যে, মুসলমানরা পাকিস্তান হাসিলের জন্য লড়তে প্রস্তুত আছে কিনা! আজ আমি পূর্ণ ঈমানদারী ও সততার সঙ্গে ঘোষণা করছি; বাংলার প্রতিটি মুসলমান এখন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। ----

বাংলা থেকে দিল্লী পর্যন্ত আসার পথে এমন কতকগুলো প্রদেশ অতিক্রম করতে হয়েছে, যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু। আমি তাঁদের মধ্যেও আজাদীর প্রাণচাঞ্চল্য দেখেছি। তাঁরা আমাকে বলেছেনঃ তোমরা আমাদেরকে আমাদের ভাগ্যের ওপরই ছেড়ে দাও। তবু নিজ এলাকায় তোমরা পাকিস্তান কায়েম কর। আমাদের ভাইয়েরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করবে, একটি আযাদ দেশের বাসিন্দা হবে- তবেই আমাদের গৌরব। সত্য বলতে কি, মুসলিম সংখ্যালঘু এদেশের মুসলমানরাই আজ আমাদের আযাদীর পথ দেখিয়েছে, আযাদীর পথে উৎসাহ যুগিয়েছে।······

পূর্ণ ঈমানদারী আর সততার সঙ্গেই আজ আমি ঘোষণা করছি ঃ বাংলার প্রতিটি মুসলমান এখন প্রস্তুত। আমাদের আজকের একমাত্র দাবী, একমাত্র কাম্য পাকিস্তান। এ প্রশ্নে কারো সঙ্গে আমাদের আপস নেই। আমাদের পথের প্রতিবন্ধক মুসলিম জনতাই সরিয়ে দেবে। আমরা আজ জান কোরবানে প্রস্তুত।

'কায়েদে আযম, আপনি আমাদের পরীক্ষা নিন। আমরা বাংলার মুসলমান পাকিস্তান হাসিলের জন্য, অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনার নির্দেশ মোতাবেক যে কোনো কোরবানীর জন্য আজ প্রস্তুত।

'দেশ রক্ষার ব্যাপারে আমি বলবো আমেরিকা হোক, আর বৃটেনই হোক, কোনো দেশই এককভাবে আত্মরক্ষায় সমর্থ নয়। তবে একথা আমি বলি না যে, পাকিস্তান লাভের পরই আমরা আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে দেবো বা অস্ত্র সংগ্রহ ও নিজেদের সশস্ত্র করে তোলার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করবো। তবে হিন্দুস্তানের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপারে আমি কেবল এ কথাই বলতে চাই ঃ আমাদের একা ছেড়ে দিন। আমরা নিজেরাই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নেবো! –পাকিস্তান জিন্দাবাদ

উপমহাদেশ বিভক্তি চিন্তা যখন থেকে শুরু

মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ–সাংস্কৃতিক সমস্যা সমাধানকল্পে উপমহাদেশ বিভক্তির চিন্তা প্রথমে আসে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। পাকিস্তান প্রস্তাব আসে অনেক পরে, অনেক দরকষাকষি, অনেক ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। তথাপি এই পাকিস্তান প্রস্তাব প্রথমে কোনো রাজনৈতিক দল থেকে আসেনি। যেভাবে এসেছিলো রাজনৈতিক দল সেভাবে গ্রহণ করেনি। আবার রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগ যা গ্রহণ করেছিলো, পরে ১৯৪৭–এ কার্যত তা বাস্তবায়িতও হয়নি। প্রস্তাবের সেই ধারাপাতটা অতিসংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করছি ঃ

আবদুল হালিম শায়বায়–এর প্রস্তাব

সর্বপ্রথম ১৮৯০ সালে আবদুল হালিম শায়বায় মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির প্রস্তাব করেছিলেন।

আবদুল জব্বার এবং আবদুস সাত্তারের প্রস্তাব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৭ সালে স্টকহোমের আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সম্মেলনে আবদুল জব্বার এবং আবদুস সাত্তার, এই দুই ভারতীয় প্রতিনিধি মুসলমানদের অর্থনৈতিক অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক সত্তা বজায় রাখার প্রয়োজনে একটি পৃথক আবাসভূমির প্রস্তাব পেশ করেন।

নাদির আলীর পুস্তিকা

১৯২১ সালে নাদির আলী নামে আগ্রার একজন ব্যবহারজীবী তাঁর এক পুস্তিকায় বলেন যে, ভারত বিভক্তি মারফত উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র কায়েম হওয়াটা হিন্দু–মুসলিম সমস্যা সমাধান হওয়ার অন্যতম উপায়।

মওলানা মোহাম্মদ আলীর আকাঙ্ক্ষা

নাদির আলীর পুস্তিকাটি বের হওয়ার তিন বছর পর মওলানা মোহাম্মদ আলী আলীগড়ে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, হিন্দু–মুসলমান সমস্যার সমাধান না হলে ভারতবর্ষ হিন্দু ভারত ও মুসলমান ভারত– এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।

ফেডারেল শাসন ব্যবস্থা

যে বছর আলীগড়ে তাঁর বক্তৃতায় মওলানা মোহাম্মদ আলী হিন্দু ভারত এবং মুসলিম ভারতের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, সেই এক বছরই মুসলিম লীগ লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সভায় এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বদলে ফেডারেল ধরনের অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর শাসন ব্যবস্থার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

লালা লাজপত রায়ের মুসলিম রাজ্য গঠনের প্রস্তাব

১৯২৪ সালে লালা লাজপত রায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, সিন্ধু ও পূর্ব বঙ্গে চারটি মুসলিম রাজ্য গঠনেরপ্রস্তাবদিয়েছিলেন।

চৌধুরী রহমত আলীর পাকিস্তান প্রস্তাব

লন্ডনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী পাকিস্তান পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেখানকার হিন্দু ভারতীয় মুসলিম ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৩০-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে সমবেত মুসলিম নেতাদের কাছে পেশ করেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ তখন তা বিবেচনারঅযোগ্যমনেকরেছিলেন।

এর দু'বছর পর ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে কেম্ব্রিজের আরো তিন জন মুসলিম ছাত্রের সঙ্গে চৌধুরী রহমত আলী ভারত ভাগ করে পাকিস্তান নামে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের 'Now or Never' নামে চার পৃষ্ঠার যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাতে বলা হয়ঃ 'Pakistan is both a Persian and Urdu word. It is composed of letters taken from the names of all our homelands - `Indian' and 'Asian'. That is, Punjab, Afghania (North West Frontier Province), Kashmir, Iran, Sindh (including Kutch and Kathiawar), Tukharistan, Afghanistan and Balochistan. It means the land of the Paks- the spiritually pure and clean. It symbolizes the religious beliefs and ethnical stocks of our people; and it stands for all the territorial constituents of our original Fatherland.

From Pakistan, Choudhuri Rahmat Ali

এলাহাবাদের মুসলিম লীগ অধিবেশনে আল্লামা ইকবাল

মুসলিম লীগ অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব প্রথম করেছিলেন আল্লামা ইকবাল ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই উত্তর-পশ্চিমের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে নিয়ে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজ্য গঠনেরপ্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি।

স্যার মোহাম্মদ শাহনাওয়াজ-এর 'কনফেডারেসিস্ অব্ ইন্ডিয়া'

১৯৩৩ সালে 'কনফেডারেসিস অব ইন্ডিয়া' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন 'জনৈক পাঞ্জাবী', এই ছদ্মনামে পাঞ্জাব লীগের নেতা স্যার মুহম্মদ শাহনওয়াজ। সিন্ধু অঞ্চল, হিন্দু

ভারত, রাজস্থান, দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গ, এই পাঁচ ভাগে ভারত ভাগ করে একটি শিথিল কনফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।

স্যার সিকান্দার হায়াত খানের স্কিম অব্ ইন্ডিয়ান ফেডারেশন

পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকান্দর হায়াত খাঁও একটি শিথিল কনফেডারেশন রচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁর পুস্তিকা 'আউটলাইনস্ অব্ এ স্কিম অব্ ইন্ডিয়ান ফেডারেশন'-এ। স্যার সিকান্দর হায়াত খাঁ ভারত নামক এই শিথিল কনফেডারেশনটি গঠন করার কথা চিন্তা করেছিলেন মোটামুটি সাতটি স্বতন্ত্র অঞ্চল নিয়ে।

চৌধুরী খালেকুজ্জামানের ভারত বিভক্তি পরিকল্পনা

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে উত্তর প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান ভারত সচিব লর্ড জেটল্যান্ড এবং তার সহকারী কর্নেল মইরহেডরের কাছে ভারত ভাগের যে পরিকল্পনা দাখিল করেন, সেই পরিকল্পনার মূল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি পাকিস্তান পরিকল্পনার ভিত্তি রচনা করেন।

সৈয়দ জাফর এবং মুহম্মদ আফসার হাসান

পাকিস্তান, বঙ্গ, হিন্দুস্তান, হায়দারাবাদ, দিল্লী ও মালাবার- এ ছ'টি পুরোপুরি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে ভারত ভাগের এক পরিকল্পনা প্রচার করেছিলেন সৈয়দ জাফর এবং মুহম্মদ আফসার হাসান- আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দু'জন অধ্যাপক।

ডক্টর এস. এ. লতিফ

মুসলমানদের জন্য চারটি এবং হিন্দুদের জন্য ছ'টি, মোট এই দশটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে ভারত ভাগের পরিকল্পনা করেছিলেন ডক্টর এস.এ. লতিফ তাঁর 'দি মুসলিম প্রবলেম ইন্ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে।

১৯৪০ সালের ২২ মার্চ শুক্রবার থেকে ২৪ মার্চ রবিবার, এই তিন দিন লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের তিন দিনব্যাপী ২৭তম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য দু'টি পৃথক জাতীয় রাষ্ট্র কায়েম করার যে প্রস্তাব পেশ করা হয় তাতে 'পাকিস্তান' শব্দটি ছিলো না। কংগ্রেস নেতা চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী এবং হিন্দু সাংবাদিকরা এটাকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে অভিহিত করেন।

একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম অঞ্চল নিয়ে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার কথা ছিলো। প্রস্তাবটি ছিলো এ রকমঃ 'শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল এবং এর কার্যনির্বাহক কমিটি এ যাবত যে সব কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন এবং ১৯৩৯ সালের ২৭ আগস্ট, ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর, ২২ অক্টোবর এবং ১৯৪০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী গৃহীত প্রস্তাবগুলোতে যে মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন উক্ত কার্যক্রম ও মনোভাবকে সর্বতোভাবে অনুমোদন করছে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর যে পরিকল্পনা

সন্নিবেশিত হয়েছে ওটা এদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থার প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অকেজো, অপ্রযোজ্য এবং মুসলিম ভারতের জন্য একান্তভাবেই অযোগ্য।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরো উল্লেখ করছে যে, যে নীতি পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়েছে, সেটা বিভিন্ন দল, সম্প্রদায় ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে আলোচনাক্রমে পুনর্বিবেচনা করা হবে বলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৩৯ সালের ১৮ অক্টোবর তারিখে বড়লাট যে ঘোষণা দেন, তদনুযায়ী গোটা শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাটি পুনর্বিবেচনা না করা হলে ভারতীয় মুসলমানদের সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রণীত অপর কোনো পরিকল্পনাই মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনই এই মর্মে অত্যন্ত সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করছে যে, নিম্নোক্ত মৌলিক আদর্শসমূহকে ভিত্তি হিসেবে না ধরে অপর যে কোন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর এবং মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তথা এ দেশের কোটি কোটি মুসলমানেরা দাবী করছে যে, যে সব এলাকা একান্তভাবেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ; যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল, প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানার রদবদল করে এ সব এলাকাকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে এককভাবে পুনর্গঠন করা হোক, যাতে ওগুলো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র স্টেটস্-এর রূপ পরিগ্রহ করে, সংশ্লিষ্ট ইউনিটদ্বয় সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম মর্যাদা লাভ করতে পারে।

এই অধিবেশন আরো দাবী করছে যে, উপরোক্তভাবে গঠিত ইউনিটদ্বয়ে সংখ্যালঘুদের জন্য শাসনতন্ত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং অত্যন্ত কার্যকর আইনানুগ নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। তাদেরকে ধর্মনীতি, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শাসন পরিচালনাসহ অন্যান্য যাবতীয় স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং মুসলমান ভিন্ন অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে তাদের মতামত যাচাই করতে হবে।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে উপরোক্ত মূল আদর্শসমূহের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে শাসনতন্ত্রের একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করছে। উক্ত শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনাটি এই রকমভাবে প্রণীত হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট এলাকা ও অঞ্চলদ্বয় চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশরক্ষা, যোগাযোগ, কাস্টমস এবং প্রয়োজনবোধে অন্য কোনো দফতরের দায়িত্বভার নিজ হাতে গ্রহণ করতে পারে।"

শের-ই-বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক উত্থাপিত এই লাহোর প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন উত্তর প্রদেশের চৌধুরী মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, এম এল এ; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরদার আওরঙ্গজেব খান, এম· এল· এ·; মধ্যপ্রদেশের হাজী স্যার আব্দুল্লাহ হারুন, এম এল এ; বিহারের নবাব বাহাদুর ইসমাইল খান, এম এল সি; বেলুচিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি কাজী মোহাম্মদ ঈশা; মাদ্রাজের আব্দুল হামীদ খান, এম এল এ; বোম্বাইয়ের আইআই চুন্ডীগড়, এম এল এ; সেন্ট্রাল প্রভিন্সের সৈয়দ আব্দুর রউফ শাহ, এম·এল· এ;

পাঞ্জাবের ডক্টর মোহাম্মদ আলম, এম, এল, এ; বেগম মোহাম্মদ আলী এবং আইপি'র মওলানা আবদুল হামিদ কাদরী।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলিম লীগের অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব প্রণয়ন, উত্থাপন এবং অনুমোদনের ব্যাপারে তামাম উপমহাদেশের মুসলমানদের ভূমিকা ছিল, সোৎসাহ সমর্থন ছিল। উপমহাদেশের ভৌগোলিক এলাকার যে সিংহভাগটা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, সেখানকার মুসলিম প্রতিনিধিদেরও উদ্যোগ ও অনুমোদন ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রতি। কিন্তু ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে যখন উপমহাদেশ ভাগ হয়, তখন এই বিভক্তির ব্যাপারে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের এবং তাদের এ দেশীয় সহযোগী, প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপারটাই কার্যকর এবং বলবত হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা মূল লাহোর প্রস্তাবের কোনো তোয়াক্কা করেন নি। লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল স্যার ফ্রান্সিস টুকার তাঁর গ্রন্থ 'হ্যয়ার্ মেমরি সার্ভস্'-এ লিখেছেন যে, পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মৃত্যুর আগে তাঁর চিকিৎসকের কাছে বলেছিলেন, 'পাকিস্তান হচ্ছে আমার জীবনের বৃহত্তম ভুল।' (Where Memory Serves, Lt. Col Sir Francis Tuker) উপমহাদেশ যেভাবে বিভক্ত হয়েছে তাতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এবং প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারটাই অগ্রাধিকার এবং প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের পৃথক সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব কখনো স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেন নি।

আষাঢ় ১৩৯৬-এ প্রকাশিত 'জিন্না/পাকিস্তান ঃ নতুন ভাবনা' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণে শৈলেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১ থেকে ২০২ পৃষ্ঠা) লিখেছেনঃ

'১৯৪৪-এর '১৫-ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে গান্ধী দ্বিজাতিতত্ত্ব মানতে অস্বীকার করলেন, 'ধর্মান্তরিত এবং তাঁদের বংশধরদের কোন গোষ্ঠী পুরাতন জাতি থেকে ভিন্ন কোন জাতির সদস্য বলে দাবি করছেন - এর কোন উপমা আমি ইতিহাসে খুঁজে পাই না। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষ যদি এক জাতি ছিল তা হলে তার সন্তানদের এক বৃহদাংশের ধর্ম পরিবর্তন সত্ত্বেও তার অদ্বিতীয় জাতীয়তা অক্ষুণ্ন আছে।'

লক্ষণীয় যে, কংগ্রেস তথা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী ভারতের মুসলমানদেরকে হিন্দুদের বংশধর হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ কারণে ভারতের মুসলমানদেরকে আলাদা জাতি হিসেবে স্বীকার করেন না। গান্ধীর এই উক্তির মধ্যে, তাঁর ওই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে হিন্দু মহাসভার, আর্য-সমাজের, হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের তরফে চালানো 'শুদ্ধি' অভিযানের অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরিয়ে আনার বা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করার আকাঙ্ক্ষার অনুমোদন রয়েছে। এ জন্যই অখণ্ড ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাসনাধীনে রেখে মুসলমানদেরকে তারা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে হিন্দু বানাতে চেয়েছেন। কিংবা মুসলমানদেরকে দিতে হলে এমন একটা কীটদষ্ট, ক্ষণভঙ্গুর রাষ্ট্র দিতে চেয়েছে যা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার মতো সামর্থ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

সে যা-ই হোক, গান্ধীর চিঠির জবাবে কায়েদ-ই-আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯৪৪-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর লিখেছেন ঃ

'আমাদের বিশ্বাস ও বক্তব্য এই যে, জাতির যে-কোনো পরিভাষা ও মানদন্ডে মুসলমান ও হিন্দুরা দু'টি প্রধান জাতি।' এই চিঠিতে তিনি আরো লিখেছেন ঃ মুসলমানদের 'সংস্কৃতি ও সভ্যতা অপরাপরদের থেকে স্পষ্টত পৃথক। তাঁদের ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য, নাম ও নামকরণের পদ্ধতি, মূল্যবোধ ও মাত্রাজ্ঞান, আইন ও নৈতিক বিধান, আচার প্রথা ও পঞ্জিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য······সবই ভিন্ন।'

মৌলিক বৈশিষ্ট্যে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সত্তা যে হিন্দুদের থেকে বহুলাংশেই কেবল নয়, পুরোপুরি আলাদা এবং এই পৃথক সাংস্কৃতিক সত্তা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যে কেবল শুদ্ধি আন্দোলন চালানো হয় না, মুসলমানদের অর্থনৈতিক অস্তিত্বও গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেটা উপলব্ধি করেই মুসলমানরা কেবল অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়েই কেবল নয়, রাজনৈতিক দিক দিয়েও তাদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন করেছেন।

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফল এড়ানো

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, এই ঠিকানাস্থিত আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড থেকে ১ বৈশাখ ১৩৯৭ তারিখে প্রকাশিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' গ্রন্থের ৩৪১ পৃষ্ঠায় অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন ঃ

'জিন্নার আসল উদ্দেশ্য ভারতের ঐক্য নষ্ট করা নয়, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠার ফল এড়ানো। শুধু হাডসনই এমন কথা বলেন নি, জিন্নার চিঠি থেকেও তা প্রমাণ করা যায়।········ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো স্বতন্ত্র হলে জিন্না কোথায় যাবেন? দ্বিতীয়ত, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের কী লাভ হবে? তৃতীয়ত, পাঞ্জাবের এত দিনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভেঙে গিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে।'

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্য 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন

কায়েদ-ই-আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের লক্ষ্য ছিল যেমন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফল এড়ানো, ঠিক তেমনি কংগ্রেসেরও মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার ও এক ভারতীয় জাতির নাম করে কার্যত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সত্তা এবং অর্থনৈতিক অস্তিত্ব ধ্বংস করা। অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থের ৩৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। জিন্না বললেন, এটা 'mere camouflage....... which is really aimed at its supreme control of the country by the Congress.'

মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বের দাবি-দাওয়াগুলো এড়িয়ে গিয়ে, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা তথা সরকারে মুসলিম জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব এড়িয়ে গিয়ে কংগ্রেসের নামে কার্যত হিন্দু শাসন কায়েম করার লক্ষ্যে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন যে একটা ছদ্মবেশ, সেটাই জিন্নাহ তথা মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করতেন।

ইতোপূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার মুসলমানদের দাবি-দাওয়ার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ সাময়িকভাবে হলেও স্থগিত রাখলো। এ সময় হিন্দু-মুসলিম বৈরিতা বৃদ্ধি পেল বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারেরই মোটামুটি মদদক্রমে।

বিপান চন্দ্র ১৯৮৯-এ ২৮৬ বি· বি· গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২, এই ঠিকানাস্থিত কেপি অ্যান্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ' গ্রন্থের ২৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

'১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, সাম্প্রদায়িকতার ওপর নির্ভরতা আরো বাড়িয়ে দিল। সমস্ত নীতিই এখন সাফল্যের সাথে যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধের জন্য ভারতীয় সম্পদের সবচেয়ে বেশি আহরণের দিকে পরিচালিত হল।'

অতএব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়টা বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার নিজ স্বার্থে উপমহাদেশের মুসলমানদের ক্ষোভ প্রশমিত রাখতে সচেষ্ট হলো।

উক্ত গ্রন্থের ২৭৬ পৃষ্ঠায় বিপান চন্দ্র লিখেছেন ঃ কায়েদ-ই-আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাঁর এই দাবির ওপর জোর দিলেন যে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোনো আলোচনার আগে কংগ্রেসকে তার তথাকথিত নিরপেক্ষ চরিত্র ছেড়ে নিজেকে একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

বিপান চন্দ্র লিখেছেন ঃ

'১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ তারিখে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি দেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পদক্ষেপের ব্যাপারে ভেটো ক্ষমতা চেয়ে দাবি করলো যে, 'সারা ভারত মুসলিম লীগের অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া ভারতে সাংবিধানিক পদক্ষেপের ব্যাপারে কোনো ঘোষণা করা চলবে না।' মুসলিম লীগ দাবি করলো যে, 'মুসলিম লীগ একমাত্র সংগঠন যা মুসলিম ভারতের হয়ে কথা বলতে পারে।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসক সম্প্রদায় এ সময় তাদের মুসলিম বৈরিতা অনেকাংশে কমিয়ে আনছিল। বিপান চন্দ্র তার উক্ত গ্রন্থের ওই একই পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

'১৯৩৯-এর ৫ই সেপ্টেম্বর ভাইসরয় মুসলিম লীগের ভেটো ক্ষমতার দাবিকে মেনে নেওয়ার দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে জিন্নাকে বললেন যে, ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে আরো ভারতীয় সদস্য নেওয়া এবং প্রদেশগুলোতে জনপ্রিয় সরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে কংগ্রেস ও লীগের চুক্তির ওপর। রাষ্ট্রসচিব জেটল্যান্ড ২রা নভেম্বর সাড়া দিয়ে বললেন যে, কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগের সাথে সমঝোতায় আসতে হবে।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুসলমানদের বৈরিতা প্রশমিত করে রাখতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার যে কতখানি সচেষ্ট তা বোঝা যাচ্ছে।

উক্ত গ্রন্থের ২৭৭ পৃষ্ঠায় বিপান চন্দ্র লিখেছেন ঃ '১৮ আগস্ট ১৯৪০ তারিখে জেটল্যান্ড হাউস অভ্ লর্ডসে বললেন, বৃটেন অনিচ্ছুক মুসলিমদের ওপর সংবিধান চাপিয়ে দেবে না। ১৯৪০-এর

১৯ এপ্রিল লিনলিথগো জিন্নাহ্‌কে বললেন যে, মুসলিমদের পূর্বস স্মৃতি ছাড়া কোন সংবিধান চালু হবে না। 'এবং অবশেষে এলো ভাইসরয়ের বিখ্যাত ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক উক্তি– ১৮ আগস্ট ১৯৪০ তারিখে – যা লীগকে তার কাম্য ভেটো দিয়ে দিল। ভাইসরয় অঙ্গীকার করলেন যে, বৃটিশরা ঃ 'এমন কোনো সরকারী ব্যবস্থার কাছে ভারতের শান্তি ও কল্যাণের জন্য তাদের বর্তমান দায়িত্ব হস্তান্তরের কথা ভাবতেই পারে না, যার শাসন ভারতের জাতীয় জীবনে বৃহৎ ও ক্ষমতাশালী অংশের দ্বারা সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হবে। তারা এই রকম একটা সরকারের কাছে এই অংশকে নতি স্বীকার করানোতেও অংশীদার হতে পারে না।"

'এইভাবে ব্রিটিশরা বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে, সর্বোপরি আগস্ট ঘোষণার মাধ্যমে, মুসলিম লীগকে ভারতের সমস্ত পরবর্তী রাজনৈতিক অগ্রগতির ওপরে ভেটো ক্ষমতা দিয়েছিল।

'৮ই আগস্ট ১৯৪০ তারিখের প্রতিজ্ঞার যুক্তিকে পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া হয় যখন ১৯৪২–এর মার্চে ক্রিপস্ প্রস্তাবে পাকিস্তানের দাবিকে প্রচ্ছন্নভাবে মেনে নেয়া হয়। এতে প্রস্তাব করা হয়, একটি বা একাধিক প্রদেশ যদি যুদ্ধের পর পরিকল্পিত ডোমিনিয়ন স্টেটাসভুক্ত ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে না চায়, তবে তারা তার থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজস্ব সংবিধান রচনা করে ব্রিটেনের সাথে অনুরূপ পৃথক ডোমিনিয়ন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের তরফে উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে শান্ত ও কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট রাখার একটা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তাদের এই গরজটা আর থাকলো না। ফলে তাদের সমস্ত পূর্ব প্রতিশ্রুতিও ভুলে যেতে সময় লাগলো না। ইতোপূর্বে দেয়া প্রতিশ্রুতির বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিয়ে মুসলিম স্বার্থ বিরোধী বক্তব্য রাখতে শুরু করলো। এই প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪০–এর ২৩ মার্চের লাহোর প্রস্তাবের সময় বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের গরজজনিত যে মনোভঙ্গি ছিল সেটা আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রর ১৯৪৭–এর মধ্য আগস্টে উপমহাদেশ বিভক্তির সময় যে অবশিষ্ট ছিল না– এই বাস্তবতা স্মরণে রাখলে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব এবং এর তথাকথিত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটবে। যে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের ক্ষমতা মুসলিম লীগ তথা মুসলিম নেতৃবৃন্দের হাতে ১৯৪৭–এ ছিল না, তা ১৯৪৭ উত্তরকালে বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গঠনের ব্যাপারটি কি ইতিহাস বিকৃতি এবং উদ্দেশ্যমূলক নয়?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উপমহাদেশের মুসলমানদের সম্পর্কে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের ভূমিকা পাল্টালো। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুসলমানদেরকে দেওয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি আবার বিস্মৃত হল। এবং এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকালীন সময়ে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়েছে। পোকায় কাটা পাকিস্তানের জন্ম রহস্যের অন্যতম কারণও এটা।

লাহোর প্রস্তাব এবং পোকায় কাটা পাকিস্তান পাওয়া প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উপমহাদেশের মুসলমানদের কোন স্বার্থের বিরুদ্ধে অমুসলিমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেও মুসলমানরা আর ভেটো দিতে পারবে না, বৃটিশ

ঔপনিবেশিক সরকার এ রকম একটা সিদ্ধান্তই নিল। বিপান চন্দ্র ১৯৮৯-এ ২৮৬ বিবি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২, এই ঠিকানাস্থিত কেপি, বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ' গ্রন্থের ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

১৫ই মার্চ ১৯৪৬, প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ঘোষণা করলেন, "সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে আমরা অবহিত এবং সংখ্যালঘুদের ভয়শূন্যভাবে বাস করতে পারা উচিত। অন্যদিকে, কোনো সংখ্যালঘু অংশকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অগ্রগতির পথে ভেটো প্রয়োগ করতে আমরা কখনোই দিতে পারি না।" এবং ভারতে থাকার অজুহাত হিসেবে লীগের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাওয়ার ফলে তাকে একটা 'খবন্ধ' বা 'পোকায় কাটা' পাকিস্তান ছেড়ে দেওয়া হল।" অর্থাৎ 'পোকায় কাটা' পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের স্বার্থের বিষয়টিও গভীরভাবে জড়িত।

বিপান চন্দ্র 'পার্লামেন্টারী ডিবেটস্', 'হাউস অব কমনস', খণ্ড ৪২০, স্তম্ভ ১৪২২ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। গ্রন্থের ২৯৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন ঃ 'ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ-এর ওপর নির্ভর করাও সেই সময়ে পরিত্যাগ করা হয়েছিল।' বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি স্পষ্টতই জোর দিয়েছিলেন ঃ

'আজ আমি তাই ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদের ওপর বেশী জোর দেবো না।'

২৯৭ পৃষ্ঠাতেই বিপান চন্দ্র লিখেছেন ঃ 'অনুরূপভাবে, অন্য স্তম্ভটিকেও, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি বলেছেন ঃ 'ভারতীয় রাজ্যগুলোর সমস্যা রয়েছে। অবশ্যই, জাতীয়তাবাদ ও ভারতের ঐক্য সম্পর্কে ভারতে যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে, তা এই সব রাজ্যগুলোর প্রদেশগুলো সীমান্তে আটকে যেতে পারে না। আমি আশা করি বৃটিশ ভারত ও রাজন্য শাসিত ভারতের শাসনকর্তারা এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে একটি বিশাল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আবার, আমাদের দেখতে হবে যেন ভারতীয় রাজ্যগুলো তাদের যথোচিত জায়গা পায়; কোনো আগাম ইতিবাচক ভেটো ক্ষমতা থাকতে পারে না, এবং আমি কখনো বিশ্বাস করবো না যে, ভারতীয় রাজারা ভারতের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাইবেন। কিন্তু অন্যান্য যে কেনো সমস্যার মতোই এই বিষয়টার মীমাংসাও ভারতীয়রাই করবে।' ঐ স্তম্ভ ১৪২২-২৩।

বিপান চন্দ্র তাঁর গ্রন্থে ২৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন '১৯৪৭-এর রাজনৈতিক মীমাংসা দেখিয়ে দেয় যে, ব্রিটিশদের দায়বদ্ধতা সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার নীতির প্রতি বা মুসলিমদের প্রতি বা এমন কি, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিও ছিল না। সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে তাদের নীতি তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে তাকিয়েই হয়েছিল। এই পর্যায়ে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার সব প্রতিশ্রুতি এবং শপথ ভুলে যাওয়া হল। পাকিস্তানে যে লাখ লাখ হিন্দু এবং ভারতে যে মুসলিমরা রইল, তাদের জন্য কোনো রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হল না।'

বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল বলেই উপমহাদেশ বিভক্তির সময়ও লাহোর প্রস্তাবটিকে কোন ধর্তব্যের মধ্যে না এনে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

বিপান চন্দ্র তার উক্ত গ্রন্থের ২৬৬ পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন ঃ

'১৯৪৭-এ যে পাকিস্তান রূপায়িত হয় তা তার ১৯৪০-এ প্রকল্পিত রূপের চেয়ে অনেক আলাদা; তা ছিল 'কবন্ধ' বা 'পোকায় খাওয়া' পাকিস্তান। পাকিস্তানের আদি প্রকল্পিত রূপকে বাস্তবায়িত করার ব্যর্থতা ঔপনিবেশিক শাসকদের মুসলিম লীগের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতারই প্রতিফলন, যেখানে দেশ ভাগ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরাজয়ের প্রতিফলন এবং তার মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলিম উভয়েরই ক্ষতি হয়েছে। ইতিহাসে এটাই লিখিত হওয়ার সম্ভাবনা যে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে, অথবা জাতীয়তা ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষই লক্ষ্য পূরণের ধারণার বাস্তবায়নের এবং সাফল্যের দীর্ঘস্থায়িত্বের দিক থেকে বেশি ক্ষতি স্বীকার করেছে। তাই যখন ব্রিটিশ দেখলো যে, তারা আর তাদের শাসন বজায় রাখার জন্য লড়াই করতে পারবে না, তখন তাদের আর লীগের দাবি অথবা সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ নিয়ে লড়াই করার কোনো ইচ্ছা বা কারণ ছিল না।''

এর পরও কি বলা যাবে যে, মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের ব্যাপারে বা কার্যকর করার ব্যাপারে গাফিলতি করেছিল? আসলে উপমহাদেশ বিভক্তির সময় কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কি আদৌ পাত্তা দিয়েছিল?

লাহোর প্রস্তাব

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, এই ঠিকানাস্থিত আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড থেকে ১ বৈশাখ ১৩৯৭ তারিখে প্রকাশিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' গ্রন্থের ২৮২ পৃষ্ঠায় লাহোর প্রস্তাব প্রসঙ্গে অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন ঃ

'এই প্রসঙ্গে তিনটে কথা মনে রাখতে হবে (১) লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটা নেই, (২) দেশভাগের আভাসও নেই, আর (৩) এ প্রস্তাব শুধু অস্পষ্ট নয়, স্ববিরোধী। এর তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে দু'টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হবে যার অংশ (Unit)-গুলি হবে "autonomous and sovereign". স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌম অংশ বলতে কি বোঝায়? দ্বিতীয়ত, মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো নিজেরা সার্বভৌম হবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পর। তবে কি মাঝপথে আর একটা স্তর আছে, অর্থাৎ জিন্নার পক্ষে দর কষাকষির অবসর? তৃতীয়ত, হিন্দু শাসিত অঞ্চলে সংখ্যালঘুর ওপর সুবিচার ও মুসলিম শাসিত অঞ্চলে হিন্দুর প্রতি সুবিচারের উল্লেখ কি এক ধরনের কেন্দ্রের ইঙ্গিত বহন করছে না? কেন্দ্র থাকবে, দুটো স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হবে, তার আবার সার্বভৌম ইউনিট থাকবে, এ কি অদ্ভুত ব্যবস্থা? সব ভাল করে বিশ্লেষণ করে আমার সিদ্ধান্ত-এটা জিন্নার একটা চাল (ploy বা gambit)। ১৯৪৬ পর্যন্ত জিন্না তথা লীগ এই অস্পষ্ট ও স্ববিরোধী প্রস্তাবের কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি। জিন্না শুধু বলেছেন, হিন্দু ও মুসলিম দুটো আলাদা জাতি, এদের নিয়ে এক রাষ্ট্র গড়া যায় না। বড়লাটেরও মনে হয়েছিল এটা দর কষাকষির হাতিয়ার, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজ ও গণপরিষদের 'অসম্ভব দাবি'র 'অসম্ভব পাল্টা জবাব।'

লাহোর প্রস্তাব ঃ বাংলা–পাঞ্জাব বিভাগ

অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

১৯৪৫–এর '২৭ ডিসেম্বরে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারকলিপি ওয়াভেল পাঠান। তাতে আছে – যদি মুসলমানরা পাকিস্তান দাবিতে অটল থাকেন, 'he would tell Jinnah that if they persisted in this attitude, H.M.G. would have to take a decision and their decision would be based on the principle that large non-Muslim populations could not be included in Pakistan against their will. This would mean that western Bengal including Calcutta and at least two-fifths of the Punjab would have to be excluded from Pakistan and Jinnah would be left, in his own words., with only `the Husk',

ওয়াভেলের ধারণা ছিল এতে ভয় পেয়ে জিন্না অবিভক্ত ভারতই চাইবেন। এই স্মারকলিপি অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এভাবেই ভারত ভাগ হয়েছিল। জিন্নাকে ওয়াভেল ও মাউন্টব্যাটেন কেউ ভয় দেখাতে পারেন নি।"

এখানে লক্ষণীয় যে, উপমহাদেশ বিভক্তিতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের অনাগ্রহ ছিল। তারা বরং এই উপমহাদেশ বিভক্তি ঠেকাতেই চেয়েছিলেন।

অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থের ৪০২ এবং ৪০৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

'এ সময় ব্যবসা–বাণিজ্যের দিক থেকে ব্রিটেনের কাছে ভারতের পূর্বতন গুরুত্ব প্রায় তিরোহিত। ১৯৩৮–৩৯–এ ভারতের বস্ত্র চাহিদার মাত্র ৪% যোগাচ্ছিল ল্যাঙ্কাশায়ার। অর্থাৎ ভারত এই শিল্পে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছিল।— ভারতীয় শিল্পপতি ও বণিকরা ১৯৩৫–এর সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলো এবং তাঁদেরই সুবিধার্থে ১৯৩৪–এ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন পাস হয়।—— তবু ব্রিটিশ উদ্যোগের পক্ষে ভারতের গুরুত্ব কমে যায়নি। কয়লা, পাট ও চা শিল্প মার খেলেও রাবার, পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি ডানলপ, ইউনিলেভার, ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল প্রভৃতি বহু জাতিক সংস্থাকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করে।— পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয় ও বৃটিশ ডিরেক্টরদের সহযোগিতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। যুদ্ধের অধিকাংশ লাভ ভারতীয়দের হাতেই চলে যায়। যুদ্ধশেষে টাটা, বিলো, ডালমিয়ার শ্রীবৃদ্ধি——। অতএব স্বার্থ রক্ষার জন্য বৃটেনের দিকে না তাকিয়ে বৃটিশ শিল্পপতিরা ভারত সরকারের দিকে তাকাতে বাধ্য হন।

তবু কেবিনেট মিশনের আলোচনাকালে বৃটিশ বণিক ও শিল্পপতিদের চাপ অনেক কমে গিয়েছিল।— তা ছাড়া প্রথম দিকে স্বাধীন ভারতের ভোগ্যপণ্য যোগাবে ব্রিটেন ছাড়া আর কে?'

— সাম্রাজ্যিক ও আর্থিক দিক থেকে ভারতকে হাতে রাখতে হবে অথচ তার প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে, এই দোটানায় পড়েছিল কেবিনেট মিশন।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেনের অর্থনৈতিক, সামরিক এবং সাম্রাজ্যিক স্বার্থে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের দায় ছিল উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়কে খুশী রাখার। সে জন্য পারতপক্ষে উপমহাদেশ বিভক্তিতেও তাদের সায় ছিল না।

অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থের ৪০৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ''কেবিনেট মিশন ভারত রওয়ানা হওয়ার আগে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা দফতর থেকে যত পরামর্শ এসেছিল, সবই ভারত ভাগের (অর্থাৎ স্বতন্ত্র পাকিস্তান-এর) বিরুদ্ধে।''

'অন্যদিকে মিসেস উইন্ট (ফ্রেডা মার্টিন) ও পেন্ডেরেল মুন ভারতীয় পরিস্থিতি সরেজমিনে বিচার করে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হলে মুসলিমদের একটা স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র দিতে হবে, যা অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করবে, কিন্তু পাঞ্জাব ও বাংলা থেকে হিন্দু জেলাগুলোকেও আলাদা করে দিতে হবে।'' অর্থাৎ ভারতকে অখণ্ড রাখতে একটা 'পোকায় কাটা' পাকিস্তান সৃষ্টির পরামর্শও বৃটিশদের একাংশের ছিল।

অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থের ৪০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

ওয়াভেলের ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫ তারিখের Breakdown Plan-এ-ও ''মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছিল, যদি অমুসলিম জেলাগুলোর স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়। এই খণ্ডিত পাকিস্তানকে পরে 'পোকায় কাটা পাকিস্তান' বলা হয়েছে। ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মকালে এ ধরনের পাকিস্তানে রাজাজি ও গান্ধী সম্মত হয়েছিলেন।

কিন্তু বৃটিশ প্রতিরক্ষা দফতর প্রশ্ন তুললেন-ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে এই বিভক্ত, দরিদ্র ও দুর্বল পাকিস্তান হলে ব্রিটেনের কী সুবিধা হবে?—— পাকিস্তান খণ্ডিত হলে ঐ অঞ্চলের স্থায়িত্ব রক্ষার্থে ব্রিটেনের সামরিক দায়িত্ব থেকেই গেল।——কেবিনেট মিশনকে ব্রিটেনের সেনাপতিবর্গ জানালেন, ভারত ভাগ হোক না হোক, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান কমনওয়েলথ আসুক না আসুক, আসল সমস্যা- "There should Co-ordinated machinery for defence of geographical India, and that there should be a single common defence authority with whom H.M.G. could deal."

কেবিনেট মিশনকে তাই দুই পরস্পর বিরোধী সমাধানের সমন্বয় খুঁজতে হল-(১) সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান, (২) সাম্রাজ্যের (তথা প্রতিরক্ষার) সমস্যার সমাধান। তা আবার উভয় পক্ষই যেন অবাধ আলোচনার ফলে মেনে নেয়। প্রথমটা না হলে সুয়েজ থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ব্রিটিশ স্বার্থ বজায় রেখে অপসরণ সম্ভব নয়।——।

উল্লিখিত কারণে কেবিনেট মিশন প্রথমেই পাকিস্তান প্রস্তাবের ওপর জোর না দিয়ে ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছিল। একে বলা হয় Plan Union. অনেক লাটই পাকিস্তান-বিরোধী ছিলেন। গ্ল্যান্সি, ওয়াইলি ও কেসির কথা আগেই বলেছি। কেসির স্থলাভিষিক্ত বারোজ প্রস্তাব দেন-হিন্দু, মুসলিম ও রাজন্যবর্গের জন্য তিনটি পৃথক যুক্তরাষ্ট্র, প্রত্যেকটির জন্য আলাদা সংবিধান এবং শেষে সকলের ওপর এক Super Constituent Asembly যা প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও অন্যান্য ব্যাপারে দেখাশোনা করবে। আসামের লাট আর্চবোল্ড ক্লো

(Clow) বলেন, বৃটেনের শ্রেষ্ঠ অবদান–ভারতের সংহতি এবং "We must throw all our weight on the side of unity."

অর্থাৎ বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার স্বাধীনতা দেওয়ার সময় ভারতের অখণ্ডতা যতখানি সম্ভব বজায় রাখতে চেয়েছিলো।

অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থের ৪০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ ১৯৪৬–এর "৩ এপ্রিল যখন গান্ধী সরকারীভাবে আলোচনা করতে এলেন, তখন আবার উঠল— জিন্নার সঙ্গে রাজাজীর ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা ভেঙে যাওয়ার কথা। জিন্নার সঙ্গে চিঠিপত্রে এই ফর্মুলা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আবার বললেন, জিন্নাহ অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করুন। ওয়াভেলের মতে, গান্ধী অতি ঝানু রাজনীতিক, আদৌ সাধুসন্ত নন।"

এখানে স্মর্তব্য যে, ১৯৪৪ সালেও গান্ধী বলেছিলেন যে, পাকিস্তান নিতে হলে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করতে হবে।

গ্রন্থের ৪০৬ এবং ৪০৭ পৃষ্ঠায় অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন ঃ ১৯৪৬–এর "৪ এপ্রিল সরকারি সাক্ষাতকারে জিন্না বলেনঃ (১) পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে এমন কোনো ব্যবস্থা তাঁরা মেনে নেবেন না, আর (২) পাকিস্তান বলতে তিনি বোঝেন–"a nucleus of Muslim territory surrounded by sufficient additional territory to make it economically viable.". . . . পূর্বে পাকিস্তানের মধ্যে কলকাতা থাকতেই হবে। কারণ কলকাতা বাদ দিতে বলা হল "Like asking man to live without his heart." পরবর্তীকালে এই কলকাতা নিয়ে তিনি এবং (তাঁরই বকলমায়?) সোহরাওয়ার্দী মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কি ঝোলাঝুলি করবেন!"

গ্রন্থের ৪০৭ পৃষ্ঠায় অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন ঃ 'শিখদের পক্ষ থেকে তারা সিং বলেন, তাঁরা অখণ্ড ভারত চান, আর যদি ভারত ভাগই হয় তবে তাঁরা নিজেদের জন্য চাইবেন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। শিখ রাষ্ট্রের অধিকার থাকবে হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করবার।

····· আম্বেদকর গণপরিষদ চাননি কারণ তাতে বর্ণহিন্দুর আধিপত্য সুনিশ্চিত হবে।

– বর্তমান নির্বাচনে শুধু প্রমাণিত হয়েছে যে, হিন্দু ও মুসলমান ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়।

— বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভার লীগ সদস্যদের সভা ডাকলেন জিন্না ১০ এপ্রিল ১৯৪৬ তারিখে। সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব আনলেন সার্বভৌম পাকিস্তান চাই। তাতে থাকবে বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, সীমান্ত, সিন্ধু ও বালুচিস্তান। দু'টি গণপরিষদ গঠন করতে হবে; দু'টি আলাদা সংবিধান রচিত হবে; সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা করতে হবে। তবেই মুসলিমরা অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেওয়ার কথা ভাববে। বোঝা যায়– লীগ চাইছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার হবে দু'টি সার্বভৌম সরকারের agent বা নায়েব মাত্র।——

১০ এপ্রিল ১৯৪৬ তারিখের মধ্যে যত আলাপ হল দেখা গেল– কংগ্রেস চাইছে কেন্দ্র নিয়ে সংবিধান রচনা শুরু হোক এবং তার আওতাধীন বিষয় থেকে কিছু ঐচ্ছিক বিষয় বাদ

দেওয়া যেতে পারে। প্রধান সেনাবাহিনী থাকবে কেন্দ্রের হাতে। অর্থাৎ শক্তিশালী য়ুনিয়ন। শরৎ বসুও তা সমর্থন করেন।

অন্যদিকে লীগ চাইছে– প্রথমে কেন্দ্রকে ভেঙে দুই স্বতন্ত্র ভাগ করে পরে আবার জোড়া দিতে। আর সৈন্য বাহিনীও হবে দু'ভাগ।"

এক দিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্টিম রোলার চলার ভয় করছেন এবং অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক, সাম্রাজ্যিক এবং ভারত ও মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তার লক্ষ্যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কেই মদদ দিয়েছে। অতএব, সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় এই উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ ইচ্ছার কাছে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

গ্রন্থের ৪০৮ পৃষ্ঠায় অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন ঃ 'জিন্না যদি পুরো পাকিস্তানও পান তবু তা বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম হবে না–

বিলেত থেকে যে নির্দেশ নিয়ে মিশন এসেছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য ভারত ও মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা। কোন প্রস্তাবেই তাকে বিঘ্নিত হতে দেওয়া যায় না। তাই ১১ এপ্রিল ১৯৪৬ তারিখে ক্রিপসের দুই বিকল্প প্রস্তাব কেবিনেটের বিবেচনার জন্য বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হল।"

অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থের ৪৩০ এবং ৪৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ 'এই পরিস্থিতিতে ওয়াভেল কেন তুললেন অন্তর্বর্তী সরকারে বর্ণ হিন্দু–মুসলিম সমতা এবং পরে লীগ–কংগ্রেস সমতার প্রশ্ন? ··· বস্তুত শাসন পরিষদ গঠনের ব্যাপারে ওয়াভেল জিন্নাকে ভেটো দিতে চাইলেন। আজাদকে বারবার সরে দাঁড়াতে বলতে তাঁর দ্বিধা হল না।····

আসলে তাঁর মাথায় Breakdown plan ঘুরছে ··· 'পাকিস্তান' অবচেতন মনে গ্রহণ করেছেন তিনি। হিন্দু ভারত থেকে পশ্চাদপসরণ করে সেখানেই তিনি সাম্রাজ্যের শেষ ঘাঁটি গাড়তে চাইছিলেন।"

একটি "চিঠিতে তিনি বলেছেন, "The services are tired and discouraged . . . . . the loyalty of the police and the Indian army problemetical."

বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের যখন চলে যাওয়ার সময় হল, তখন উপমহাদেশকে কীভাবে কী রকম স্বাধীনতা দিয়ে যেতে চেয়েছিল এবং প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় উপমহাদেশের স্বাধীনতা কীভাবে পেতে চেয়েছিল, এই উভয়ের ইচ্ছার ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়েছে, 'পোকায় কাটা' পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের বা মুসলিম লীগ নেতা কায়েদ–ই–আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ইচ্ছা–অনিচ্ছা বা দাবী–দাওয়া আদৌ তেমন কোনো মূল্য পায়নি। এই যখন আদত অবস্থা, সে ক্ষেত্রে উপমহাদেশ বিভক্তির ভিত্তি হিসাবে লাহোর প্রস্তাবের প্রসঙ্গ আসার তো প্রশ্নই ওঠে না। ফলে সাতচল্লিশোত্তর কালে স্রেফ কেবল সেই 'পোকায় কাটা পাকিস্তান'–এর মানচিত্রের মধ্যে রদবদল ঘটানোর মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন নিহিত ব'লে যারা প্রচার ক'রেছেন, তারা স্পষ্টতই ইতিহাসকেই বিকৃত ক'রে দেখাতে চেয়েছেন কোনো বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত 'জিন্নাহ্ অব্ পাকিস্তান' গ্রন্থে ১৯৮৯-তে দ্বিতীয় মুদ্রণে ৩২৫ পৃষ্ঠায় স্ট্যানলি ওয়লপার্ট লিখেছেন ঃ

"At 10 Downing Street, on the evening of May 19, 1947, Mountbatten informed Prime Minister Attlee and his Cabinet Colleagues that. It had become clear that the Muslim League would resort to arms if Pakistan in some form were not conceded."65

Jinnah was interviewed by Reuters the next day and demanded an 800 mile long "Corridor" to link West and East Pakistan, promising a " really beneficial" relationship between Pakistan and Britain, and offering "Hindustan" a "Friendly and reciprocal" alliance."

Congress reaction to the "Corridor" demand proved so strongly negatinve that it never be-came a serious issue, receiving even less attention than the idea that Calcutta should emerge as a free port. Then Jinnah wired the Cabinet demanding that before Bengal and the Punjab were partitioned, a referendum should be held in each province to determine the will of its people in this vital regard. Mountbatten, however, spoke against the proposal, insisting it "would merely result in delay."67. The Cabinet "agreed" and the imperial steamroller moved ahead in high gear.

Krishna Menon flew to London to inform Mountbatten on May 21 that Nehru and Patel were "ready to accept" dominion status if it were offered to India in 1947."

স্ট্যানলি ওয়লপার্ট-এর গ্রন্থের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টতই যে বিষয়গুলো জানা যাচ্ছে সেগুলো হলো ঃ এক, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি উপমহাদেশ বিভক্তি পারতপক্ষে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। উপমহাদেশ বিভক্তিতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়েছে এই ধারণায় যে, কোন না কোনভাবে পাকিস্তান মেনে না নিলে মুসলমানরা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। এ ধারণা অমূলক ছিল কি-না সেটা ভিন্ন প্রশ্ন; তথাপি এটাই ছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বদ্ধমূল ধারণা।

দুই, ২০ মে ১৯৪৭ তারিখে কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ রয়টার্সের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সংযোগ হিসাবে ৮০০ মাইল "করিডোর" দাবী করেছিলেন। "করিডোর"-এর এই দাবীর প্রতি কংগ্রেস দৃঢ়তার সাথে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় এ বিষয়ে আলোচনা আর অগ্রসর হতে পারেনি। বৃটিশ ঔপনিবেশিক

সরকারও কায়েদ-ই-আজমের এই দাবীর প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেনি। মুসলিম লীগের তরফে কায়েদ-ই-আজম এ বিষয়েও হয়ে পড়েছিলেন একান্তই নিঃসঙ্গ এবং অসহায়।

তিন, কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ দাবী করেছিলেন যে, বাঙলা এবং পাঞ্জাব ভাগ করার আগে এই উভয় প্রদেশের জনগণের মতামত জানার জন্য গণভোট নেওয়া দরকার। কিন্তু ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন এই অজুহাতে যে, এর ফলে খামোখা উপমহাদেশ বিভক্তিতে বিলম্ব ঘটবে।

চার, উপমহাদেশ বিভক্তি এবং স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারটা তড়িঘড়ি করে পূর্ব ঘোষিত ১৯৪৮ থেকে পিছিয়ে এনে যে ১৯৪৭ করা হয়েছিল, সেটাও নেহরু প্যাটেলদের দাবী এবং শর্ত মোতাবেক। কৃষ্ণ মেনন বিমানে লণ্ডনে গিয়ে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে জানান যে, স্বাধীনতার দরকার নেই, নেহরু-প্যাটেল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসই মেনে নিতে রাজী আছেন যদি সেটা ১৯৪৮-এর জায়গায় ১৯৪৭-এ দেওয়া হয়। এর কারণ স্পষ্টতই মুসলিম লীগকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলা এবং তড়িঘড়ি করে যে-কোনো অসঙ্গত প্রস্তাব এবং দাবী মুসলিম লীগকে মানতে বাধ্য করা। এই ঘটনাটি থেকেও এটা স্পষ্ট যে, অখন্ড ভারতের কথা বললেও অর্থাৎ মুখে অখন্ড ভারতের কথা বললেও ভারত বিভক্তির ব্যাপারে কংগ্রেসের যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল। অন্যদিকে, মুসলিম লীগ সমস্যা সমাধানের শেষ বিকল্প হিসাবে মুসলমানদের জন্য পৃথক দেশ বা পাকিস্তানের কথা বললেও উপমহাদেশ বিভক্তির ব্যাপারে কার্যত তাদের কোন প্রস্তুতিই ছিল না। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মুখে যে কথাই বলুন এবং যে প্রস্তাবই নিন না কেন, অবচেতন মনে হলেও তাদের মনে এই বিশ্বাসটাই বদ্ধমূল ছিল যে, অখন্ড ভারতের প্রবক্তা কংগ্রেস তথা হিন্দু নেতৃবৃন্দ ভারতকে অখন্ড রাখার প্রয়োজনেই মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দাবী-দাওয়াগুলো মেনে নেবে।

১৯৪০-এর মার্চের ২২ এবং ২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত লাহোর অধিবেশনের আগে ইতোপূর্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের শেষ অধিবেশন বসেছিল ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে পাটনায়।

ইতোমধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। ১৯৪০-এর মার্চ মাসের ২২ তারিখে সকালে কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ফ্রন্টিয়ার মেইল ট্রেনে লাহোর ষ্টেশনে পৌছলেন। সেখান থেকে মোটর যোগে সোজা চলে গেলেন মেও হাসপাতালে, যেখানে একটি জেনারেল ওয়ার্ডে আহত খাকসাররা ছিলেন। তাদের প্রত্যেককে তিনি দেখলেন। খোঁজ-খবর নিলেন। কুশলাদি বিনিময় করলেন। যে খাকসাররা এর আগে এবং পরে সব সময়ই তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা চালিয়েছে, সেই তাদেরকেই আবার সান্ত্বনা দিতে চাইলেন তিনি।

লাহোরে সৌন্দর্যমন্ডিত ঐতিহাসিক বাদশাহী মসজিদ এবং সম্রাট শাহজাহানের গ্রেট ফোর্টের অদূরে মিন্টো পার্ক (এখনকার ইকবাল পার্ক)-এ ষাট সহস্রাধিক মুসলিম সদস্যের ঐতিহাসিক সমাবেশ হয়েছে যেখানে সেই প্যান্ডেলে কায়েদ-ই-আজম প্রবেশ করলেন দুপুরের একটু পরে দুটো বেজে পঁচিশ মিনিটে।

ঐতিহ্যবাহী পাঞ্জাবী পোশাক আচকান এবং চুড়িদার পায়জামা পরে এসেছেন তিনি। গোটা প্যান্ডেলটা রয়েছে বোম্বে মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডদের কড়া প্রহরায়। নেতৃনির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে কঠোর সংকল্পবদ্ধ তারা। কোথাও এর এতটুকুও ব্যত্যয় হতে দিতে

নারাজ তারা। শুক্রবারের এই অধিবেশনে প্যান্ডেলে উপস্থিত খাকসারদের তাঁদের তরফে স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে কায়েদ-ই-আজমের সামনে কোন্ ধরনের ব্যবহার করতে হবে।

মঞ্চের মধ্যস্থলে কায়েদ-ই-আজম তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন। তাঁর ডান হাতে বসলেন বোন ফাতেমা। শাড়ী পরিহিতা।

অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান মামদোতের নবাব উর্দুতে ঘোষণা করলেনঃ কায়েদ-ই-আজম ভাষণ দেবেন।

"কায়েদ-ই-আজম জিন্দাবাদ", এই গগনবিদারী ধ্বনির মধ্যে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নেতা।

যে ভাষায় পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো সেই উর্দুতেই ভাষণ শুরু করলেন তিনি। ভাষণের পরবর্তী অংশটি তিনি দিলেন ইংরেজীতে।

ভাষণ উর্দুতে দিতে দিতে উর্দু ছেড়ে ইংরেজীতে আসায় কানাঘুষা শুরু হলো।

কায়েদ-ই-আজম নীরবে শান্তভাবে স্থির ক্ষণিক দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। জনতা নীরব হলে লাইট জ্বালিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। এরপর চোখের শাসন হেনে জনসমুদ্রের দিকে তাকালেন।

টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনঃ এর পর টানা দু'ঘন্টা ভাষণ দিলেন কায়েদ-ই-আজম।

জনতা টু শব্দটিও করলো না।

একটি শব্দও না।

তাঁর ব্যক্তিত্বের শাসন এমনি ছিল।

স্ট্যানলি ওয়লপার্টের উক্ত গ্রন্থের ১৮০ এবং ১৮১ পৃষ্ঠায় আছে এ সব বিবরণ। স্ট্যানলি ওয়লপার্ট লিখেছেন যে, মওলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে রামগড় অধিবেশনে এর দু'দিন আগে ২০ মার্চ ১৯৪০ তারিখে মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী বলেছিলেন ঃ "আমার কাছে হিন্দু, মুসলিম, পার্সী, হরিজন-সব এক। কায়েদ-ই-আজম জিন্নাহ আমার ভাই। ·· ······ উনি যদি আমাকে তাঁর পকেটে রাখেন তা হলে আমি নিশ্চয়ই আনন্দিত হব।"

কায়েদ-ই-আজম এর জবাবে স্মিতহাস্যে এই ভাষণেই বললেনঃ

"Why not come as a Hindu leader proudly representing your people and let me meet you proudly representing the Muslims ? This is all that I have to say so far as the Congress is concerned."88

গান্ধী যে কায়েদ-ই-আজমের পকেটস্থ হতে চেয়েছেন, এটা স্পষ্টতই কায়েদ-ই-আজমের কাছে একটা অবাস্তব এবং হাস্যকর প্রস্তাব বলেই মনে হয়েছে। কায়েদ-ই-আজম চেয়েছিলেন, গান্ধী আসলেই যা সেই হিন্দু নেতা হিসাবেই গর্বভরেই আলোচনায় বসুন এবং কায়েদ-ই-আজমকেও একজন গর্বিত নেতা হিসাবেই আলোচনায় প্রতিনিধিত্ব করতে দিন।

তদুপরি কায়েদ-ই-আজম লাহোরে তাঁর ওই দু'ঘন্টাব্যাপী ঐতিহাসিক ভাষণে বললেনঃ

'এটা সব সময় ভুল করে ধরে নেওয়া হয় যে মুসলমানরা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আমরা এই অভিধায় অভ্যস্তও হয়ে পড়েছি এবং এই প্রমাদ দূর করার কাজটাও খুব সহজ নয়। তবু এটাই বাস্তব যে, মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয়। যে কোনো সংজ্ঞা মোতাবেকই মুসলমানরা একটা জাতি।

ভারতের সমস্যাটা আন্তঃসাম্প্রদায়িক নয়; স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক চরিত্রের এবং সেই হিসাবেই এই সমস্যাটিকে দেখতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই মৌলিক সত্যটা স্বীকার করা হচ্ছে ততক্ষণ যে সংবিধানই প্রণয়ন করা হোক না কেন, তা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবং কেবল মুসলমানদের কাছে নয়, বৃটিশ এবং হিন্দুদের কাছেও তা ধ্বংসাত্মক এবং ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হবে। বৃটিশ সরকার যথার্থই যদি উপমহাদেশের জনগণের মধ্যে শান্তি ও সুস্থিতি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আন্তরিক হয়ে থাকেন তা হলে সে ব্যাপারে আমাদের জন্য একটি মাত্র পথই খোলা আছে এবং তা এই যে, ভারতকে একাধিক স্বশাসিত জাতি রাষ্ট্রে ভাগ করে ভারতের প্রধান জাতিগুলোর জন্য পৃথক আবাসভূমির সংস্থান থাকতে দিতে হবে।

স্ট্যানলি ওয়লপার্টের উক্ত গ্রন্থের ১৮২ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতিঃ "It has always been taken for granted mistakenly that the Musalmans are a minority and of course we have got used to it for such a long time that these settled notions sometimes are very difficult to remove. The Musalmans are not a minority. The Musalmans are a nation by any definition.

The problem of India is not of an inter-Communal but manifestly of an international character and it must be treated as such, So long as this basic and fundamental truth is not realised, any Constitution that may be built will result in disaster and will prove destructive and harmful not only to the Musalmans, but also to the British and Hindus. If the British Government are really in earnest and sinere to secure the peace and happiness of the people of this Sub-continent, the only course open to us all is to allow the major nations separate homelands, by dividing India into "autonomous national States."90

এক পাকিস্তান

ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে এক পাকিস্তানের চিন্তাই কাজ করেছিল। এটা ছিল a single Pakistan Resolution অর্থাৎ এক পাকিস্তানের প্রস্তাব। লাহোর

অধিবেশনের শেষ দিনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কায়েদ-ই-আজম অন্তত তা-ই বলেছিলেন এবং পরের দিন সংবাদপত্রে সেটাই ছাপা হয়েছিল এবং মধ্যে দরকষাকষির একটা সংস্থান অবশ্যই ছিল। এরই মধ্যে পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সেকান্দর হায়াৎ খান চেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের কেন্দ্রীয় সরকার। স্যার ষ্ট্যানলি ওয়লপার্ট তাঁর উক্ত গ্রন্থের ১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

"Pakistan was not explicitly mentioned; nor was it clear from the language of the resolution whether a single Muslim state of both "Zones" had been envisioned or two separate "autonomous" independent states, one in the Northwest, the other in the Eastern zone .... But Jinnah was the leader; and when asked by reporters if this resolution meant one, or more than one, Muslim nation, his unequivocal answer sealed the fate of Bengal's Muslim majority. India's newspaper headlines next day pronounced the Lahore resolution, a single "Pakistan Resolution" and so it remained.

Sikandar held out for some form of federating central government to unite the "sovereign constituent units" and insisted till his death in December 1942 that the Lahore resolution was only a "bargaining point" for the League. For Sikandar, indeed it was, but not for Jinnah. Punjab governor, Sir Henry craik, reported the resolution to Linlithgow as "a very effective riposte to Congress as it torpedoed the Congress claim to speak for India.'

A few days later Gandhi was asked: "Do you intend to start general civil disobedience although Quaid-e-Azam Jinnah has declared war against Hindus and has got the Muslim League to pass a resolution favouring vivisection of India into two? If you do, what becomes of your formula that there is no swaraj without commnnal unity?"

So this he replied: "I admit that the step taken by the Muslim League at Lahore creates a baffling situation .. We are at present a joint family. Any member may claim a division.4

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটিতেও লক্ষণীয় যে, লাহোর প্রস্তাব থেকে সাংবাদিকরাও ভারতকে দু'ভাগে ভাগ করার কথাটাই বুঝেছেন। তদুপরি কংগ্রেস যে ভারতের মুসলমানদেরও প্রতিনিধিত্ব করে না সেটাও ওই লাহোর প্রস্তাবের সময় থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে গেলো।

লন্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক শুরু হয় ১২ নভেম্বর ১৯৩০ তারিখে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের আমলে এই প্রথম গোল টেবিল বৈঠক শেষ হয় দশ সপ্তাহ পর ১৯ জানুয়ারী ১৯৩১ তারিখে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী লন্ডনের কয়েকজন মুসলমান ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে এই প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের সময়ে সমবেত মুসলমান নেতাদের সঙ্গে দেখা করে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান গঠন করার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন। তখন সেখানে খোদ মুসলিম নেতৃবৃন্দই এ প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন।

কিন্তু ইতোমধ্যে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩০ তারিখে এলাহাবাদে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি, দার্শনিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, ব্যারিষ্টার, ডক্টর শেখ মুহম্মদ ইকবাল সভাপতির ভাষণে এই উপমহাদেশে বৃটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে বা বাইরে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন।

কিন্তু আল্লামা ইকবাল যে পাকিস্তান গঠন করতে চেয়েছিলেন, যে পাকিস্তান গঠনের কথা চৌধুরী রহমত আলীর চোখে, কায়েদ–ই–আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর চোখে, এমন কি, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাবসমূহে ছিল সেই অনুযায়ী কি লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান গঠন করতে দিয়েছেন?

বিশেষত আল্লামা ইকবাল তো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক এবং ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি কি উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি বলতে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে স্রেফ দু'খন্ড জমি বুঝেছিলেন?

মুসলিম ভারতে [illegible] অবদান

অধ্যাপক [illegible] ইসলাম

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মুসলিম জাগরণে ইকবালের অবদান

মাওলানা আমিনুল ইসলাম

মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা ইকবালের কাব্যে আমরা দেখতে পাই বিশ্ব মুসলিমের নব জাগরণের আকুল আবেদন। যখন এই উপমহাদেশে মুসলিম সমাজ তথা মুসলিম জাহান ছিল বিপন্ন এবং মুসলিম সমাজ শুধু তাদের পূর্ব পুরুষদের গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ করেই ক্ষান্ত ছিল; নিজের দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ দূরীভূত করার চেষ্টা করছিল না; এমনকি যখন তাদের বিপদের অনুভূতি পর্যন্ত ছিল না, যেমন-আল্লামা ইকবাল আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করে বলেছেনঃ

احساس عنایت کر آثار مصیبت کا

امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے

অর্থাৎ, হে খোদা! মুসলমানদের মধ্যে তাদের বিপদের অনুভূতি জাগিয়ে দাও এবং আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি, তা তুমি সবাইকে দেখিয়ে দাও। যখন সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতি ছিল নিরাশ, নিরুপায়, নিরুৎসাহ – এমনি বিপদময় মুহূর্তে আল্লামা ইকবাল মুসলিম জাতিকে জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন। তাদের মধ্যে নব প্রাণের সঞ্চার করেছেন। তিনি দুঃখ করে বলেছেনঃ

ناکامی متاع کا رواں جاتا رہا

کارون کی دل سے احساس زیاں جاتا رہا

অর্থাৎ, হায় কি ব্যর্থতা! আমার কাফেলা লুণ্ঠিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমন কি আমার কাফেলা এই ক্ষতির অনুভূতি থেকেও বঞ্চিত হয়েছে।

ইকবাল মুসলমানদের জীবনে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন। তাদের অলসতা, উদ্যমহীনতা, আশাহীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা, ক্লীবতা, জড়তা আর ভয়-ভীতিকে দূরীভূত করতে চেয়েছেন। তাই তিনি প্রেমের জয়গান গেয়েছেন সারা জীবন।

তিনি বলেছেন, তোমরা যদি নিজেই তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন না কর, উন্নতির পথে অগ্রসর না হও, এ পৃথিবীকে জয় করার সংকল্প গ্রহণ না কর তবে কোন দিনও তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তোমাদের দুর্গতি ঘুচবে না, কেউ তোমাদেরকে সাহায্য করবে না। যেমন আল্লাহ পাকও তাঁর এই নীতির কথা ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে। যদি কেউ বিমূঢ় আর হতাশ হয়ে থাকে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে না পড়ে, কঠোর পরিশ্রম না করে, নিজের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে না তোলে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদকে কাজে না লাগায়, জীবনকে স্তরের পর স্তর এগিয়ে নিতে উদগ্রীব না হয়, তবে শুধু যে তার উন্নতি ব্যাহত হয় তা-ই নয়; বরং তার সুপ্ত শক্তি শেষ হয়ে যায়, আর সে প্রাণহীন জড়বস্তুর অন্তর্গত হয়ে পড়ে। তাই তিনি বলেছেনঃ "অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে প্রত্যেকটি বস্তু জীবিত আছে।"

এ জন্য ইকবালের মতে, মানুষকে শক্তি অর্জন করতে হবে, এর কারণ তিনি এভাবে বলেছেনঃ

''শক্তিবিহীন সৌন্দর্য হলো যাদুকরী আর শক্তিপূর্ণ সৌন্দর্য হলো পয়গম্বরী"।

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর কর্মময় জীবনে ইকবালের এ কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। সুদীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত তিনি মক্কা নগরীতে ইসলাম প্রচার করেছেন। শক্তিহীন অবস্থায় তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন কঠোর পরিশ্রমের ভিতর দিয়ে। তাই তিনি বহুবার অত্যাচারিত হয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত বিপদময় মুহূর্তেও তিনি নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেননি; বরং তিনি সমগ্র কোফর জগতের সাথে একাই লড়াই করেছেন।

পরে যখন তিনি অনুভব করলেন যে, এভাবে শক্তিহীন অবস্থায় জয়যুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই তখন তাঁর কর্মপন্থায় বিরাট পরিবর্তন আসল। তিনি তার প্রিয়তম জন্মভূমি পবিত্র মক্কা নগরী ছেড়ে পুণ্যভূমি মদীনায় আসলেন, আর মদীনা থেকে নতুন উদ্যম-উৎসাহ নিয়ে আরম্ভ করলেন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনার বুকে শান্তি আনয়ন করলেন, আর ঘোষণা করলেন যে, তাঁর দল দুর্বল নয়, তাঁরা সবল, শক্তিশালী। তিনি ছিলেন শান্তিকামী, কিন্তু কেউ যদি অশান্তি সৃষ্টি করতো, তবে তার যথোচিত উত্তর দিতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কেননা আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে এই নির্দেশই দিয়েছেন। 'এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ করো যে পর্যন্ত না অশান্তি দূর হয়।'

অন্য স্থানে রয়েছে :
তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি আল্লাহর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন অন্যান্য ধর্মের ওপর তাঁকে গালেব এবং প্রভাবশালী করে অর্থাৎ, প্রকৃতির ধর্ম সত্য ধর্ম ইসলামকে জয় করতে হবে, যদি কেউ ইসলামের গতিকে রুখে দাঁড়ায় এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে তবে তাদের সাথে জিহাদ করো।

দুনিয়াতে যেন অশান্তি না থাকে, যেন শান্তি বজায় থাকে, এ জন্যই ইসলামী জিহাদ। কিন্তু সেদিন যদি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লাম দুর্বলতা দেখাতেন, শক্তি এবং সাহসের সাথে বিরোধী শক্তির মোকাবেলা না করতেন, তবে দুনিয়ার বুকে ইসলামের অস্তিত্ব থাকতো না। আল্লামা ইকবাল অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান জীবন থেকে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন দর্শনের ওপরই রাখা হয়েছে ইকবাল দর্শনের বুনিয়াদ। তাই তিনি বলেছেনঃ

تقدیر کے قاضی کا یہ فتوی ہے ازل سے
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات !

"আদিকাল হতে তাকদীরের কাজী এ ফতোয়া দিয়ে রেখেছেন, দুর্বলতার যে অপরাধ–এর শাস্তি হচ্ছে হঠাৎ মৃত্যু।" কারণ দুর্বলের বাঁচার কোন অধিকার নেই। মানুষ যদি এ সহজ সত্যটিকে উপলব্ধি না করে, সংগ্রামী জীবনে বিশ্বাসী না হয় আর সাথে সাথে নিজের ভুলের জন্য তকদীরের ওপর দোষারোপ করে; তবে তা অন্যায়, অসুন্দর এবং আত্মপ্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই ইকবাল বলেছেনঃ

تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے

তাকদীরের বিরুদ্ধে নালিশ করা নিরর্থক, তুমি নিজের তাকদীর নিজেই গড়ে তুলছ না কেন?

ইকবাল মুসলমানদেরকে কর্মময় জীবনের জন্য আহবান জানিয়েছেন নিজের অবস্থা চিন্তা করার জন্য, দেশের পরিস্থিতি লক্ষ্য করার জন্য আর দুরবস্থাকে দূরীভূত করার জন্য আন্দোলন করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

وطن کی فکر کر ائے ناداں مصیبت آنے والی ہے
تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں

হে অবুঝ মুসলিম জাতি! ওপরের তলায় তোমাদের ধ্বংস করার পরার্মশ হচ্ছে, এখনও সময় আছে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য চিন্তা করো, চিন্তা করো তোমার দেশের কথা। অগণিত মানুষের দুর্গতি কি করে দূর করবে আর কি ভাবে তাদের মুখে হাসি ফোটাবে তা–ই চিন্তা করো। অতীত তোমাদের অত্যন্ত গৌরবময় ছিল, কিন্তু অতীতের স্মরণ তোমাদের জন্য উপকারী হচ্ছে না, বরং বর্তমানকে দেখ, বর্তমান পরিস্থিতিকে বুঝবার এবং এ জন্য কোন বিধি–ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করো। ইকবাল বলেছেনঃ

ذرا دیکھ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے
دھرا کیا ہے پہلا عہد کھن کے داستانوں میں

অর্থাৎ, একটু দেখ, যা হচ্ছে আর যা হতে চলছে, অতীতের সেই পুরোনো কাহিনীগুলোতে কি রয়েছে।

ইকবালের এই আহবানে সাড়া দিয়ে একদিন তদানীন্তন উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। মুসলমানদের এ নব জাগরণের মূলে রয়েছে জাতীয় কবি আল্লামা ইকবালের সাধনা, তাঁর প্রদত্ত অনুপ্রেরণা ও কর্মস্পৃহা।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক প্রখ্যাত দার্শনিক আল্লামা ইকবালের দর্শনের মূল ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীস। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের সমস্ত সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে পেয়ে ছিলেন ইসলামে। কারণ তিনি ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা মনে করতেন। তদানীন্তন ভারতীয় মুসলমানরা যখন লক্ষ্যচ্যুত অবস্থায়, তখনই আল্লামা ইকবাল আবির্ভূত হলেনঃ

'আমার দিকে তাকাও, কারণ তোমরা এই ভারতের বুকে আর দেখবে না।
একটি ব্রাহ্মণ বালক রোম ও তাবরিজের জ্ঞানে অভিজ্ঞ।'

এর ভাবার্থ হচ্ছে আন্তরিকতার নীতিকে তুমি সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো।
'সুলতান ও আমীরের ভয়-ভীতিকে পরিহার করো,
ক্রোধে বা আনন্দে ত্যাগ করো না কভু বিচার,
দারিদ্র্যে অথবা সম্পদে ছাড়িও না এর দেহ মনের পরিপূর্ণ সংরক্ষণ বিনা
ইহকাল বা পরকালে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করা যায় না।
উজাড় আনন্দ বৈ জীবন কিছু নয়,
নীড় তার প্রকৃতির অনুকূলে নয়
ধর্মের পথে হীরকের মত বেঁচে থাক
দিলকে আল্লাহর দিকে রাখ
সন্দেহ বর্জন করে বেঁচে থাক।

তিমির অন্ধকারের পথ যেভাবে পূর্ণিমার চাঁদ আলো দেয় পৃথিবীকে, পথহারা পথিককে দেয় পথের সন্ধান, পথিক ফিরে পায় তার পথ আর পাথেয়, নীড় হারা পাখী ফিরে আসে তার নীড়-ঠিক এমনিভাবে জাতীয় দুর্দিনে যখন তাঁর ভাগ্যাকাশ হয়ে পড়ে মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকারাচ্ছন্ন তখন আল্লাহর দয়া হয় আর মহামনীষীদের আবির্ভাব হয় তাদের মধ্যে, তারা পান সঠিক পথের সন্ধান, জাতির ঘটে তিমিরাবসান।

এই চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি তদানীন্তন পাক-ভারত, বাংলা উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাসে। যখন মুসলিম সমাজ লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, যখন এই জাতি কলহ-দ্বন্দ্বে, বিবাদে-বিসম্বাদে লিপ্ত-এমনি চরম দুর্দিনের ঘনান্ধকারে ইকবাল আগমন করলেন একটি জ্বলন্ত আলোকবর্তিকা রূপে এবং একটি উজ্জ্বল শুভ্র তারকা হয়ে।

তাই আজ একথা সর্বজনবিদিত এবং স্বীকৃত যে, ইকবালের সাহিত্য, তাঁর দর্শন উপমহাদেশের বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের মুক্তির পথ সুগম করেছে। যদিও তিনি জাতির সুদিন এবং তার সাফল্য দেখে যাননি, তবুও অনাগত ভবিষ্যতের বিরাট সাফল্যে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাতির সেবা করে গেছেন। প্রায়ই তিনি বলতেনঃ তিনি কবি নন, জাতির একজন নগণ্য খাদেম মাত্র।

গদ্যের চেয়ে কবিতা তাঁর উদ্দেশ্যে অধিকতর ফলপ্রসূ হবে- এ জন্য তিনি কবিতার মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মনের বেদনা বিশ্বের মুসলমানদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ

دیا اقبال نے ھندی مسلمانوں کو سوز اپنا

ইকবাল দিয়েছে মুসলিম জাতিকে তার অন্তর।

তিনিবলেছেনঃ

گئے دن تنہا تھا میں اس انجمن میں
اب یہاں میری رازداں اور بھی ھے

"সেদিন গেছে যখন মাহফিলে আমি ছিলেম একা, এখানে আমার রহস্যবিদ রয়েছে আরও অনেক।"

ইকবাল তাঁর মিশনের সাফল্যের জন্য আমরণ সংগ্রাম করেছেন, পরিশ্রম করে গেছেন। কারণ বীর হয়ে কোন কাজে লেগে থাকার মধ্যেই রয়েছে সাফল্যের রহস্য এবং কৃতকার্য হবার পথ। জনৈক কবি বলেছেনঃ

کامیابی کا ثردہ دلکش سہی بیہم اور کچھ بھی نہیں

সাফল্যের আকর্ষণীয় সুসংবাদ অক্লান্ত সাধনার মধ্যেই রয়েছে। তাই বিশ্বের বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে দেখা যায় কঠিন পরিশ্রম, অক্লান্ত সাধনা আর অসাধারণ ধৈর্য। যেমন নিউটন বলেছেন-

আমার আবিষ্কারের কারণ আমার প্রতিভা নয়, বহু বছরের পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন চিন্তার ফলেই আমি আমাকে সার্থক করেছি। যা যখন আমার মনের সামনে এসেছে শুধু তার মীমাংসায়ই আমি ব্যস্ত থাকতাম। অস্পষ্টতা হতে ধীরে ধীরে স্পষ্টতার মধ্যে উপস্থিত হয়েছি। ডাক্তার বেনেটলেকে একবার তিনি বলেছিলেনঃ মানব জাতির যদি কোন কল্যাণ আমার দ্বারাই হয়ে থাকে তবে তা আমার বহু বছরের সহিষ্ণু সাধনার দ্বারা হয়েছে।

নিরাশা ও নিরানন্দ মনে কোন কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই ইকবাল ছিলেন আশাবাদী। তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিশ্চিত। মুসলিম জাতির নবজাগরণের নকীব দার্শনিক কবি ইকবাল তাই নিরাশ ছিলেন না। তিনি বলেছেনঃ

نهیں هے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے

ذرائم هو تو یه مٹی بهتر خیز هے ساقی

'ইকবাল তার বিধ্বস্ত ফসল থেকে নিরাশ নয়, হে খাকী–এ যমিন একটু ভিজলে অত্যন্ত উর্বর হয়।'

ইকবাল সারাটি জীবন মুসলিম জাতির চিন্তায় কাটিয়েছেন এবং তাদের নবজাগরণের জন্য আবেগময়ী ভাষায়, মন মাতানো সুরে গান গেয়েছেন। তিনি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি স্তরে মুসলিম জাতিকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

'আন্তরিকতার নীতিকে তুমি সুদৃঢ় করে ধরো।
তুমি সুলতান ও আমীরের ভয় থেকে পাক হও।
কারণ জীবনের সমস্ত কাজের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে আন্তরিকতার ওপর। আন্তরিকতা, ঘনিষ্ঠতা, অন্তরঙ্গতাবিহীন কোন কাজই সম্ভব হয়ে উঠে না।

যেখানে আন্তরিকতা আসে, সেখানেই সাহস, শক্তি সঞ্চারিত হয়, দূরীভূত হয় ভয়-ভীতি। তাই ইকবাল বলেছেন, সুলতান ও আমীরের ভয়-ভীতিকে পরিহার করো, ভয় করো শুধু আল্লাহকে আর কর্মময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আল্লাহ পাক ভিন্ন আর কাউকে ভয় করা মর্দে মুমিনের জন্য মহাপাপ।

মুসলমানরা দুনিয়াতে কাউকে ভয় করে না। তাই বিশ্বনবী হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

كلمة حق عند سلطان جائر افضل الجهاد

অর্থাৎ– জালিম বাদশাহর কাছে সত্য কথা বলে দেয়া উত্তম জিহাদ।

বিশ্ব নবীর এই বাণীর জন্যই ইকবাল বলেছেন ঃ বীর পুরুষদের প্রকৃতি হচ্ছে নির্ভীক হওয়া, সত্যকথা বলে যে, আল্লাহর ভয়ে সে ভীত হয় না কোন দিনও।

নির্ভীক হওয়ার এই মহান আদর্শ আল্লামা ইকবালের ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা দেখতে পাই। ইকবাল মুসলমানদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য জাতিকে শক্তি অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আন্তরিকতা, অন্তরঙ্গতার কথা, দেহ-মনের সংরক্ষণের কথা বলেছেন। আত্মবিশ্বাসী জন্মাবার, অন্তরকে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করার ও ধার্মিক হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তাই তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে এই ফরিয়াদ করেছেন ঃ "যেন মুসলিম সমাজ তাদের হারানো গৌরব ফিরে পায়। বিশ্ব দরবারে আবার তারা শির উঁচু করে দাঁড়ায়। আবার যেন দুনিয়া আবু বকরের (রাঃ) সংকল্পের দৃঢ়তা, হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসন ব্যবস্থা, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বদান্যতা ও হযরত আলী (রাঃ)-এর বীরত্ব দেখতে পায়। আবার যেন পৃথিবীতে ওমর বিন আবদুল আজীজের যুগ ফিরে আসে। খালেদ, তারেক, মুসা আর মোহাম্মদ বিন কাসেমকে দেখতে পায়।" ইকবাল বলেছেনঃ

یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے
جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے

'হে প্রভু'! মুসলিম-এর দিলকে সে জীবন্ত আকাঙক্ষা দান করো,
যা আত্মাকে স্পন্দিত করে দেবে আর অন্তরকে উত্তপ্ত করে তুলবে।'
'এ যুগের অন্ধকারে প্রত্যেক ব্যথিত প্রাণকে প্রেমের সে চিহ্ন দাও যা চাঁদকে লজ্জিত করে,
উদ্দেশ্যকে নক্ষত্রের মতো শ্রেষ্ঠত্ব দাও, তীরের আত্ম-অভিমান দাও, সমুদ্রের স্বাধীনতা দাও।'

সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত এই মাটির পৃথিবীতে বহু লোক এসেছে এবং চলে গেছে, কিন্তু এদের মধ্যে বহু লোক চিরতরে ধরণী থেকে বিদায় নিয়েছে। আজ কেউ জানে না যে, তারা দুনিয়াতে কবে কোথাও এসেছিল কি-না। আবার কেউ মৃত্যুর পর চিরঞ্জীব এবং চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন, মৃত্যু তাদেরকে বিশ্ব সভা থেকে বিদায় দিতে পারেনি, বরং মৃত্যুর পরও তারা অধিকতর নাম, যশ অর্জন করেছেন। দেশ-বিদেশের প্রতিটি মানুষের মনের নিভৃত কোণে তারা নিজস্ব স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা ইকবাল তাদেরই একজন। তিনি বলেছেনঃ

اثر کر یا نہ کر میں تو ے میری فریاد
نہیں ھے داد کا طالب یہ بندہ آزاد

তোমার অন্তরে রেখাপাত করুক বা না করুক তুমি আমার ফরিয়াদ শ্রবণ কর, এই বান্দা কোন প্রকার বিনিময়ের প্রার্থী নয়।' আল্লামা ইকবাল ঘুমন্ত–তন্দ্রাহত মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করতে সচেষ্ট ছিলেন সারা জীবন।

اٹھ کہ اب بزم جہاں میں اك انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیری ہی دور کا اغاز ہے

উঠো, বিশ্ব সভায় নতুন ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে তোমার যুগের সূচনা হচ্ছে। যখন ইকবাল মুসলিম জাতিকে নবপ্রাণে স্পন্দিত করতে চেয়েছিলেন তখন তাদের ভাগ্য রবি ছিল অস্তমিত, তিনি তবুও নিরাশ ছিলেন না। তিনি ছিলেন আশাবাদী। তিনি বলেছেনঃ

جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید ہیں

ادہر ڈوبتی تو ادہر نکالتی

অর্থাৎ, এই বিশ্বে মুসলিম জাতি সূর্যের ন্যায় বেঁচে থাকে। সূর্য উদিত হয়, আর অন্য দিকে অস্তমিত যায়। অপরদিকে ইকবাল বলেছেন মুসলমানদেরকে কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। সংগ্রামী জীবন যাপন করতে হবে। শত সাধনা অব্যাহত রাখতে হবে। শুধু এই অবস্থায়ই মুসলিম জাতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। তিনি বলেছেনঃ

الٹ جائیگی تدبیریں بدل جائیگی تقدیریں

حقیقت ہے نہیں ہے تخیل کی خلافی

অর্থাৎ, ওরে মুসলিম! তোমরা তদবীর জোরদার কর। তবে দেখবে তকদীর বদলে যাবে। এটি বাস্তব সত্য, কবির কল্পনা নয়।

আল্লামা ইকবালের মতে, মুসলিম জাতির উন্নতি–অগ্রগতির মূলে রহস্য নিহিত রয়েছে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূলে করীম (সঃ)–এর প্রতি ঈমানের মধ্যে। এই ঈমান যত বৃদ্ধি পাবে, মুসলমানদের শক্তি–সামর্থ্য ততই বেড়ে যাবে। এমনকি তিনি বলেছেনঃ

آج بھی ہو جو ابراھیم کا ایمان پیدا

آگ کرسکتی ہے انداز گلستاں پیدا

অর্থাৎ, আজও যদি কারো মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর ঈমান পয়দা হয়, তবে অগ্নিকুণ্ড ফুল বাগানে পরিণত হতে বাধ্য, যেমনটি হয়েছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর ক্ষেত্রে।

জাতীয় জাগরণের কবি ইকবাল এরপর বলেছেনঃ

اگ ہے اولاد ابراھیم ہے نمرود ہے

کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے

অর্থাৎ, অগ্নি আজও রয়েছে, ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর এবং নবরূদ, কেউ কি এ যুগে কারো পরীক্ষা নিবে?

বস্তুত সত্য-অসত্যের সংগ্রাম আজও অব্যাহত রয়েছে। এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে; বীরত্ব এবং সৎসাহস নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। আল্লামা ইকবাল বলেনঃ

در جہاں نتواں اگرمردانہ زیست
همجون مردان جان سپردن زندگی است

অর্থাৎ, জগতে মানুষের মতো যে বেঁচে থাকতে পারে না আর বীরের মতো মৃত্যুবরণই জীবন তার।

زند کانی قوت بیداستی
اصل او از ذوق استیلاستی

অর্থাৎ, শক্তি অর্জনই হলো জীবন, সত্যিকার বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা হলো মূল উৎস তার। জীবন হলো বীজ, শক্তি হলো ফসল, তার শক্তি বুঝিয়ে দেয় রহস্য, সত্য-মিথ্যার। আল্লামা ইকবাল মুসলিম জাতিকে নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে বলেনঃ

اپنی دنیا اب پیدا کر اگر زندوں مین ھے
سرا دم ھے خمیرکن مکان ھے زندگی

যদি তুমি জীবন্ত হও, তবে তোমার জগৎ তুমি নিজেই সৃষ্টি কর।

ای مسلمان هر گھری پیش نظر
"انّہ لا یخلف المیعاد رکھ
یہ لسان لعصرکا پیغام ھے
ان وعد اللّٰہ حق یاد رکھ

ওরে মুসলিম! সর্বদা মনে রেখো, আল্লাহ পাকের অংগীকার সত্য। তোমরাই হবে বিজয়ী, যদি তোমরা হও প্রকৃত মুমিন।

ইকবাল কাব্যে সমকালীন রাজনীতির প্রভাব

কানিজ–ই–বাতুল

আমাদের দেশ আজ পুরোপুরি স্বাধীন। জাতি জাগ্রত কিন্তু এমন দিনও ছিল, যখন জাতি ছিল উদাসীনতার তিমিরে আচ্ছন্ন, আর দেশ ছিল বিদেশী শক্তির নাগপাশে আবদ্ধ। যে সব মনীষীর কলমের বদৌলতে মুসলিম জাতির চোখ ফুটেছে, যাঁদের চিন্তাধারা দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনের যথোপযোগী পটভূমি রচিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আল্লামা ইকবালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত দেখা যায়, অনুভূতিপরায়ণ কবি ও সাহিত্যিকরা কাব্য ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই মানব–জীবনের রূপায়ণ করে থাকেন, তাঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেন জাতির অতীত, সৃষ্টি করেন জাতির সুন্দর ও সুষ্ঠু ভবিষ্যৎ। ইকবাল ছিলেন ঐরূপ একজন সংবেদনশীল কবি। তাঁর লক্ষ্য ছিল কাব্যের মাধ্যমে জাতিকে ঠিক পথে পরিচালিত করা।

ইকবাল তা নিশ্চয়ই করেছেন। তদুপরি তিনি জীবনের শেষ ভাগে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নিজ চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করারও চেষ্টা করেন। তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা উপমহাদেশের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং সৃষ্টি করেছে নতুন ভৌগোলিক অবস্থান তথা পাকিস্তান। তিনি কেবল যুগের সেরা কবিই নন, যুগ সৃষ্টিকারীও বটে। তাঁর লেখা কেবল তদানীন্তন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথই সুগম করেনি, হিন্দু মুসলিম উভয় জাতির সমকালীন রাজনৈতিক জটিল সমস্যারও অনেকটা সমাধান করেছে। তাঁর দেশ বিভাগ পরিকল্পনা কেবল মুসলিম স্বার্থের অনুকূলই ছিল না, তা ছিল উপমহাদেশের সকল সম্প্রদায়ের মুক্তির পথ। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ রাজনীতিক ও দূরদর্শী চিন্তাবিদ। তাই তিনি সমকালীন রাজনীতির প্রভাব ও ফলাফল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। সমকালীন রাজনীতির প্রভাবেই তাঁর চিন্তাধারায় দেশ–বিভাগের পরিকল্পনা স্থান লাভ করে।

কিছুদিন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অনুসরণ করার পর তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বে উপনীত হন। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি গভীরভাবে লক্ষ্য করেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে অমুসলিম নেতাদের স্বার্থপরতা অনুধাবন করে তাঁর মন–প্রাণ বেদনায় ভরে ওঠে। তিনি মুসলিম জাতির উন্নতির পথ খুঁজে বের করতে সক্ষম হন এবং তা কাব্যাকারে জাতির সামনে তুলে ধরেন।

ইকবাল কাব্যে উর্দু কবি হালী, শিবলী এবং আকবর এলাহাবাদীর জাতীয় জাগরণমূলক ভাবধারা চরম পূর্ণতা লাভ করেছে।[১] হালী, শিবলী ও আকবর এলাহাবাদী জাতিকে একটি নতুন পথ সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু ইকবাল তাঁর কবিতায় শুধু প্রেরণা নয়, তা বাস্তবায়িত করার কর্মসূচীও দিয়েছেন। তিনি কেবল মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেননি, ঐ দর্শনকে কার্যকর করারও চেষ্টা করেছেন।

তিনি বলেনঃ

میں بُلبُلُ نالاں هوں ایك اجڑے گلستان کا
تاثیر کاسائل هوں محتاج کو داتا دے

মাঁয় বুলবুল-এ-নাঁলা হুঁ এক উজড়ে গুলিস্তাঁ-কা
তাসীর-কা-সায়েল হুঁ, মুহতাজ- কো-দাতা-দে [২]

অনুবাদঃ
আমি বিরান বাগানের ক্রন্দনরত বুলবুল,
আমি চাই, আমার কবিতা ফলপ্রসূ হোক,
হে আল্লাহ! তুমি এই মুখাপেক্ষীকে তার মনযিলে উপনীত কর।

ইকবালের যুগটা ছিল মুসলিম জাতির জন্যে দুর্যোগময়।[৩] মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরেই ইউরোপীয়দের প্রভাবাধীনে চলে গিয়েছিল। অনেক দেশের মুসলমান হয়ে গিয়েছিল রাজ্যহারা, বরং ইকবালের কথায় বলতে গেলে 'গৃহহারা'। তিনি 'বাংগ-এ-দারা'য় 'দুআ' নামক কবিতায় একটি চরণে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে বলেনঃ

بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل

'ভট্‌কে হুয়ে আহু-কো-ফির সুয়ে হারাম-লে-চল'

অনুবাদ ঃ পথহারা হরিণকে তুমি আবার মক্কা শরীফে নিয়ে চল।[৪]

ইকবালের কাব্যে সমকালীন রাজনীতির কতটুকু প্রতিফলন রয়েছে, তা অনুধাবনের সুবিধার্থে তাঁর কাব্যধারাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ বিলাত গমন-পূর্ব কাব্য এবং বিলাত গমনোত্তর কাব্য। ১৯০৫ সালে তিনি বিলাত গমন করেন এবং ১৯০৮ সালে দেশে ফিরে আসেন।[৫]

বিলাত গমনের পূর্বে তাঁর চিন্তাধারা পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। তখন তিনি ছিলেন যুক্ত জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী। তাঁর এ সময়কার কাব্যে ভারতীয়তাবাদের শিক্ষা মেলে। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু মুসলিম সবাইকে দেশপ্রেম, ঐক্য ও ভালবাসার শিক্ষা দেন।[৬] তিনি ভালভাবে ইউরোপীয়দের ভেদনীতি (Divide and rule policy) অনুধাবনকরেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা ভারতবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং বিবাদ জিইয়ে রেখে চিরদিন ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে। ঐ সময় ইকবালের চিন্তাধারা ছিলো ভৌগোলিক সীমাভিত্তিক। তিনি স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। উর্দু কবি আযাদ এবং হালীর স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতাও তখন তাঁর মনে কিছুটা দেশপ্রেম সৃষ্টি করেছিল।

'বাংগ-এ-দারা'-এর প্রথম ভাগে 'হিমালা' (হিমালয় পর্বত), 'নয়া শিওয়ালা' (নতুন শিবমন্দির), 'তাসবীর-এ-দরদ' (দুঃখের ছবি) ও 'তারানা-এ-হিন্দী' (ভারতীয় গান) হল তাঁর উল্লেখযোগ্য স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা।[৭]

'তাস্‌বীর–এ–দরদ্‌' কবিতায় ভারতবাসীর প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলেনঃ

وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے
تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں
نہ سمجھوگے تومٹ جاؤگے اے ہندوستاں والو !
تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

ওয়াতান–কী–ফিক্‌র কর্‌ নাদাঁ, মুসিত্‌ আনেওয়ালী হায়
তেরী বরবাদীয়োঁ কে মাশ্‌ওয়ারে হাঁয় আস্‌মানু মেঁ।
না সামজোগে–তো–মিট্‌ যাওগে আয় হিন্দুস্তাঁ ওয়ালো!
তুমহারী দাঁস্তা তক–ভী–না হোগী দাস্তানুঁ–মেঁ [৮]

অনুবাদঃ ঘামাও মাথা স্বদেশের ভাবনায়
আসন্ন তোমারবিপর্যয়।
চলছে আকাশে তোমার লয়ের আলাপন,
আসছে ঘনিয়ে তোমার দুর্যোগ।
ওহো ভারতবাসী!
বুঝতে শেখো আপন পরিণাম,
নইলে মুছে যাবে তুমি অচিরে,
রইবে না তোমার নাম–নিশান
ইতিহাসের পাতায়।

ভারতবাসীদের পরস্পর গোঁড়ামি ও ঝগড়া বিদেশী ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। তাই ইকবাল তাদেরকে ভালোবাসা ও ঐক্যের বাণী শোনানঃ

جوتوسمجھے آج تک پوشیدہ بانی ہے محبت میں
غلامی ہے اسیر امتیاز ما و تو رھنا

জো তু সামঝে আযাদখ হায় পোশীদা বাণী মহববত–মেঁ
গোলামী হায় আসীর–এ–ইমতিয়ায–এ–মা–ওয়া–তু–রহ্‌না

অনুবাদ ঃ ভালবাসার মধ্যেই স্বাধীনতা নিহিত এবং ঝগড়া–বিবাদের মধ্যে রয়েছে গোলামী।

১৯০৫ সালে ইকবাল বিলাত গিয়ে ইউরোপের চিন্তাধারা, সমাজ–ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ভাবধারার সাথে সম্যকভাবে পরিচিত হন। বিলাত যাওয়ার আগে তিনি 'তারানা–এ–হিন্দী' (ভারতীয় গান) কবিতায় বলেছিলেনঃ

سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا
ہم بلبلیں ہیں اسکی یہ گلستاں ہمارا

সারে জাহাঁ–সে–আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা

হাম বুল বুলেঁ হাঁয় ইস্কী ইয়ে গুলিস্তাঁ হামারা। [৯]

অনুবাদঃ সকল দেশের সেরা মোদের এ হিন্দুস্তান
মোরা এর বুলবুলি, মোদেরই এই বাগান।

ইকবাল স্বজাতির জন্য গভীর মর্মবেদনা ও তীক্ষ্ম প্রেরণা নিয়ে লণ্ডন থেকে ১৯০৮ সালে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর লণ্ডন হতে ফেরার প্রায় ছয় বছর পর, ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর উপর তীব্র আঘাত হানে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে স্বার্থপরতা ও আগ্রাসনমূলক জাতীয়তাবাদ দেখা দেয়, তারই অনিবার্য পরিণতি ছিল এই প্রথম মহাযুদ্ধ।

এই যুদ্ধে মুসলিম দেশসমূহের শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তা মিত্রশক্তির পদতলে লুটিয়ে পড়ে। তুরস্ক সাম্রাজ্যের কন্‌ষ্টান্টিনোপল ও আনাতোলিয়ার কিয়দংশ পরাশক্তির করায়ত্ত হয়ে পড়ে। এক কথায় তুরস্কের বিরাট এলাকা মিত্রশক্তির অধিকারভুক্ত হয়। সুলতান প্রকৃতপক্ষে মিত্রশক্তির হাতে বন্দী হন এবং রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে তাদের সামরিক কর্তৃত্বে চলে যায়। এই যুদ্ধে তুরস্ক সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভার্সাই সন্ধির ফলে তুরস্ক তার আরবীয় রাষ্ট্রসমূহ (সিরিয়া, ইরাক ও কুর্দিস্তান) এবং মিসরের উপর তাঁর কর্তৃত্ব হারায়।[১০]

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জেনেভায় 'লীগ অব নেশনস' (League of Nations) গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল দুর্বল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের হাত হতে রক্ষা করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ফল হয় বিপরীত। বড় বড় রাষ্ট্রগুলো লীগ অব নেশনস-এর ছত্রছায়ায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে পদানত করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। ইকবাল এই প্রতারণামূলক নীতি উপলব্ধি করে খুবই মর্মাহত হন। তিনি 'পায়াম্‌-এ-মশ্‌রিক' গ্রন্থে দুঃখ করে বলেনঃ

চালাক-চতুর কাফন চোরেরা একটি সমিতি গঠন করেছে,
যাতে তারা চাতুর্যের সাথে কবর বন্টন করে স্বীয় ইচ্ছামত
তা ভোগ করতে পারে[১১] (অনূদিত) (জমীয়ত-এ-আকওয়াম)

কবি লীগ অব নেশনস গঠনকারীদেরকে (রাশিয়া, জার্মানী, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইটালী) 'কাফন চোর' এবং এশিয়া তথা দুর্বল জাতিকে কবরের সাথে তুলনা করেছেন। ইকবালের এই চমৎকার উপমায় 'লীগ অব নেশনস'-এর স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। এর কাজ-কারবার উপলব্ধি করে তিনি জেনেভার স্থলে তেহরানকে প্রাচ্যের কেন্দ্রবিন্দুর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেনঃ

دیکھا ھے ملکیت افرنگ نے جو خواب
ممکن ھے که اس خواب کی تاثیر بدل جائے
تھران ھو اگر عالم مشرق کا جینوا !
شاید کرۂ عرض کی تقدیر بدل جائے

দেখা হায় মুলকিয়াত-এ-আফরং-নে-জো খোওয়াব
মুমকিন হায়-কে-ইস খোওয়াব-কী-তাবীর বদল যায়ে!

তেহরান–হো–আগ্‌র আলম–এ–মাশরিক–কা–জেনেভা
শায়দ্ কুররা–এ–আর্‌য–কী–তকদীর বদল যায়ে।[১২]
অনুবাদঃ ইউরোপীয় দেশসমূহ যে স্বপ্ন দেখেছে, তার প্রতিফলন
বিপরীত হতে পারে, তেহরান যদি প্রাচ্যের জেনেভা হয়।
এটা হলে হয়তো এই পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তিত হতে পারে।

ইকবালের দর্শনের ভিত্তি ছিল কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণী। কিন্তু অমুসলিম দার্শনিকদের চিন্তাধারার সঙ্গে যেখানে তাঁর ভাবধারার সামঞ্জস্য দেখতে পেয়েছেন, সেখানে তিনি সেটাকেও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন।

'বাংগ–এ–দারা'য় 'জওয়াব–এ–খিযির' (১৯২২) নামক কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন যে, ইসলামের শ্রম ও পুঁজি –নীতির সাথে কার্ল মার্কসের সাম্যবাদের মিল রয়েছে।

তিনি বলেনঃ

اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار حیلہ گر
شاخ آھو پر رھی صدیوں تک تیری برات

আয়–কে–তুজ–কোখা গেয়া সর্‌মায়াদার–এ–হিলাগর
শাখ–এ–আহু–পররাহী সদয়ুঁ তলক তেরী বারাত[১৩]
তিনি আরো বলেনঃ

دست دولت آفریں کو مزدیوں ملتی رھی
اھل ثروت جیسے دیتے ھیں غریبوں کو زکوات !

ﷲ کے اب بزم جہاں کا اور ھی انداز ھے
مشرق ومغرب میں تیرے دور کا آغاز ھے

দাস্ত–এ–দৌলত আফিরী কো–মুযদ য়ুঁ মিলতি রাহী
আহ্‌ল–এ–সারওয়াত জায়সে দেতে হাঁয় গরীবোঁ কো যাকাত
অনুবাদঃ ধন–উৎপাদনকারীরা মালিকদের নিকট থেকে এতই সামান্য পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে, যেমন গরীবেরা ধনশালীদের নিকট থেকে যাকাত পেয়ে থাকে।
১৯১৭ সনে সংঘটিত রাশিয়ার বিপ্লব ইকবালকে প্রভাবিত করে। তিনি তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ঐ বিপ্লবের প্রতি জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
তিনি 'বাংগ–এ–দারা'–য় শ্রমিকদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেনঃ
উঠকে–আব্–বয্‌ম–এ–যাহাঁ–কা–আওরহী আন্দায্ হায়[১৪]
মাশরিক্ মাগ্‌রিব্ মেঁ–তেরে দাওর–কা–আগায্ হায়
অনুবাদঃ হে শ্রমিকেরা ওঠো, এখন দুনিয়ার হালচাল বদলে গেছে।
প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে এখন তোমাদেরই যুগ সমাগত।

ইকবাল রাশিয়ার লেনিনের দিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেনঃ

آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا
آسماں ! ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک !

আফ্‌তাব–এ–তাযা পয়দা বাত্‌ন–এ–গীতী–সে–হুয়া
আস্‌মাঁ! ডুবে হুয়ে তারুঁ–কা–মাত্‌ম ক্‌ব তলক?[১৫]

অনুবাদঃ যুগের ক্রোড়ে নতুন সূর্য (লেনিন) উদিত হয়েছে,
হে আকাশ! আর কতদিন অতীতের নক্ষত্ররাজির
অভিশাপ স্মরণ করে দুঃখ করবে?

কবি লেনিনকে নতুন সূর্য এবং পুঁজিবাদকে অস্তমিত তারার সাথে তুলনা করে রাশিয়ার বিপ্লবের উজ্জ্বল দিক জাতির সামনে তুলে ধরেন। তিরি রাশিয়ার বিপ্লবের ব্যাখ্যা করে 'যরব–এ–কলীম'–এর 'বলশেভিক–এ–রুস' কবিতায় বলেনঃ

আল্লাহ্‌র রীতিনীতি আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়। জানি না, পৃথিবীর মনে কী গোপন রহস্য রয়েছে? যারা (রাশিয়া) এতদিন খ্রীষ্টধর্মের রক্ষণাবেক্ষণকে নিজেদের নিস্তারের সহায়ক বলে মনে করতো, তারা এখন যে খ্রিষ্টধর্মকে ভেঙে দেয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছে। এখন মনে হয় নাস্তিক রাশিয়ার প্রতি আল্লাহ্‌র এই ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়েছে যে, তারা যেন গীর্জাসমূহের প্রভুদের (পুঁজিবাদীদের) নস্যাৎ করে দেয়।[১৬]

রাজনীতির ক্ষেত্রে ইকবাল ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদের সমধর্মী। তিনি মিলনধর্মী রাজনীতিকে মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করতেন।

প্যান ইসলামবাদী হওয়া সত্ত্বেও এবং তুর্কীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদ থাকলেও ইকবাল খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। খিলাফতের প্রশ্নটি মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপার হলেও শেষ পর্যন্ত তা রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করেন এবং খিলাফত নেতাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ইকবাল ছিলেন দূরদর্শী চিন্তাবিদ। তিনি বুঝেছিলেন যে, কংগ্রেসের এই সহযোগিতা বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে না।

১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মওলানা মুহম্মদ আলী যখন খিলাফতের প্রশ্নে প্রতিনিধি দল* নিয়ে বিলাত গমন করেন, তখন ইকবাল 'খিলাফতের ভিক্ষা' শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। ঐ কবিতায় তিনি বলেন, ভিক্ষা করে ক্ষমতা লাভ করা যায় না, ক্ষমতা লাভ করা যায় রক্তের বিনিময়ে। তিনি মনে করতেন, খিলাফতের প্রস্তাব নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের নিকট যাওয়া ভিক্ষাই বটে।

---

* প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন এলাহাবাদের Independent পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ হুসাইন ১৮৮৮–১৯৪৯, মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নাদবী (১৮৮৪–১৯৫২) ও জনাব আবুল কাসেম।

নাহিঁ তুঝ্‌-কো-তারীখ-সে-আগাহী কেয়া?
খিলাফত্‌-কী-করনে লাগা-তু-গাদায়ী
খরীদেঁ না হাম্‌ জিসকো আপনে লহু-সে-
মুসলমাঁ-কো-হায় নাঙ্গ উও পাদশায়ী।[১৭]

অনুবাদঃ তুমি কি জানো না ইতিহাস?
তুমি চাইছ খিলাফতের ভিখ্‌!
যে বাদশাহী ক্রীত নয় রক্তের বদলে
তা কি নয় লজ্জাকর জাতির তরে?

একটি বিশ্ব-মুসলিম 'ফেডারেশন' বা 'কনফেডারেশন' গঠন করাই ছিল ইকবালের উদ্দেশ্য। তাই তিনি 'খিযর-এ-রাহ' শীর্ষক কবিতায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রসংঘ বা একটি বিশ্ব মুসলিম ফেডারেশন গঠনের আওয়াজ তোলেন। তিনি বলেন ঃ

ایك هوں مسلم حرم کی پاسبانی کیلئے
نیل کے ساحل سے لیکر تابخاك کاشغر !

এক হোঁ মুসলিম হরম-কী-পাস্‌বানী-কে-লিয়ে
নীল-কে-সাহিল-সে-লেকর তা বা-খাক-এ-কাশগর।[১৮]

অনুবাদঃ কাবা-শরীফের ইজ্জত ও মর্যাদা রক্ষার্থে নীল নদের তীর হতে
কাশগর পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানকে সংঘবদ্ধ হতে হবে।

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং বিশ্বের বেশীর ভাগ মুসলমান মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে বলেই সম্ভবত কবি ইকবাল তাঁর কবিতায় একটি মুসলিম ব্লক গঠনের জন্যে নীল নদের তীর ও কাশগরের (চীন) সীমারেখাউল্লেখকরেছেন।

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোহাটে গুরুতর সাম্প্রদায়িক হাংগামা ঘটে। এতে হিন্দুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী এবং তাদের অনেকে ঘর বাড়ি ছেড়ে রাওয়ালপিন্ডি ও অন্যান্য স্থানে অস্থায়ী আশ্রয় নেয়। এই ঘটনা মহাত্মা গান্ধীকে খুবই মর্মাহত করে। এতে তিনি ২১ দিনের অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধীর এই অনশন ইকবাল অপছন্দ করেন। তিনি মনে করেন যে, এই অনশনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হবে না। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে, তার উপরও কোন প্রভাব প্রতিফলিত হবে না।[১৯]

তিনি বলেনঃ ریشی کے فاقوں سے توتا نه برهمن کا طلسم
عصا نه هو تو کلیمی هے کار بے بنیاد !

ঋষি-কে ফাকোঁ-সে-টুটা না বৃরহমন্‌-কা-তিলিস্‌ম্‌
আসা না হো তো কালীমী হায় কার্‌-এ-বেবুনয়াদ [২০]

অনুবাদঃ
ঋষির অনশন ধর্মঘটে ব্রিটিশ শাসনের যাদুগরি বিঘ্ন হয়নি।
লাঠি না হলে হযরত মুসার নবুওয়াতও নিষ্ফল হতে বাধ্য।

তুর্কীদের প্রতি ইকবালের যে আন্তরিক সহানুভূতি ছিল, সেটা তিনি তাঁর 'তুলু-এ-ইসলাম' কবিতায় চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। মুস্তাফা কামাল পাশা 'সাকারিয়া'র যুদ্ধে ১৯২২ সালে গ্রীসবাসীদের পরাজিত করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, তুর্কীরা এক স্বাধীনচেতা জাতি। তুর্কীদের বিজয় কবিকে হতাশার অন্ধকার থেকে মুক্ত করেছিলো। তিনি ঐ বিজয়ে আশার আলো দেখতে পান এবং বলেনঃ

دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی
وفور آفتاب اُتر اگیا دور گراں خوابی

দলীল-এ-সুব্হ-এ-রওশন হায় সিতারু-কী-তুন্‌কতাবী
উফুর-সে-আফ্‌তাব্ উতরা, গেয়া দাওর-এ-গেঁরাখাবী [২২]
অনুবাদঃ
নক্ষত্ররাজির আলোর ক্ষীণতা এটাই বোঝায় যে, এক্ষুণি উদিত হবে উজ্জ্বল প্রভাত
দিগন্তে উদিত হয়েছে সূর্য অতিক্রান্ত হয়েছে গভীর নিদ্রার যুগ

তুর্কীর পরেই ইরানের শোচনীয় অবস্থা ইকবালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানকার সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর যে চিন্তা-চেতনা ছিল, তা তিনি 'জাবীদ নামায়' প্রকাশ করেন।

১৯২৫ সালে কাজার বংশের আহমদ আলী শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে পারস্যবাসীরা রেযা খানকে তাদের শাহরূপে ঘোষণা করে। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে ইরানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। রেযা খান শৈশবকাল থেকে ধর্মপ্রাণ ও চিন্তাশীল ছিলেন। ইকবাল ভেবেছিলেন, তাঁর ক্ষমতা লাভের ফলে ইরানে মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের অবসান হবে। কিন্তু রেযা খান ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী সমাজ সংস্কার না করে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে এবং ইরানের আদিম অনৈসলামিক তহযীব-তমদ্দুনের অনুসরণে সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। রেযা শাহের এই পাশ্চাত্য নীতি ইকবালকে হতাশ করে। [২৩]

ইরানীরা জন্মভূমিকে মনে করে তাদের প্রভু
তারা বর্ণনা করে না হায়দরের (হযরত আলী রাঃ) কার্যাবলী
তারা লিপিবদ্ধ করে আলেকজাণ্ডারের কৃতিত্ব
তারা আলেকজান্ডারকে মনে করে তাদের দেশবাসী,
অথচ হায়দরকে মনে করে বিদেশী
তারা প্রত্যেক ব্যাপারে অনুসরণ করে চলেছে ইউরোপীয়দের। [২৪]
তিনি আরো বলেনঃ

آه احسان عرب نشناختند
ایا تش افرنگیاں بگداختند

আহ্ এহসান-এ-আরাব না-শেনাখ্‌তান্দ
আয়াতাশ্ আফরংগীয়াঁ বগুদাখ্‌তান্দ
অনুবাদঃ
দুঃখের বিষয়, ইরানীরা ভুলে গেছে আরবদের অবদান

গ্রহণ করেছে তারা ইউরোপীয়দের তহ্যীব তমদ্দুন।

ইকবাল সাধারণ্যে প্রচলিত ও ইউরোপে সমর্থিত গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না। 'বাংগ-এ-দারা' হতে 'আরমুগান-এ-হিজায' পর্যন্ত রচিত কাব্যের নানা জায়গায় তিনি অবাধ গণতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন। যারা সত্যিকারভাবে দেশের রাজনীতি বোঝে, ঠিকভাবে ভোট দিতে পারে, তাদেরকেই তিনি ভোটের অধিকারী বলে মনে করতেন। তিনি 'যরবে কলীমে' 'জামহুরিয়াত' শীর্ষক কবিতায় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে বলেনঃ

جمہوریت اِک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے

জামহুরিয়াত্ এক তর্‌য়ে হুকুমাত হায়, কে জিস্-মেঁ
বান্দা-কো-গিনা করতে হাঁয়, তওলা নাহ্ করতে। ২৬

অনুবাদঃ
গণতন্ত্র এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে
শুধু গণনা করা হয় মানুষের সংখ্যা
সেখানে থাকে না মেধা বিকাশের সুযোগ।

তিনি 'পায়াম-এ-মাশ্‌রিকে' বলেনঃ

گریز از طرز جمہوری غلام پختگار شو

که از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آید

গোয়েয আয তর্‌য-এ-জামহুরী, গোলাম-এ-গোখ্‌তাকারে শও
কো-আয মাগ্‌য-এ-দু-সাদ খাদ খর ফিকর-এ-ইনসানে নামী আয়দ। ২৭

অনুবাদঃ দূরে সরে থাক গণতন্ত্রের পদ্ধতি থেকে,
অনুসরণ কর জ্ঞানী-গুণীর;
দু'শত গাধার মস্তিষ্ক হতে পারে না
একটি মানুষের চিন্তাসম।

ইকবালের অভিমত হল রাজনীতি ও ধর্মনীতি উভয়ই পাশাপাশি চলবে। তাঁর ধারণায়, রাজনীতিকে ধর্মনীতি হতে দূরে সরিয়ে রাখলে তা চেংগিসের রাজত্বে পরিণত হয়। এ ধরনের রাজনীতিতে ক্ষমতালোভী শাসনকর্তাগণ শাসনাধীন মানুষের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করে না। তিনি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

جُدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

'জুদা-হো-দী-সিয়াসাত-সে, তো রাহ্‌জাতী হায় চেংগেযী'

অনুবাদঃ রাজনীতি হতে যদি বিচ্ছিন্ন হয় ধর্মনীতি,
তবে তা হয়ে দাঁড়ায় চেংগিসের রাজনীতি।

ইকবাল ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভৌগোলিক সীমারেখা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে ইকবাল বলেছেনঃ

اپنی ملت پرقیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
اُن کی جمعیت کا ہے ملك ونسب پہ انحصار
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری

আপনী মিল্লাত্ পর কিয়াস কর আক্ওয়াম–এ–মাগরিব–সে–নাকর
খাস হ্যায় তারকীব–মে–কওম–এ–রসূল এ হাশিমী
উন্কী জমিয়ত কা হ্যায় মুলক ওয়া নসর পর ইন্হিসার্
কুওয়াত এ মায্হাব্ সে মসত্হকাম হ্যায় জমীয়ত তেরী। [২৮]

অনুবাদঃ পাশ্চাত্য জাতিগুলোর উপর স্বজাতির অনুমান করো না।
হাশিমী রসূলের জাতির কাঠামো বিশেষ ধরনের।
তাদের (ইউরোপীয়) জাতীয়তাবাদ দেশ ও বংশের উপর ভর করে গড়ে উঠে।
কিন্তু তোমাদের জাতীয়তাবাদ বলীয়ান হয় ধর্ম শক্তিতে।

ইকবাল মনে করেন, পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ছোট ছোট গণ্ডিতে বিভক্ত করে, বিভিন্ন জাতিতে পরিণত করে এবং পরস্পরবিরোধী করে তোলে। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদের ইসলামী মতবাদের ফলে পৃথিবীর শত শত জাতীয়তাবাদ হ্রাস পেয়ে তার সংখ্যা দুইয়ের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। তাতে বিভিন্ন দেশ, ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের মানুষ পারস্পরিক নৈকট্য লাভের অধিকতর সুযোগ পায়।

সরকার গঠনের ব্যাপারে তিনি বিশেষ কোন পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, এমন ধরনের সরকার গঠন করাই সমীচীন হবে, যাতে প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত অধিকার বজায় থাকবে, ব্যক্তির ও সমাজের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতি মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করতে পারবে। তাঁর রাজনীতি সংক্রান্ত সব লেখা অনুধাবন করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি ইসলামী সমাজবাদেরই পক্ষপাতী ছিলেন।

তথ্য নির্দেশ

১। আযীয আহমদ, ইকবাল নয়ী তাশকীল, নযীর প্রিন্টিং প্রেস, করাচী, (তারিখবিহীন) পৃঃ ৯
রঈস আহমদ জাফরী, ইকবাল আওর সিয়াসত–এ–মিল্লী, ইকবাল একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, করাচী (তারিখবিহীন) পৃঃ ১৪
২। ইকবাল, বাংগ–এ–দারা, শেখ গোলাম আলী এণ্ড সন্স, লাহোর, ১৯৬৯, পৃঃ ২৩৭
৩। রঈস আহমদ জাফরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩
৪। ইকবাল, বাংগ–এ–দারা, ভূমিকা থেকে গৃহীত

৫। ঐ ইউসুফ সলিম চিশতী, শারাহঃ বাংগ-এ-দারা, ইশরাত পাবলিশিং হাউস, লাহোর, (তারিখবিহীন) . পৃঃ ৮
৬। আযীয আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮ ৫২
৭। ইকবাল, পূর্বোক্ত পৃঃ ৬২
৮। ঐ, পৃঃ ৬৬
৯। ঐ, পৃঃ ৮২
১০। কে আলীঃ মুসলিম ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃঃ ৯৬
১১। ইকবাল, পায়ামে মাশ্‌রিক, শেখ গোলাম আলী এণ্ড সন্স, লাহোর, ১৯৫৮, পৃঃ ২৩
১২। ইকবাল, যরবে কালীম, লাহোর ১৯৪৯, পৃঃ ১৪৯
১৩। বাংগ-এ-দারা, পৃঃ ২৮৮
১৪। ঐ, পৃঃ ২৯৮
১৫। ঐ, পৃঃ ২৯৯
১৬। যরবে কালীম, পৃঃ ১৪৩
১৭। বাংগ-এ-দারা, পৃঃ ২৮৬
১৮। ঐ, পৃঃ ৩০১
১৯। আবদুল্লাহ মুহাম্মদ, মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ৫২
২০। ইকবাল, বালে জিবরীল, শেখ গোলাম আলী এণ্ড সন্স, লাহোর, পৃঃ ১-২
২১। কে আলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮
ইউসুফ সলিম চিশতী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১৯
২২। ইকবাল, বাংগ-এ-দারা, পৃঃ ৩০৩
২৩। কে আলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬০
২৪। ইকবাল, জাবীদ নামা, পৃঃ ২০৩
২৫। ঐ, পৃঃ ২০৫
২৬। ইকবাল, যরবে কালীম, পৃঃ ১৫০
২৭। পায়ামে মাশ্‌রিক, পৃঃ ১৫৮
২৮। বাংগ-এ-দারা, পৃঃ ২৭৯

ইকবালের দশটি কবিতা

আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত

নারী ও শিক্ষা

ফিরিংগি সভ্যতায় জাতির মৃত্যু যদি হয়,
তার ফলে মৃত্যু হয় মানুষেরও।
যে শিক্ষার প্রভাবে নারী তার নারিত্ব হারায়
মৃত্যু বলে তাকে প্রাজ্ঞ মানুষেরা।

নারী শিক্ষায়তন যদি দীন থেকে দূরে থাকে
শিল্প ও শিক্ষা মৃত্যুর পয়গাম আনে প্রেম ও প্রীতির জন্যে।

চিত্রকর

কল্পনার মৃত্যু কিভাবে ডানা ছড়িয়েছে এখানে
ভারতীয়রা ফিরিংগির অনুগামী, আজমীরাও।
আমার দুঃখ হলো এ যুগের বিহ্যাদ যারা
হারিয়ে বসেছে তারা প্রাচ্যের চিরন্তন আনন্দ।
হে শিল্পী, জানি আমি তোমার সব শিল্প–কুশলতা
প্রাচীন ও নবীন উভয় শিল্পে পারদর্শী তুমি।
প্রকৃতিকে দেখিয়েছো তুমি আর দেখেছোও জানি
প্রকৃতির মুকুরে নিজের খুদীকেও দেখেছো কি?

সংগীত

বাঁশীর শব্দে কোথা হতে এলো সুরার মাদকতা
সুর শিল্পীর হৃদয়ে উৎপত্তি বা বংশদন্ডে?
হৃদয় কি? কোথা হতে আসে তার শক্তি ও মত্ততা?
একটি দৃষ্টি তার কেন উল্টায়
কায়খসৃরুর সিংহাসন?
কেন তার জীবন থেকে সঞ্জীবিত জাতির জীবন?
কেন তার অবস্থার পরিবর্তন ঘন ঘন?
কি কারণে হৃদয়বান মানুষের দৃষ্টিতে
উৎরোয়না সিরিয়া, রোম ও 'রাই'য়ের সাম্রাজ্য?

হৃদয় সংগীত রহস্য বুঝবে যেদিন গায়ক
শিল্পের সব পর্যায় অতিক্রান্ত সেই দিন জেনো।

হালাল সংগীত

গায়কের সুরধ্বনিতে হৃদয় উন্মুক্ত হয় যদিও
কিন্তু জীবিত ও চিরঞ্জীব না হলে
হৃদয়ের উন্মোচনই বা কি!
আকাশের বুকে এখনো প্রচ্ছন্ন সে সুর
যার উত্তাপে গলে যায় নক্ষত্রের দেহ,
যার প্রভাবে দুঃখ–ভীতি শূন্য মানুষের প্রাণ,
আর আয়াযের মর্যাদা হতে জন্ম নেয়
মাহমুদের মর্যাদা,
চন্দ্র ও নক্ষত্রের এ বিস্ময়কর জাহান বিলুপ্ত হোক
থাকো শুধু তুমি ও তোমার 'লা–মওজুদা' ধ্বনি।
খুদীর ফকীহরা যে সংগীতকে হালাল মনে করে
সে সংগীত এখনো প্রতীক্ষা রত
কোনো বাদ্যযন্ত্রের।

মৃদুমন্দ বাতাস ও শিশির

মৃদমন্দ বাতাস
নক্ষত্রের মহাশূন্যের নাগাল পাইনি আমি
লালা ও গোলাপ ফুলের পিরান ছিঁড়েছি একা
স্বদেশভূমি পরিত্যাগে বাধ্য হই ক্ষণে ক্ষণে
অরুচি এনেছে বুলবুলের কণ্ঠ মধু মাখা।
উভয় থেকে তকদির বঞ্চিত করেছে তোমাকে
বাগিচার মৃত্তিকা ভালো অথবা আকাশ কিনারা?

শিশিরবিন্দু
তোমাকে আকর্ষণ করে না বাগিচার তৃণ ও খড়
বাগিচাও একটি আকাশ কিনারার রহস্য ভরা।

আশা

জমানার সাথে নিত্য সংগ্রাম করি আমি
যদিও সিপাই নই অথবা সিপাহসালার,

লভেছি শুধু চিন্তা, স্মরণ, গান ও উম্মাইদা
জানি না এসব কবিত্ব অথবা অন্য কিছু আর।

মুমিনের পেশানীতে যে আলোক বিচ্ছুরিত
সে রশ্মিতে পরিপূর্ণ অস্তিত্বের কণ্ঠ বিবেক
কাফেরী যদিও নয়, কম নয় তবু কিছু
বর্তমান ও বিদ্যমানে মুমিনের অভিষেক।

দুঃখ করো না সামনে এখনো অনেক যুগ
আকাশ বক্ষে নতুন তারার অনেক মুখ।

আশার শিখা

[এক]
সূর্য তার শিখাদের এ পয়গাম দিলো
পৃথিবী আজব দেশ
কখনো সন্ধ্যা সেথা, কখনো প্রভাতের আলো।
বহু যুগ হতে মুক্ত তোমরা মহাশূন্যের বুকে
কালের কঠোরতা প্রত্যহ বাড়ে আত্মসুখে।
আনন্দ নেই বালুর কলামে রশ্মি বিতরণে
আনন্দ নেই প্রভাত বায়ুর মতো গোলাপ পুষ্প প্রদক্ষিণে।
তাহলে আবার প্রবেশ করো আমার বুকের তাজাল্লিতে
তাহলে এবার অংগন ছাড়ো গুল বাগিচার
সবদিক ছাড়ো মরুভূমি আর বিশ্ব জাঁহার।

[দুই]
দিগন্তের চারদিক হতে ওঠে সূর্য শিখা যত
পরিত্যক্ত সূর্যের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবিরত।
চিৎকার ওঠে : পশ্চিমে সম্ভব নয় আলো
ফিরিংগি মেশিনের ধোঁয়ায় সব কিছু দেখো কালো।
প্রাচ্য যদিও হারায়নি দেখার আস্বাদ
তবুও আলসে লাহুতের মতো রয়েছে নির্বাক।
তাহলে তোমার উজ্জ্বল বুকে দাও ঠাঁই পুনর্বার
হে পৃথিবী উজ্জ্বলকারী সূর্য আমাদের ভুলো না আবার।

[তিন]
একটি চঞ্চল কিরণ
দৃষ্টি তার জান্নাতী হুরীর মতন
পারদের মতো গতিশীল চলে অনুক্ষণ।
শুধালো সে আমাকে অনুমতি দাও রশ্মি বিতরণের
যতদিন না প্রাচ্যের প্রতিটি কণিকা
রূপ নেয় প্রকাণ্ড সূর্যের।
পরিত্যাগ করবো না হিন্দের আঁধার আকাশ
যতদিন না ঘুম ভাঙে
নিদ্রা বিভোর মানুষের।
এ দেশই কেন্দ্রভূমি প্রাচ্যের সব আকাঙক্ষার
ইকবালের অশ্রুতে সিক্ত কণিকার এ মৃত্তিকার।

এ মৃত্তিকায় প্রদীপ্ত হলো চন্দ্র ও সপ্তর্ষির চোখ
এ মৃত্তিকার কণা হতে বিচ্ছুরিত মোতির আলোক।
গভীর তত্ত্ব সন্ধানীরা এ মৃত্তিকায় জন্ম নিলো
যাদের জন্য শুকিয়ে গেলো বিপদ সংকুল সাগরগুলো।
যে বীণার ঝংকারে হৃদয়ের উত্তাপ ছিল জমা
মহফিলের সে বিলাপ তার ছিন্ন হলো
ভগ্ন হলো বীণা।
বুত্খানার দ্বারদেশে শায়িত ব্রাহ্মণ
ভাগ্যের দোহাই পেড়ে মুসলিম মসজিদে
কাঁদে অনুক্ষণ।
প্রাচ্যকে তাচ্ছিল্য করো না, ভয় করো না প্রতচ্যিকে
প্রকৃতির ইংগিত হলো ঃ রাত্রিকে প্রভাত করো।

ইবলিসের পরামর্শ সভা

ইবলিস

বস্তুর এই পুরাতন খেলা–নগণ্য ধরা ঃ আর
যারা আর্শের বাসিন্দা, শেষ তাদের আকাঙক্ষার।
'নূন' ও 'কাফ' – এর জাহান[১] এনাম ধরাকে দিলেন যিনি
নিজের সৃষ্টি ধ্বংস সাধনে উদ্যত আজ তিনি।
দেখায়েছি আমি রাজতন্ত্রের স্বপ্ন ফিরিঙ্গীরে।
ছিন্ন করেছি যাদু, গীর্জায়, মসজিদে, মন্দিরে।

বিত্তহীনেরে দিয়েছি সহজে সবক তকদীরের
বিত্তশালীরে দিয়েছি মন্ত্র শোষণ পুঁজিবাদের।
ইবলিসী এই উত্তাপে যার জীবন উচ্ছ্বসিত
সে অগ্নিকণাকে আর ধরায় করবে নির্বাপিত?
আমাদের বারি সিঞ্চনে যার সব শাখা উন্নীত
প্রাচীন সে তরু করবে কে আর পৃথিবীতে ভূপাতিত?

প্রথম পরামর্শদাতা

শক্তিশালী যে ইবলিসী প্রথা সন্দেহ নাই কোনো
গোলামীতে হলো জনসাধারণ আসক্ত আরো শোনো
গোলামী এদের ভাগ্য লিখন সৃষ্টি লগ্ন থেকে,
গোলামী এদের স্বভাব; প্রকৃতি সেই ছবি যায় এঁকে।
হবে না এখানে উন্মেষ আর উচ্চ আকাঙ্ক্ষার
অপমৃত্যু যে রুদ্ধ করেছে সম্ভাবনার দ্বার।
এই সফলতা এনেছে মহান সাধনা শয়তানের
মোল্লা ও সুফী তাই তো গোলাম হলো রাজতন্ত্রের।
প্রাচ্য প্রকৃতি এই অহিফেনে নেশাতুর সহজেই,
কাওয়ালির চেয়ে এলমে কামাল কম নয় কিছুতেই।
তাওয়াফ, হজের চলন ধরায় যদিও দেখতে পাই
মুমিনের খোলা তলোয়ারে আর সেই প্রখরতা নাই।
কার নিরাশার ধ্বনি ওঠে আজ অনন্ত অম্বরে,
'জিহাদ হারাম এ যুগের সব মুসলমানের পরে?'

দ্বিতীয় পরামর্শদাতা

দেখ জনতার শাসনের ধ্বনি পৃথিবীতে যায় ডেকে,
বে–খবর তুমি দুনিয়ার এই নতুন ফেতনা থেকে।

প্রথম পরামর্শদাতা

তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে পৃথিবীর জনপদে দিবা–যামী
রাজতন্ত্রের নবতর রূপ দেখেছি যেখানে আমিঃ

(১) আল্লাহ্'র বাণী 'কুন ফাইয়াকুন'–এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ আল্লাহ যখন কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে চান তখন কেবল 'কুন' অর্থাৎ হয়ে যাও বলে দেন এবং তা সৃষ্টি হয়ে যায়।

যখন আত্মসচেতন হলো আদমের সন্তান

রাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের সজ্জায় অম্লান
আমরা সাজাই কালভেদে শুধু প্রয়োজনে সময়ের;
নাই প্রয়োজন তাই তো এখন রাজা বা বাদশাহের।
হোক পরিষদ জাতীয় অথবা দরবার বাদশার
যেখানে পরের দৌলতে চোখ, হাস্তি সেখানে তার।
পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের রূপ কি দেখনি চেয়ে,
উজ্জ্বল দেহ, চেংগিজী দিল আঁধারে ফেলেছে ছেয়ে।

তৃতীয় পরামর্শদাতা
যদি বাঁচে রাজতন্ত্র তাহলে নাই কিছু চিন্তার,
কিন্তু আছে কি ঐ ইহুদীর কাজে কোন প্রতিকার?
সে এক 'কলীম' তাজামীহীন, 'মসীহ' সে ক্রুশবিহীন,
নবী নয় তবু হস্তে কিতাব দেখেছি তো নিশিদিন।
সেই কাফেরের দৃষ্টিতে জানি সূচী–তীক্ষ্ণতা আছে
হিসাবের দিন এনেছে প্রাচীন সকল জাতির মাঝে।
কোন বিকৃতি আছে বল বাকি প্রকৃতির মহফিলে,
ডেরা তাম্বুর খুঁটি প্রভুদের ভাঙে ভৃত্যেরা মিলে।

চতুর্থ পরামর্শদাতা
রোম পরিষদে দেখ এর প্রতিকার,
সীজারের খাব তার বংশকে দেখাই পুনর্বার।
কে আছে জড়িয়ে তরংগমালা ভূমধ্যসাগরের
'কোথাও সে শাল বৃক্ষ বিশাল, গুঞ্জন সেতারের।'
করি না স্বীকার আমি তার বিজ্ঞতা;
পাশ্চাত্যের রাজনীতি পেল যার হাতে নগ্নতা।

পঞ্চম পরামর্শদাতা
হে প্রভু তোমার আত্মার তাপে পৃথিবীর যৌবন,
যেমন ইচ্ছা করেছ দীর্ণ সকল আচ্ছাদন।
পানি, কাদা, মাটি জীবিত তোমার প্রাণের উষ্ণতায়,
বুদ্ধিদীপ্ত ধরণী তোমার অপরূপ শিক্ষায়।
তোমার চাইতে তাঁর সম্মান নাই মানুষের কাছে
পরওয়ারদিগার নামে যিনি পরিচিত মানুষের মাঝে।
রবের তারীফ, তসবী, তাওয়াফ যাদের মহান কাজ

তোমার সমুখে অবনত শির, তারা শুধু পায় লাজ।
ফিরিঙ্গী যত যাদুকর জাতি তোমার মুরীদ ঠিক,
তবুও তাদের বুদ্ধিতে পীড়া পাই আমি মানসিক।
ইরানের সেই মাজদেক– যার প্রেতাত্মা, অনুচর
দুষ্কৃতকারী ইহুদী লেবাস ছেঁড়ে ধরণীর পর।
মরুর সে কাক হয়েছে শাহীন অথবা সে শাহবাজ,
কত দ্রুতগতি পরিবর্তিত জামানার ছবি আজ।
শুধু এক মুঠো ধূলিকণা যাকে ভেবেছি সর্বদাই
দিক দিগন্তে ছড়িয়ে গেল সে আঁখি মেলে দেখি তাই।
বিপর্যয়ের শংকায় আজ কেঁপে ওঠে এই ধরা,
কাঁপে পর্বত, সমুদ্র আর বনানী নৃত্যপরা।
হে আমার প্রভু! বিপুল বিশ্ব দেখে ধ্বংসের পথ
তামাম জাহান আজ শুধু চায় তোমারি তো ইমামত।

ইবলিস

(নিজের পরামর্শদাতাদের প্রতি লক্ষ্য করে)

চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, আকাশ, যতকিছু দেখ আর
বিচিত্র এই বিশাল বিশ্ব আমারি তো তাবেদার।
প্রাচ্য ও প্রতচ্যি দেখবে নতুন দৃশ্য যে দিবা–যামী,
পাশ্চাত্যের জাতিদের লহু তপ্ত করেছি আমি।
বুদ্ধিদীপ্ত রাজনীতিবিদ, পাদ্রী যে গীর্জার
হবে উন্মাদ শোনে যদি এই আহবান দুর্বার।
যেভাবে কাঁচের কারখানা একে, মূর্খ–নির্বিকার,
ভেঙে দেখে না–কি এ পানপাত্র আরবি সভ্যতার;
ছিন্ন করেছে বস্তাবক্ষ যে আঘাত নির্মম
জানি মাজদেকী যুক্তির সুঁচ সীবনে তা অক্ষম।
পারবে কি ঐ সমাজতন্ত্রী কাঁপাতে বক্ষতল,
চিন্তা ও কাজ দিশাহারা যার ঃ ভাব উচ্ছৃঙ্খল।
সেই উম্মত দেখে শুধু আমি ভয় পাই অনির্বার
যার ভস্মের বক্ষে জীবিত অগ্নি আকাঙ্ক্ষার।
নগণ্য, অতি নগণ্যরূপে দেখি আমি আজ তারে
প্রতি ভোরে জানি অজু করে শুধু তপ্ত অশ্রুধারে।
যার অন্তরে যুগ রহস্য ছায়া ফেলে অবিরাম

যে জানে আগামী দিনের ফেতনা সমাজতন্ত্র নয়, সে তো ইসলাম

॥ দুই ॥
কোরানের নয় ধারক এখন, এই উম্মত জানি
দ্বীনের আকারে পুঁজিবাদ শুধু দেয় তাকে হাতছানি।
জানি গাঢ়তর প্রাচ্যের বুকে সঘন অন্ধ রাত!
নাই সে কাবার
খাদিমের আজ শুভ্রোজ্জ্বল হাত!
এ যুগের দাবি জেনে এ হৃদয় কাঁপে শুধু তৃণবত
কোথাও মুক্ত হয় বুঝি ফের রাসুলের শরীয়ত।
ডর করি আমি নবীর বিধান, ভয় পায় দেখে মন,
পৌরুষ, যাতে হয় মানবীর সতিত্ব রক্ষণ।
সব গোলামীর মরণ বার্তা সে বিধানে আমি পাই,
যেখানে বাদশাহ, প্রভু নাই কোনো পথের ভিখারী নাই,
হয় আবিলতা–মুক্ত সকল সম্পদ সে বিধানে
বিত্তের শুধু আমানতদার করে যা বিত্তবানে।
এর চেয়ে বড় বিপ্লব কোথা কর্মের, চিন্তার,
বাদশার নয় বিশ্ব; – জমিন, জাহান যে আল্লাহর।
রয়েছে গোপন দুনিয়ার চেখে এ বিধান সেই ভালো।
বিশ্বাসহারা মুমিনের প্রাণ অজ্ঞান,– সেই ভালো।
বিরোধে মত্ত থাকুক এখন সে এলমে কালামের,
থাকুক মগ্ন কিতাবুল্লাহর সূক্ষ্ম তর্কে ফের।

॥ তিন ॥
যার তকবীর বিদীর্ণ করে সকল তেলেসমাত,
আলোকিত যেন না হয় কখনো সেই মুমিনের রাত।
মৃত এ ইবনে মরিয়ম না–কি চিরজীবি আছে সেই?
আল্লার গুণ তার সত্তায় যুক্ত আছে কি নেই?
তিনি কি সে ঈসা; আবির্ভাবের পথে যার উন্মাদ;
অথবা ঈসার গুণাবলী নিয়ে হবেন মুজাদ্দিদ?
কালামুল্লার শব্দ ধ্বংসশীল না চিরন্তন?
কোন আকীদার হবে নাজাতের পন্থা উন্মোচন?
কাফী নয় সেকি এ যুগের সব মুসলমানের তরে
এলমে কালাম কী লাত–মানাত ছড়িয়েছে অন্তরে।

রাখো কর্মের ধরা থেকে দূরে সংশয়ে থরো থরো
জীবন যুদ্ধে তার প্রচেষ্টা পর্যুদস্ত করো,
থাকুক পৃথিবী কিয়ামত তক গোলামী তমিস্রাতে,
ছেড়ে দিক ওরা এই গতিশীল ধরণী অন্য হাতে।
ওদের জন্যে ভালো তাসাউফ অথবা কাব্য কথা,
রাখে বিশ্বের জীবন চিত্র গোপনে যে সদা।
ভয় করি আমি জাগরণ সেই মহান উম্মতের
বিশ্ব পর্যালোচনা যে জানে হাকীকত এ দ্বীনের।
প্রভাতী জিকির, মোরাকাবা মাঝে কর সবে মশগুল,
কর খানকাহী মেজাজে[২] ওদের পক্ক, বদ্ধমূল।।

পুত্রের প্রতি বৃদ্ধ বেলুচের উপদেশ

এ প্রান্তর বনানী তোমার
স্নিগ্ধ সমীরণ এর হৃদয়ের তাপ জুড়াবার,
এর চেয়ে নয় খাঁটি
দিল্লী আর বুখারার মাটি।
দুর্বার তরংগের বেগে চলো তুমি চলো হর্দম
উপত্যকা আমাদের এই আর ওই সাহারা দুর্গম।
সংগ্রাম সাধনার মাঝে এ জগতে অনন্য মর্যাদা তব
দেয় সে দরবেশকে শাহানশা'র বিপুল বৈভব।
কামেল মানুষের হাতে দীক্ষা নাও
এ শিল্প নিপুণতার
কাঁচ খণ্ড পরিণত হয় মহামূল্য পরশ পাথরে
সংস্পর্শে তার।
জাতির ভাগ্যলিপি ব্যক্তির হাতের মুঠোয়
প্রত্যেক ব্যক্তি জেনো মিল্লাতের ভাগ্য সিতারা,
সে ডুবুরি বঞ্চিত হলো সমুদ্রে মণিমুক্তো থেকে
কিনারার আনন্দ ত্যাজি
গভীর সমুদ্রের বুকে হয়নি যে আত্মহারা।
ধর্মের বিনিময়ে মিল্লাত মুক্ত যদি হয়
ক্ষতি শুধু সীমাহীন মুমিনের এই ব্যবসায়।
দেহ ও আত্মার যুদ্ধে এ পৃথিবী লিপ্ত হলো ফের

---

২. খানকাহী মেজাজ বলতে এখানে তাসাউফের জেহাদবিরোধী, কর্মবিমুখ ধারার কথা বলা হয়েছে।

এ সভ্যতা মুক্তি দিল হিংস্র পশুদের।
আল্লাহর অগাধ আস্থা মুমিনের হিম্মতে জেনো পাহাড় সমান,
ইউরোপের যন্ত্র নির্ভর সব আশা ইবলিসের সাধ অফুরান।
জাতির ভাগ্যলিপি কি,
এ কথা বলতে পারে কার সাধ্য হেন?
মুমিনের বুদ্ধিমত্তা পেলে
সামান্য ইংগিতেই সব পরিষ্কার জেনো।
কর্মনিষ্ঠ থাকি যেন সদা প্রার্থনা করো এই
ভিখারীকে রাজা দেন যদি ধন
বিস্ময় তাতে নেই।

মাযহাব

আল্লামা ইকবাল

আব্দুল্লাহের মাহমুদ অনূদিত

তোমার জাতিকে করো না ধারণা
পশ্চিমা জাতির উপর
মুহাম্মদ (সঃ)-এর জাতিই গঠনে শ্রেষ্ঠ
সারাবিশ্বময়।

পশ্চিমাদের সংগঠন নির্ভরশীল
দেশ ও গোষ্ঠী নীতি নিয়ে
তোমার সংগঠন শক্তিধর
তোমার মাযহাব দিয়ে।

হয়ে যায় যদি মুষ্টি ছাড়া
নিঃশেষ হবে জেনে রেখ
তোমার প্রিয় সংগঠন।

যদি হয় বিলুপ্ত তোমার জমিয়াত
অচিরেই যাবে ডুবে তোমার ধর্ম-মত।

মহাকবি ইকবাল ও আমরা

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

ইকবালের মূল্যায়ন করার প্রয়াস আমার মত ব্যক্তির পক্ষে এক ধরনের ধৃষ্টতা। সামান্য উর্দু জ্ঞান থাকলেও ফার্সী আমি একেবারেই জানি না। মূল ফার্সী রচনায় প্রবেশাধিকার আমার নেই। অনুবাদে যতটুকু পড়েছি তার ওপর নির্ভর করে ইকবালের মত কোন কবি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা দুঃসাহসের ব্যাপার। তবে পৃথিবীর বহু কবি–সাহিত্যিকের রচনা আমাদের অনুবাদে পাঠ করতে হয় এবং তা নিয়ে তুমুল আলোচনায়ও আমরা প্রবৃত্ত হই। এটাই আমার একমাত্র ভরসা।

তাছাড়া ইকবাল শুধু কবি নন, তিনি দার্শনিকও এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার মাধ্যম হিসেবে তিনি প্রধানত ইংরেজীর উপর নির্ভর করেছেন। ইংরেজী জানা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে তাঁর 'রিকন্সট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম' পাঠ করে কবির চিন্তাধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব।

ইকবাল ভারতীয় মুসলিম সমাজে যেভাবে সাড়া জাগিয়েছিলেন তার তুলনা উর্দুর সাম্প্রতিক ইতিহাসে নেই। মুসলিম সমাজ তাকে গ্রহণ করেছিল তাদের চিন্তাধারার প্রতিভূ হিসেবে। সকলেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর রচনায় মুসলমান সমাজের ক্ষোভ, বেদনা, আশা–আকাঙ্ক্ষা আশ্চর্য উজ্জ্বলতার সঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এবং তারই রাজনৈতিক দর্শনের ফসল পাকিস্তান, সেকথাও কারো অবিদিত নয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইকবালের বাণীর তাৎপর্য সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন বিশ্ব সমাজের যার মধ্যে মানব সভ্যতার সমস্ত মহত্তম আদর্শের প্রতিফলন থাকবে। এই আদর্শের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন ইসলামের সাম্যের বাণীর ভেতর। বিশ্বভ্রাতৃত্বের যে নীতির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত, যার ভেতর বর্ণগত বৈষম্যের অবকাশ নেই এবং যে নীতি আধুনিক জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতাকে সমর্থন করে না, ইকবাল বিশ্বাস করতেন যে, এই আদর্শই মানবতাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। তাঁর দার্শনিক বক্তৃতায় যেমনি তেমনি তাঁর কাব্যে এই আদর্শের ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন মুসলিম দর্শন এবং ইতিহাসের তিনি পর্যালোচনা করেছেন কিন্তু এই পর্যালোচনার মধ্যে সংকীর্ণতা নেই। কবিও সাহিত্যিককে বিশ্বজনীন হতে হলে তার পারিপার্শ্বকে বিস্মৃত হওয়ার প্রয়োজন করে না। বস্তুত যে কবি বা সাহিত্যিক বিশ্বজনীনতার অন্বেষণে পারিপার্শ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন, তাঁর মধ্যে বিশ্বজনীনতারও সঞ্চার হতে দেখা যায় না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দান্তে লিখেছিলেন *ডিভাইন কমেডি।* সাহিত্যে ক্যাথলিক মতবাদের সার্থক প্রতিফলন এরকম দ্বিতীয় একটি নেই। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে দান্তে শুধু ক্যাথলিক সমাজের কবি এর বাইরে তাঁর মধ্যে কিছু নেই, সেটা হবে চরম মূর্খতা। তেমনি ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে স্পেনজার ফ্যাইরি কুইন শীর্ষক মহাকাব্যে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টন্ট গোষ্ঠীর সংঘাত ও বিরোধের চিত্র এঁকেছেন। মিলটন সপ্তদশ শতাব্দীতে প্যারাডাইস লস্টে ও বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টি কাহিনী নিয়ে মহাকাব্যের সৌধ খাড়া করেছেন। কিন্তু সাহিত্যরসিক কোন ব্যক্তিই বলবেন না যে দান্তে, স্পেনজার বা মিলটনের আবেদন তাঁদের গোষ্ঠীর দর্শনের সীমা অতিক্রম করতে পারে না। তারা একাধারে খৃষ্টান ও সর্বজনীন, তাঁরা কেউ ইতালিয়ান বা ইংরেজ কিন্তু যুগপৎ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে তাদের কাব্যে রস গ্রহণ করতে সমর্থ।

কোন সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হল কি-না সেটা তার উপাদানের উপর নির্ভর করে না, সেটা নিরূপিত হয় সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা। মহৎ সাহিত্যের লক্ষণই এই যে, সামান্যের মধ্যে অসামান্যের সন্ধান এই সাহিত্যে থাকে, স্থানিক হয়েও সে সাহিত্য হয় বিশ্বজনীন।

ইকবালের মধ্যে ইসলামের বিশ্বজনীন রূপের কোন অস্পষ্টতা নেই। ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে তিনি বিশ্বসভ্যতার উত্থান-পতনের ব্যাকরণ অনায়াসেই আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তাঁর শিকওয়া ও জওয়ার-এ-শিকওয়া শুধু মুসলিম সমাজের দুর্দশা সম্বন্ধেই বিলাপ নয়, দুস্থ মানবতার ব্যাধিরও বিশ্লেষণ। তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, কোন সমাজ যখন সভ্যতার মূলে যে সমস্ত শাশ্বত সত্য নিহিত সেখান থেকে পদস্খলিত হয়, তখনই তার পতন হয় অনিবার্য।

একটা বিশেষ সমাজকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে যাঁর মহৎ সর্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আরো অনেকে। আমি আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি।

মধ্যযুগে জার্মানীতে ফাউস্ট বা ফসটাস নামক জনৈক ঐতিহাসিক পণ্ডিতকে নিয়ে এক কিংবদন্তীর উদ্ভব হয়। জ্ঞানের পিপাশায় না-কি শয়তানের সঙ্গে এক চুক্তিতে তিনি আবদ্ধ হয়েছিলেন এই শর্তে যে, শয়তান তাকে সব নিষিদ্ধ জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করার অধিকার দেবে। চব্বিশ বছর তিনি অবাধে এই অধিকার ভোগ করবেন। মেয়াদ শেষে শয়তান তার আত্মাকে নরকে নির্বাসিত করবে। ফস্টাস বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে কান না দিয়ে রক্তের অক্ষরে এই চুক্তিতে সই করলেন, স্বর্গ-নরকে ভ্রমণ করলেন, এমন অদ্ভুত ক্ষমতা তার হল যে, বহুযুগ পূর্বে মৃত ব্যক্তিদেরও নিজের সামনে এনে হাজির করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু চব্বিশ বছর এর মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে যখন শয়তানের অনুচরেরা তাকে গ্রেফতার করতে এলো তখন আকূল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তিনি যে যীশুকে অবমাননা করেছিলেন তারই আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু তখন পরিত্রাণের উপায় ছিল না। তাকে যেতে হল নরকে।

এই কাহিনী মানুষের অদম্য অনুসন্ধিৎসার প্রতীকী কাহিনী। যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মানুষ ধর্ম ও নীতির সমস্ত বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে নতুনের সন্ধানে অভিযাত্রা করে, ফাউস্ট তারই প্রতিভূ।

কাহিনীটিকে সাহিত্যে প্রথম ব্যবহার করেন ইংরেজ কবি ও নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লো। মার্লো নিজে ধর্মের পরোয়া করতেন না, ষোড়শ শতাব্দীর নাট্যকারদের মধ্যে শেক্সপিয়রের পরেই তার স্থান, কিন্তু খৃষ্টান ধর্মের আলোকে তিনি তাঁর 'ডক্টর ফসটাস' নাটক রচনা করেন তবে ইংরেজী সাহিত্যের কোন ছাত্রই অভিযোগ করবে না যে, এটা খৃষ্টান ধর্মের অনুশাসনের ব্যাখ্যামাত্র।

দ্বিতীয়বার ঐ একই কাহিনী ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্যতম অবিস্মরণীয় কীর্তির উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এবার জার্মান সাহিত্যে কবি গ্যেটের ফাউস্ট নামক নাটকে গ্যেটে মূল কাহিনীর সঙ্গে আরো অনেক কিছু সংযোজিত করেছেন। কাহিনীটি একদিকে খৃষ্টান ধর্ম অন্যদিকে জার্মান ঐতিহ্যের আলোকে অসাধারণ দীপ্তি লাভ করেছে। কিন্তু এর বিশ্বজনীনতা ক্ষুণ্ন হয়নি।

আধুনিককালে বিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ গ্যেটের দু'শ বছর পর জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান আবার ওই কাহিনীর উপর এক উপন্যাস রচনা করেছেন। এটা আপাতঃদৃষ্টিতে আধুনিক জার্মান জীবনের চিত্র বলে মনে হবে। কিন্তু এর সার্বজনীন প্রতীকতা জার্মান ইতিহাসের মধ্যে সীমিত নয়।

ইংরেজ কবি ব্লেইক ছিলেন প্রতীকী এবং মরমী কবি। তাঁর প্রতীকগুলির উৎস খৃষ্টান ধর্ম কিন্তু এক্ষেত্রেও অ-খৃষ্টান কোন পাঠকের পক্ষে তার মর্ম অনুধাবন সহজ হয়ত হত, কিন্তু অসম্ভব তো নয় মোটেই।

ইকবাল নিজেই স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তাঁর কাব্যের লক্ষ্য ধর্ম প্রচার নয়, একটা আদর্শবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণের লক্ষ্যে ইসলামকে ব্যবহার করা। তার অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ইসলামে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু ব্যক্তি ইকবাল এবং কবি ইকবালের মধ্যে তফাৎ কোথায় সেদিকে নজর না দিলে আমরা তাঁর প্রতি অবিচার করব।

ইকবালের রচনাবলীর মধ্যে তাঁর বাণীর বিশ্বজনীনতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ হয় জাবিদ-নামা উপমহাদেশের সাহিত্যের নজীর নেই। কাব্যটি আমি অবশ্য অনুবাদের উপর নির্ভর করে একথা বলছি। একাধারে উচ্চাঙ্গের কবিতা এবং দর্শন। দান্তের ডিভাইন কমেডির সঙ্গে এর সাদৃশ্যের কথা অনেকেই বলেছেন। ইকবাল দান্তের কাব্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন, কিন্তু মিরাজ নামা বলে চিহ্নিত যে সাহিত্য ইসলামী উত্তরাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তার প্রভাবও এর মধ্যে বিদ্যমান। ইকবাল যা সৃষ্টি করেছেন তা যেমন গতানুগতিক অর্থে মিরাজ নামা নয় তেমনই দান্তের অনুকরণও নয়। ইসলামী দর্শনের ভাষার সঙ্গে যিনি পরিচিত তাঁর পক্ষে হয়ত জাবিদ নামার অর্থ উদ্ধার করা সহজতর, কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই তাঁর স্মরণ হবে যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার চিত্র ইকবাল দিয়েছেন সেটা সমাজবিশেষের অভিজ্ঞতা নয়, মানব সমাজের অভিজ্ঞতা।

গতানুগতিক মিরাজ নামার সঙ্গে ইকবালের তফাৎ এই যে, তিনি প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাঁর এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ কাহিনী স্থাপন করেছেন। এ সব গ্রহ থেকে গ্রহে পরিভ্রমণের বৃত্তান্ত নয়, মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতার, সব দর্শনের নির্যাস। ইশ্‌ক বা ঐশ্বরিক

প্রেম, যার মধ্যে মানুষ খোদার নৈকট্য অনুভব করে, সে-ই হচ্ছে তার সমস্ত অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ ফসল, ইংরেজীতে যাকে ক্লাইম্যাক্স বলা যায়। ক্যাথলিক দান্তে 'গড' রূপের কল্পনা করেছিলেন সহস্র দলবিশিষ্ট পুষ্পের আকারে। একেশ্বরবাদী ইকবালের পক্ষে এরকমের কল্পনায় আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাঁর কল্পনা পাঠককে এমন এক জগতে পৌছে দেয়া যা সত্যই সমস্ত কাল-পাত্রের অতীত।

জাবিদ নামায় কোথাও প্রাদেশিকতার গন্ধ নেই। বিভিন্ন সভ্যতার সমীক্ষা কবি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাকে কোন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, বক্তা কোথাও একেশ্বরবাদিতা থেকে বিচ্যুত হননি। আগাগোড়াই এই বিশ্বাসে অচঞ্চল রয়েছেন যে, দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য সমস্ত সৃষ্টির মূলে এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব যে অনুভব করেনি, সে সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞ রয়ে গেছে। কবির কণ্ঠে কোন জড়তা নেই। তিনি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের কথাই বলুন বা ইউরোপের কথাই বলুন, বলিষ্ঠ ভাষায় নিজের বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে কুণ্ঠিত হননি।

দু'একটি কথায় জাবিদ-নামার পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। চিন্তার ব্যাপকতার দিক থেকে একদিকে এই কাব্য যেমন সূর্যযুগের বিশ্ব সভ্যতার সমীক্ষা তেমনই তারই মধ্যে আবার কবি ইসলামী ইতিহাসের উপর আলোকপাত করতে বিস্মৃত হননি এবং প্রতি ক্ষেত্রেই এই ইতিহাসের উত্থান-পতনের কাহিনীর একটি প্রতীক তাৎপর্যের দিক-নির্দেশ করেছেন। দর্শনও কিরূপে উচ্চাঙ্গের কাব্যে রূপান্তরিত হতে পারে জাবিদ-নামা তারই প্রমাণ। দান্তের কাব্যের কথা উল্লেখ করেছি ইকবালের কাব্য আঙ্গিকের দিক দিয়ে যেমন দান্তের কাব্যের সঙ্গে তুলনীয়, অন্যদিকে এর তুলনা বোধ হয় ল্যাটিন কবি লুক্রিশামের বেরুম নাটুরীর সঙ্গে। লুক্রিশাম স্টোয়িক দর্শনের ব্যাখ্যা ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দান্তের মত উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং কাহিনীর ব্যবহার তেমন এখানে নেই। আধুনিককালে ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রিজেস দ্য কৈস্টাফেট অব বিউটি নামক যে কাব্য রচনা করেন সেটা অনেকাংশে লুক্রিশামের অনুকরণ। ইকবালের এর কোনটার সঙ্গেই পুরোপুরি মিল নেই। কিন্তু পাঠক অনুভব করেন যে, তিনি যে পরিবেশের মধ্যে বাহির হয়ে এলেন সে সমস্ত ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে-এখানেই তাঁর সার্বজনীনতা।

বিখ্যাত এক সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে, যে সাহিত্যিক বর্তমানের মধ্যে অতীতের সমস্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উপস্থিতি সর্বক্ষণ দেহের অস্থি-মজ্জায় অনুভব করেন, তিনিই সত্যিকার অর্থে মৌলিক। মৌলিকতার অর্থ প্রাচীনের বিরুদ্ধে নিরর্থক বিদ্রোহী নয়। প্রাচীনকে আত্মস্থ করে যিনি নতুনের পথে যাত্রা করতে পারেন, তিনিই মৌলিকতার দাবী করার অধিকারী। ইকবাল ঐতিহ্য-সচেতন কবি, অন্যদিকে তার দৃষ্টিভঙ্গি নিবদ্ধ সুদূর প্রসারিত দিগন্তের উপর। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সমাবেশ ঘটেছে তার প্রধান কীর্তির মধ্যে। বিশেষ করে জাবিদ-নামায়।

[ইকবালের ৫১-তম মৃত্যুবার্ষিকীতে সংসদ আয়োজিত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণ।]

মহাকবি আল্লামা ইকবালের ৫৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আল্লামা ইকবাল সংসদ আয়োজিত 'ইকবাল দর্শনে ঐক্য ও সংহতি' শীর্ষক সেমিনারে বিচারপতি আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সম্মানিত সভাপতি, বিশেষ অতিথি, নির্ভীক প্রবন্ধকার, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলীঃ

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি ডঃ আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবালের ৫৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত 'ইকবাল দর্শনে ঐক্য ও সংহতি' শীর্ষক সেমিনারে আমাকে আমন্ত্রণ করায় আমি সংসদ পরিচালনা কমিটির কাছে কৃতজ্ঞ।

সুধীমন্ডলী।

আজ আমরা যে প্রেক্ষাপটে মহাকবি ইকবালের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি, সেই প্রেক্ষাপটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনারা সবাই অবহিত আছেন। আমরা আজ একটি অপ্রতিরোধ্য অচলায়তনে আবদ্ধ। কি আঞ্চলিক, কি আন্তর্জাতিক প্রতিটি বলয়ে মুসলমানদের উপর চলছে নির্যাতনের স্টীম রোলার। ইতিহাসের এ চরম ক্রান্তিলগ্নে আমি মনে করি আল্লামা ইকবাল সংসদ একটি সময়োপযোগী বিষয় আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ তোসারফ আলী তাঁর মূল প্রবন্ধে বিষয়টিকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ মূল প্রবন্ধের ওপর যে সারগর্ভ ও সুন্দর আলোচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন তা সত্যিই উপভোগ্য হয়েছে এবং আমাদের জানার সীমানাকে বর্ধিত করেছে। আজকের এ মহতী সেমিনারে আপনাদের সাথে একত্রিত হতে পেরে আমি আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আপনারা জানেন, ইকবাল বিশ্বের সেই স্বপ্নদ্রষ্টা কবি যাঁর স্বপ্নের ফসল একটি আযাদ রাষ্ট্রের ফল আজ আমরা ভোগ করছি। তিনি ১৯৩৭ সালে ২১ শে জুন কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে লেখা একটা চিঠিতে বাংলার স্বাধীনতা সম্পর্কে বলেছিলেনঃ

আমি যেভাবে প্রস্তাব করেছি, সেভাবে পুনর্গঠিত মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের এক পৃথক যুক্তরাষ্ট্র হলো একমাত্র উপায় যা দ্বারা একটা শান্তিপূর্ণ ভারত গড়ে উঠতে পারে এবং সাথে সাথে অমুসলিম আধিপত্য থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে বাঁচানো যেতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বাংলার মুসলমানদের কেন এক একটি জাতি বলে স্বীকৃতি দেয়া হবে না, যাতে তারা ভারতের এবং ভারতের বাইরের অন্যান্য জাতিসমূহের মতো আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পেতে পারে।

সুধীমণ্ডলী।

আমরা যে মনীষীর জীবনী আলোচনা করছি তিনি নিছক কবি বা দার্শনিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিকও। সবচেয়ে বড় কথা, ইকবাল ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী কবি, ভাবুক ও রাজনীতিক। নর-নারীর ভালবাসা, বসন্তের মলয় সমীরণ, ফুলের সৌন্দর্য, পাখীর গান, প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ-মিলন, জীবনের সুখ-দুঃখ এসবই হচ্ছে কবিতার মামুলী বিষয়বস্তু। সাধারণ কবি বন্ধুরা এসব বিষয় নিয়েই কাব্য চর্চা করেন, কবিতার পংক্তি গাঁথেন, গানের সুর বাঁধেন।

গতানুগতিকতার এ সোজা পথ ছেড়ে যে কবি দার্শনিক সম্পূর্ণ এক নতুন পথে গেছেন তিনি হচ্ছেন মহাকবি আল্লামা ইকবাল। তিনি কাব্যকে করেছেন জাতি গঠনের হাতিয়ার। এ বিশাল ব্যক্তির জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে হাজারো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়। উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় যে সওগাত তিনি দিয়ে গেছেন তা সম্পূর্ণ কুরআন, হাদীস, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের নির্যাস। ইকবালের রচনায় মিশে আছে ইসলাম।

ইকবাল আর্ট ফর আর্টস সেক-এ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্প জীবনের জন্য। আর সে জন্যেই তিনি নির্জীব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে কবিতাকে ব্যবহার করেন। তাঁর পদ্য ও গদ্য যে কোনো রচনার উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম মিল্লাত, মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতি। তিনি ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে অল ইণ্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সের এক সম্বর্ধনার জবাবে বলেন ঃ

আমার কবিতার ব্যাপারে কেউ কেউ ভুল ধারণা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আমাকে প্যান ইসলামিজম আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছেন। আমার প্যান ইসলামিস্ট হবার স্বীকারোক্তি আছে বৈ কি। আমার এ বিশ্বাসও আছে যে, আমাদের জাতি একটি গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায়। মিল্লাতের এবং ইসলামের যে মিশন তা অবশ্যই মানযিলে মাকসুদে পৌঁছতে সক্ষম হবে। তাগুতি শক্তি, শিরক ও বাতিলের চিহ্ন দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর ইসলামী ঝাণ্ডাই পতপত করে উড়বে একদিন।

তিনি বিশ্ব মুসলিমকে এক প্লাটফর্মে একত্রিত করার জন্যে আমৃত্যু কলমের সৈনিক হিসেবে জিহাদ চালিয়ে গেছেন। ইকবালের আশা ছিল যে, ইসলাম একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তিনি সৈয়দ সোলায়মান নদভীকে একটা চিঠিতে লেখেন ঃ

সে সুপ্রসন্ন সময় অতি নিকটে, যখন এ অঞ্চলের মুসলমানগণ শত শত বছরের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি লাভ করবে। নিরন্ধ্র অন্ধকারে জ্বলে উঠবে আশার আলো। পৃথিবীর সব শক্তির উপর চ্যালেঞ্জ করে একটি অনন্য আদর্শ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামী আদর্শই বিজয়ী হবে।

সুধীমন্ডলী।

ঐক্য ও সংহতির ব্যাপারে আজকের সেমিনারে প্রচুর আলোকপাত করা হয়েছে। আমার মতে, বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের উপর যে জুলুম-নির্যাতন চলছে, তার জবাবে মুসলিম মিল্লাতের

ঐক্য ও সংহতি ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আমরা কিসে হীন? ধন-বল, জন-বল কোন দিক থেকে আমরা পিছিয়ে? আল্লাহ মুসলমানদের যে নিয়ামতরাজি দিয়েছেন তার শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য অটুট রাখতে হবে। তবেই কাশ্মীরের মুসলিম ভাই-বোনের উপর চাপিয়ে দেয়া অসম যুদ্ধের অবসান হবে, ফিলিস্তিন থেকে ইহুদীরা হাত গুটিয়ে নেবে যেমনটি রাশিয়া আফগানিস্তান থেকে গুটিয়ে নিয়েছে। বসনিয়া-হারজেগোভিনার মুসলিম নর-নারীদেরকেও ছুরি নিয়ে আর ট্যাংকের মুকাবিলা করতে হবে না।

সুধীমন্ডলী!

বিবিসি, সিএনএন, স্টার টিভি ইত্যাদি পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম নির্যাতনের যে চিত্র উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা থেকেই আঁচ করা যায় পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক। আজ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে যদি অনুরূপ প্রচার মাধ্যম তথা টিভি নেট ওয়ার্ক থাকতো তবে আমার বিশ্বাস আরও করুণ চিত্র আপনাদেরকে দেখতে হতো। তাই আধুনিক মানের রেডিও-টিভিসহ অন্যান্য নিউজ মিডিয়া প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মুসলিম বিশ্বকে উদ্যোগ নিতে হবে। পাশ্চাত্যনির্ভরতা পরিহার করতে হবে। মুসলিম সংগঠনগুলোকে অভ্যন্তরীণ কোন্দল-কলহ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ৪৫টি মুসলিম দেশকে আজ একটি টেবিলে বসতে হবে। আন্তর্জাতিক যে কোনো ইস্যুতে অভিন্ন ভূমিকা রাখতে হবে। তাহলে কেউ আর মসজিদ ভাঙার সাহস করবে না, মুসলিম নর-নারীর পবিত্র রক্ত নিয়ে কেউ আর হোলি খেলার দুঃসাহস দেখাবে না। ইকবালের বিশ্বখ্যাত খুদী দর্শন মুসলমানদের শক্তিমান করতে, ঐক্যবদ্ধ করতে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। আসুন আমরা অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ হবার শপথ নেই।

আজকের এ অনন্য সন্ধ্যা উপহার দেয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। খোদা হাফেজ।

মহাকবি আল্লামা ইকবালের ৫৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে 'আল্লামা ইকবাল সংসদ' আয়োজিত 'ইকবাল দর্শনে ঐক্য ও সংহতি' শীর্ষক সেমিনারে সংসদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মীর কাসেম আলীর স্বাগত ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অথিতি, সম্মানিত বিশেষ অথিতি, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ ও হাজেরীনে মজলিস, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে, তিনি সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে আমাদেরকে আজকের সেমিনার আয়োজন করার তওফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

আল্লামা ইকবাল সংসদ আয়োজিত আজকের এই সেমিনারে আপনাদের জানাই খোশ আমদেদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনারা শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও সেমিনারে উপস্থিত হয়েছেন, এ জন্য আমরা আপনাদের কাছে ঋণী। আপনাদের উপস্থিতি আামদের অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করেছে। আপনারা সব সময় সংসদের আহবানে সাড়া দেয়ার মাধ্যমে সংসদের প্রতি যে অকুণ্ঠ সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন তার জন্য সত্যিই আমরা কৃতজ্ঞ।

হাজেরীনে মজলিস।

ইকবাল একজন খ্যাতিমান কবি, উদারপন্থী সংস্কারক। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের মর্মবাণীর যুগোপযোগী ব্যাখ্যাকার, ইসলামী রেনেসাঁস আন্দোলনের অগ্রসেনানী, হিমালয়ান উপমহাদেশে আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত এ মনীষীর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর সৃষ্ট কর্মের অন্তর্গত বাণী বিশ্ব মানবের হৃদয়ে জন্ম দিয়েছে আশা ও আরজুর। ইকবালের কাব্যের সার্বজনীন আবেদন মানুষের চিরায়ত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকেই শুধু জাগ্রত করেনি, দুনিয়ার পিছিয়ে পড়া মানুষের নির্জীব হৃদয়েও প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। ধূলায় পতিত মানুষের হাত ধরে তিনি যেমন তাকে তুলে এনেছেন নক্ষত্রের কাছাকাছি, তেমনি জড় পৃথিবীর হলুদ-বিবর্ণ চোখে এঁকে দিয়েছেন সামুদ্রিক স্বপ্ন। জীবনের জরাগ্রস্ত কোলাহল এবং পংকিলতার মিছিলের উর্ধ্বে এক মৃত্যুঞ্জয় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন মহাকবি ইকবাল। একজন মহৎ মানবতাবাদী কবি হিসেবে যেমনি রয়েছে তাঁর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, তেমনি ইসলামের অতি আধুনিক ব্যাখ্যাদাতা হিসেবেও তিনি সমান গৌরবের অধিকারী। হিমালয়ান উপমহাদেশের মুসলমানদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তামুদ্দুনিক নিরাপত্তাহীনতা, সর্বোপরি জাতির জিল্লত ও অচলায়তনের ক্রান্তিলগ্নেই তাঁর জন্ম। পরাধীনতার শিকলে আটকেপড়া জাতির বুকফাটা ক্রন্দন তাঁকে বিচলিত করেছিল। তিনি কাব্যের অমোঘ চাবুক নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন হতাশাপীড়িত, ব্যথিত মানুষের জীবনে নতুন অর্থ ও তাৎপর্য আরোপ করতে। বছরের পর বছর ধরে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ জাতি তাঁর আহবানে সম্বিৎ ফিরে পায়। তুরখাম থেকে আরাকান পর্যন্ত তিনি

অভিনন্দিত হলেন গণমানুষের কবি হিসেবে। জনতার ভাষায় তিনি কবিতা লিখতেন, জনতার ভাবনা ও বেদনাকে তিনি স্থান দিতেন তাঁর কবিতায়, আর সেই জনতাকে মুক্তির মঞ্জিলে পৌঁছানোর নিরলস ও অব্যর্থ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন তিনি আমৃত্যু। কুরআনুল কারীমের বিশাল প্রাঙ্গণ, হাদীস শরীফ এবং ইসলামের ইতিহাস–ঐতিহ্য ছিল ইকবাল কাব্যের সারবান পটভূমি। ইসলামকে তিনি একটি গতিহীন ধর্মের কতকগুলো সূত্রসর্বস্ব ব্যবস্থাপত্র মনে করতেন না। তাঁর কাছে ইসলাম ছিলো এক প্রাণ–প্রাচুর্যপূর্ণ বলিষ্ঠ জীবনের প্রতীক। নিবিষ্ট মনে তিনি বারবার কুরআন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাঁর এই প্রত্যয় জন্মেছিল, কুরআনী আদর্শের সুষ্ঠু অনুসরণ ও অনুশীলনই বিপর্যস্ত মুসলিম প্রাণে নয়া জিন্দেগীর হিল্লোল সৃষ্টি করতে পারে।

সুধীমন্ডলী!

ইকবালের কালামকে চিন্তাধারা ও বিষয়বস্তুর নিরিখে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন – ১। কবিত্ব, ২। দর্শন ও ৩। সংস্কার আন্দোলনের গতিচাঞ্চল্য। অর্থাৎ ইকবালের অনুভূতি ছিলো কাব্যধর্মী, চিন্তাধারা হলো দার্শনিক, আর মতবাদ হলো সম্পূর্ণ ইসলামী আদর্শভিত্তিক। ইকবাল কাব্যে ইসলামী রূপ ও রস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা মানবীয় উপাদানে পরিপূর্ণ। তাই ইকবাল গোটা বিশ্বের সমঝদারদের কবি, মিল্লাতের চিন্তানায়ক। ইকবাল এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব, কেবল মুসলিম জাহানের জন্যেই নয়, গোটা মানবতার জন্যে তিনি সম্মানিত এক মহান সৃষ্টি।

হাজেরীনে মজলিস!

বিশ্বব্যাপী ইকবাল চর্চা অব্যাহত রয়েছে। বাংলা, উর্দু, ফার্সী, আরবী, হিন্দী, ইংরাজী, জার্মান, ফ্রেন্স বিভিন্ন ভাষায় ইকবাল অনূদিত হয়েছে। ইকবাল একাডেমী ও ইকবাল সোসাইটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইকবাল চর্চা করে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও ইকবাল চর্চার সোনালী ঐতিহ্য ছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ইকবাল চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ইকবাল একাডেমীর বিলুপ্তি ঘটে। ইকবাল–এর স্মৃতি মুছে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। আলহামদু লিল্লাহ, ১৯৮৬ সালে আবার ইকবাল চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়া হয় নতুনভাবে। আল্লামা ইকবাল লাইব্রেরীতে বিভিন্ন ভাষার বই জমা করা হচ্ছে। আত্মপ্রকাশ করেছে 'আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা'। বিচিত্র যুগ–জিজ্ঞাসার আলোকে সংসদ এ পর্যন্ত 'আল্লামা ইকবাল' শিরোনামে ৪টি সিরিজ সংকলন প্রকাশ করেছে। এ যাবৎ সংসদ প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠা প্রকাশনা জাতির সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। ইকবালের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করে আসছে। ১৯৯১ সালে স্পেনের কর্ডোভায় আন্তর্জাতিক ইকবাল মহাসম্মেলনে সংসদ আমন্ত্রিত হয়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে দেশের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান বয়ে আনে। দেশের কবি, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের সংসদ একত্রিত করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হাজেরীনে মজলিস!

দেশের বিত্তশালী উদার ব্যক্তিদের অনুদান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুদান দিয়েই সংসদ চলছে। সংসদের অভিযাত্রা স্বল্প পরিসরে। সাধারণ মানুষের অনুদান ও বিজ্ঞাপনের অপ্রতুলতার দরুন সংসদের পত্রিকা ত্রৈমাসিক হিসাবে নিয়মিত বের করা সম্ভব হচ্ছে না। ইকবাল রচনা

সমগ্র প্রকাশ করা যাচ্ছে না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা সংসদ পায়নি। আমরা সরকারের প্রতি প্রতিষ্ঠানকে সার্বিক সহযোগিতা করার উদাত্ত আহবান জানাই। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী গত বছর ইকবালের কবর জিয়ারত করে এসেছেন। তিনি ইকবাল চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে সফল করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলে আমরা আশাবাদী। আমরা সবাইকে ইকবাল চর্চায় এগিয়ে আসার জন্য উদাত্তআহবানজানাচ্ছি।

সুধীমণ্ডলী!

এ অনুষ্ঠানে সদয় উপস্থিতির জন্য সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অতিথিবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাদের এ সেমিনারে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের ক্ষুদ্র আয়োজনকে সার্থক করে তুলবে– এ আশা ও বিশ্বাস নিয়ে আপনাদের সবাইকে আবার খোশ আমদেদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ওয়াখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

Speec of His Excellency Anwar Kemal

High Commissioner for Islamic Republic of Pakistan

Mr. Justice Abdul Wadood Chowdhury
Honourable Chief Guest,
Janab Dewan Mohammad Azraf,
President,
Allama Iqbal Society of Bangladesh,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen

I am indeed grateful to the President and Office bearers of the Allama Iqbal Society of Bangladesh for affording me this opportunity to be with this august gathering on the auspicious occasion of the death anniversary of the great poet-philosopher and visionary Dr. Allama Mohammad Iqbal.

I realize that I am amongst a galaxy of ardent admirers and eminent scholars of Iqbal who have expressed themselves so eloquently on the multi-dimensional personality and genius of Iqbal-leaving little for me to add.

We all agree that as a profound thinker, Dr. Allama Mohammad Iqbal left a deep and lasting impression not only in South Asia but also on the entire Muslim world as well as on the West. Iqbal was a messenger of renaissance and the greatest of the luminaries who set in motion the revolutionary spirit of the 20th century and stirred the Muslims from out of their deep slumber. As a poet, thinker and philosopher, he urged the Muslims to shake off lethargy and devote themselves to constant struggle and action. Dr. Iqbal called for inculcation of self-discipline, self-respect and self-reliance through his concept of *Khudi* and wanted its expression through righteous actions.

Allama Iqbal was among the few leaders of South Asia who studied and analysed the Western civilization closely. He did not reject every thing but at the same time he was neither overawed by its glitter nor

unduly impressed by its materialistic philosophy. He predicted that the Asian phoenix would rise again.

Through his vision Iqbal perceived a 'distinct cultaral unity in India' which formed the basis of the demands of a separate homeland for the Muslims. Iqbal earnestly believed that Muslims all over the world must unite to achieve their lost glory.

ایك هوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
نیل کے ساحل سے لیکر تابخاك کاشغر

(From the banks of the Nile to the land of Kashgher, let the Muslims unite and be the protectors of the Haram in Mekkah)'.

The re-emergence of the Muslim states in Central Asia as independent and sovereign entities and the growing awareness among Muslims in other parts of the world is only a faint glimpse of Iqbal's global vision of a vibrant commonwealth of Muslim nations. Iqbal's cardinal message to the world is that Islam did and will yet lead the world from darkness into light.

Ladies and Gentlemen,

With these few words, which I realize could not have done justice to Iqbal, the poet, philosopher, guide, seer and reformer. I thank the organisers once again for arranging this function as a befitting tribute to the most outstanding Muslim personality of South Asia.

I thank you!

[An address delivered as Chief guest at a Seminar on Allama Iqbal held under the auspices of Allama Iqbal Society on 21 April '93]

Renaissance Movement of the Muslim World and Allama Iqbal

Advocate Mujibur Rahman

Through Al-Quran which prescribes a complete, divine, perfect and integrated system of life based on the concept of sovereignty of God, the Muslim Ummah, rose to the pinnacle of glory soon after the 7th century A. D.

Though born at Mecca Islam was developed at Medina. The Muslims annexed the provinces of Syria and Egypt from the Byzantine empire and Iraq from the Persian empire. They ruled half of the known world within one hundred years of the prophet's death achieving astounding material progress with spiritual and moral developments. The contribution of Islam to world civilization has been incomparable. It is an undisputed fact of history that the Muslim world played a vital role in the inspiration and ultimate success of the European renaissance movement from the 14th to the 16th centuries. The debt of Europe to Islam for its contribution to the former is admitted. M. N. Roy in his *Historical Role of Islam* says that learning from the Muslims, Europe became the leader of modern civilization. Even today her best sons are not ashamed of the past indebtedness. Thomas Carlyle, H.G. Wells, H.Lammens, J. Chacht, Von Kremer, Bebel, George Bernard Shaw, Pilip K.Hitti, William Draper, Edward Gibbon, H.A.R. Gibb, Anrold Toynbee, James Henry Breasted, Charis Waddy, Keith Callard, W.C. Smith, Michael H.Hart, Maurice Bucailee and other western scholars and historians, unambiguously anmitted the specialities of Islam and its contribution to world civilization particularly to Europe.

But due to dislodgement from the teachings of Al-Quran and its spirit, the Muslim Ummah became disintegrated and degraded. Decadence started at Damascus. Baghdad succumbed to Halagu Khan's

invasion. Though Damascus, Baghdad, Cordova, Delhi and Istanbul fell, it did not mean the fall of Islam, because these reverses were due to deviation from the teachings of Al-Quran; the Muslim Ummah, in course of time, lost even the consciousness that they had a glorious past and a great heritage. To salvage the Muslim Ummah from the debacle and to restore the pristine purity of Islam, some mujaddids, philosophers, scholars, intellectuals and statesmen came forward : Umar Ibn Abdul Aziz (Umar-i-Thani), the 8th Umayyid caliph (717-720 A. D.) was the first mujaddid. The leaders of the renaissance movement throughout the Muslim world were unanimous in calling the Muslim Ummah back to the teachings of Al-Quran, deviation from which, had caused their debacle. Allama Iqbal, apart from being, the loudest muazzin of the 20th century to urge the ummah to go back to the teachings of Al-Quran, had recourse to a revolutionary programme, as required by the teachings of Al-Quran, to inspire each Muslim to be a Mumeen as an ideal and perfect human personality-insan-e-kamil. According to the scheme of Islam, man is the vicegerent of god on this earth to represent his quality of rubbiyat and he (man) is the centre of the universe and everything is created for his purpose and use. So Iqbal emphasised the development of an individual and his ego to properly discharge his onerous responsibility. He stirred the slumbering Muslims to shake off their lethargy and to rouse themselves in all spheres of life. He castigated sufism that took a negative view of life and for encouraging renunciation of this worldly life by taking refuge in shrines and monastaries under the influence of the un-Islamic ideas of sufism (Islamic mysticism) and pantheism (unity of being) i. e., (wahadat-ul-wajud).

As the greatest philosopher-poet of Islam, Iqbal had the prophetic vision and the statesman-like leadership to guide the Muslim world. His value system was identified with rationality, universalism, service to humanity and dynamism which are of the essence of Islam.

In the context of 20th century world affairs he could foresee the danger of the western materialistic civilization bereft of spirituality. He stood face to face with the west and cautioned her with regard to capitalism, communism, the concept of nationalism based on

geography and the western (secular) democracy which instead of doing good to mankind and solving their problems would inevitably bring disaster and destruction on them. He cautioned that the west would commit suicide by her own dagger. Two world wars, the fall of communism and the failure of man-made *isms* justify the Allama's forecasts.

Though other leaders of the Islamic revivalist movement preceding Iqbal made laudable contributions to the renaissance movement, he was the most extraordinary philosopher- poet cum statesman, the revolutionary interpreter and the loudest voice of Islam during the 20th century. He excelled the previous thinkers and outshone them.

In him are combined the essence of the urge of Umar ibn Abdul Aziz and Ibn Taymiyya for restoration of the pristine purity of Islam, the essence of scholasticism and the philosophy of al-Ghazali (excluding Ghazali's compromise with sufism that encouraged inaction), the urge of Rumi to bring about dynamism in Islam by creating an attitude of hope and to kindle the fire of enthusiasm for life, the quality of the study of philosophy of history as propounded by ibn Khaldun the father of sociology, the uncompromising stand of Shaykh Ahmad Sirhindi (Mujaddid-i-alf-e-Thani) against all pernicious innovations, the thought of Shah Waliullah, the last and greatest theologian of Islam to go back to Al-Quran and to restart ijtihad without breaking with the past, the pan-Islamic thought of Jamal-al-din al-Afghani and the quality of statesmanship in Sir Syed Ahmed and Quaid-e-Azam M. A. Jinnah which led to the creation of an Islamic state to solve the social, political and economc problems of the Muslim world in the light of the Quran and Sunnah.

Iqbal's versatile genius made him an extraordinary guide and philosopher not only for the present generation but also for the coming ones. He was more concerned with the future of the Muslim Ummah : He said : Of 'today's voice I have no need, Voice of poet of tomorrow I am indeed. Quaid-e-Azam Jinnah the most outstanding statesman of the century for the Muslim world, and the founder of Pakistan in his condolence message on the demise of Iqbal said of him "Iqbal was my friend, philosopher and guide". According to

Garami Iqbal did the work of a prophet, though one may not call him prophet.

RENAISSANCE

The terms *Revival, Regeneration and Renaissance* are synonymous. They signify regeneration and restoration of fundamental thought and activities on basic values of pristine purity.

To make the Renaissance Movement a success, contributions by different categories of talents are indispensable. For the Renaissance of the Muslim World contributions by Mujaddids were a basic necessity but they were not adequate to lead the movement to a complete success. Contributions by philosophers to furnish the rational base of the movement, scholars, poets and litterateurs to inspire the mass of people and statesmen to guide and offer leadership to them are equally necessary.

Beginning from Ramkrishna (1836-1886), including Vivekananda, his disciple, Bankim Chandra, Bal Gangadhar Tilak, Rabindranath Tagore, M. K. Gandhi and others, the religious leaders, poets, writers and politicians contributed to the Hindu revivalist movement under British patronage in the 18th to the 20th centuries till British withdrawal from the Indian Sub-continent. The Hindu revivalist movement took its inspiration from Sivaji- (1627-1680) who regarded himself as appointed to free the Hindus from the Mohammedan Yoke. According to the Historians, Sivaji lured Afzal Khan, the Vijapur general, in (1659) into a personal conference and killed him with his own hand, while his men attacked and routed the Bijapur army. In 1666 he visited the Moghal emperor Aurangzeb at Delhi, where, on his expressing dissatisfaction at not being treated with sufficient dignity, he was placed under arrest. He affected his escape in a sweetmeat basket. He always preferred to attain his ends by fraud rather than by force. He is the national hero of the Marathas. Tilak once President of All India Congress and Leader of Maharastraw declared the highest regard for Sivaji and arranged Sivaji Utshav in 1904 and Ganapati Puja and he re-established Gorakshmini Sabhas in 1893 through which Tilak incited the Hindu community against the Muslims. He declared a Dharma Rajjya for Bharat which should

necessarily be a Hindu Dharma Rajjya. While the British Government put him in Jail, Rabindranath Tagore assumed the leadership of a movement to collect funds to conduct the case for the release of Tilak. Rabindranath wrote his poem 'Sivaji Utshav' in which he expressed his vow for the said Dharma Rajjya in Bharat and gave a clarion call so that the Bengalies also take the slogan 'Joytu Sivaji'.

However, there is a basic and palpable difference between the Islamic Renaissance movement and the European Renaissance movement (14th to 16th centuries) and the Hindu revivalist movement. Both Christianity and Hinduism as religions do not prescribe any complete system of life to solve the social, political and economic problems of their respective followers. The more they cling to their religions their societies become more problematic and backward. So having come out of the fold of their religions they are to go for new programmes for progress and regeneration. Europe created an atmosphere against the Papacy and Church and led the Renaissance movement in favour of Secularism which ultimately led to Reformatory movement of the 16th century.

But Islam as a complete, perfect, integrated and divine system of life offers basic principles for the solution of each problem of life: Individual and collective, political and economic, social, national and international. It was practised and proved during the early days of Islam on the establishment of the Islamic State at Medina. The deviation from the path of Islam, in course of time, concomitantly deralied the Muslim Ummah from the path of progress.

Wilfred Cantwell Smith in *Modern Islam in India* says that during the Middle ages, religion flourished in both communities, yet that was when Islamic civilization flourished, while Christendom showed no vitality. As long as the Christian religion reigned supreme Europe was culturally backward; it is only as Europe gradually shed her religion, or relegated it to less and less decisive aspects of life, that she has forged ahead so spectacularly. The Islamic World, on the other hand, has retrogressed since gradually forsaking the 'true tenet's of Islam.

The success of the Renaissance movement (Tajdid) of the Muslim World is inevitable since Islam stands for the solution of all human

problems and ensures human dignity, equality and fraternity, it also ensures justice, fairplay, peace and tranquility. There is no alternative to Islam to strike a balance between Materialism and Spirituality.

* Let us now examine the Renaissance movement of the Muslim world chronologically and assess the contributions by Muzaddids, scholars and Slatesmen:

UMAR IBN ABDUL AZIZ (Umar-i-Thani) (717-720 A. D. Khilafat)

The Umayya Khilafat was started at Damascus, with Muawiya. It was since then that deviations from the teachings of Al-Quran and Sunnah began. The hereditary system, as against the democratic method of election of a Caliph, was introduced by him. His son Yazid was placed in power by a coercive and undemocratic process. Monarchy was established in place of Khilafat. The Baitul Mal came to be considered as the personal property of the Caliph. Justice and fairplay were given the go-by. arbitrary and anti-shariah activities made the life of the Muslim Ummah miserable. The Caliph totally forgot the directives of Al-Quran that "if the Muslims were established in the land, they would establish regular prayer and give charity (zakat), enjoin the right and forbid wrong." Most of the rulers, against the directives of Shariah acted for personal aggrandisement, acquisition of wealth and power by hook or by crook. Umar Ibn Abdul Aziz came on the scene against this background as the first Mujaddid-cum-Caliph. On his nomination before his election to enlist public allegiance he declared that the people were not bound to elect him, rather they were absolutely free to choose any one they liked as their Caliph, but the people elected him. On his election he addressed the people in the following terms: "O People : after the Holy Quran no other Book shall come from Allah, and after your Prophet no other Prophet shall come. I am not a law maker. I am only an executor of the law. I will bring about no innovation. I will only follow. I am not better than any individual from among you. The only difference is that I carry a greater burden (of Khilafat) on my shoulders. Remember : that no good can come out by disobeying Allah; "O People; Obedience must be given to him who obeys Allah. Any one who disobeys Him, must not be obeyed. Upto the time I obey Allah, obey me; and if I disobey

Him, then you must not obey me." He further stated, "the Caliph is not a law giver; his function is not legislative. He is there to carry out the 'Law' and to execute it, that is, in Islam, there is the supremacy of Law, and not of men and this supremacy of law is the supremacy of the Quran which represents the sovereignty of Allah and government is only an agent to fulfil the purposes of law. Lastly, the Caliph is responsible both to Allah and the people. Absolute obedience is to be given only to the commands of Allah. In the case of others, obediencee is conditional. Hence if the Caliph or ruler goes against the Commands of Allah, he can be disobeyed and removed by the Community."

The role of Umar Ibn Abdul Aziz proved to be a great surprise of history. His father was the governor of Egypt and his mother a great grand daughter of Umar Bin Khattab, the second Caliph of Islam. Though by inheritance he became a beneficiary to a fabulous income from property bestowed by Royal decrees, he gave back those properties to Bait-ul-Mal which reduced his income to the average of an ordinary citizen. He restored the Pristine purity of Islam. The teachings of Al-Quran were enforced upto the minutest detail. The Bait-ul-Mal was restored to its original form as a public institution. He did not like to accept emoluments for his services as a Caliph. The properties both immovable and movable, usurped by the previous caliphs by royal decree, were restored to the previous rightful owners even including the non-Muslims. He established real Islamic rule. Non-Muslim citizens in appreciation of the Quranic Rule and its humane and moral standard, accepted Islam in large numbers. The revenue Officer reported that due to conversion, income from the Jizya Head decreased to a great extent, the Caliph replied that the Prophet did not come as a collector of revenue.

He restored the independence of the judiciary and freed it from the influence of the executives, and thereby established the rule of law, consequently fairplay and justice. He created an atmosphere in which the true spirit of the Shariah could be practised. He stopped innovations and checked un-Islamic concepts.

Four Imams

The education programme pursued by Umar Ibn Abdul Aziz, created an intellectual movement based on the science of Al-Quran, Hadith and Fiqh, which facilitated the eventual advent of great Fuqaha; Abu Hanifa, Malik, Shafi'ee and Ahmed Bin Hanbal who in their turn served the cause of the regeneration of the Muslim World against all odds.

Noman Bin Sabet Imam Abu Hanifa (699-767 A D)

The founder of the Hanafi School of Jurisprudence stood like a rock to serve the cause of Islam un-influenced by any of the rulers who wanted very often to appoint him a Qazi to interpret the Shariah to suit their purpose. He refused to accept the same offers from both Umayyad Governor Yazid Ibn Umar Ibn Hubaira at Kufa and Abbasid Caliph Al-Mansur at Baghdad. He was subjected to ruthless physical torture by both and died in prison. Contributions by him, and his disciples Muhammad, Abu Yusuf and others saved the purity of Islam from contamination by selfish and misguided rulers.

Imam Malek Ibn Anas (711-795 A D)

The founder of the Maliki School of jurisprudence was the author of great Muatta. He was tortured and whipped with 70 lashes by Al-Mansur.

Imam Ahmad Ibn Hanbal (780-857 A D)

Ahmed Ibn Hanbal, the founder of the Hanbali School of Jurisprudence and the author of an Encyclopaedic work Musnad was repeatedly arrested and tortured by Abbasid Caliphs. He stood against the Mutazala design of introducing perversion in Islam that Al-Quran is created. Upon being arrested by order of Al-Mansur, news reached him that Al-Mansur had died while he was being taken in chains to him. Mansur's successors : Mutasim Billah Bin Harunur Rashid and Wathik Billah bin Mutasim Billah tortured him in an inhuman manner, but the Imam risked his life for maintaining the purity of the Shariah.

Imam Ghazali (1058-1111 A D)

After the demise of Umar Ibn Abdul Aziz the succeeding six Umayyad Caliphs reverted to ignorance and anti- Quranic Rule. Imam Ghazali was born in 1058 at Tus during the Caliphate of Qayum Be Amr Allah Bin Qader Billah, the 26th Abbaside Caliph. In the meantime the Mutazilites, through the patronage of the previous Caliphs particularly by Al-Mamun and others had introduced Greek Philosophy which adversely affected the religious belief of the Muslims due to Sophistry and unnecessary Scholastic disputes. Almost all sections of people again managed to forget that Al-Quran and the Sunnah were the real guide for them. Ijtihad was abandoned; as a result the Muslim World lost its mobility and dynamism.

Over and above this, the blind march of Sufism (Islamic Mysticism) and the Crusades initiated by the Christian World (begun in 1095 during his life time) created great confusion in the World of Islam. Ghazali as an exceptionally talented scholar earned the reputation of Hujjatul Islam" (The Proof of Islam) as the greatest theologian of his time. He was appointed by Nizam-ul-Mulk as Professor of Nizamia Madrassah in 1091. After a physical crisis and a psychological upset, he left Baghdad in 1095, moved from place to place for ten long years in seclusion while he was suffering from Scepticism. Ultimately he made a partial compromise between Orthodox Scholasticism and Sufism. He came back and played a remarkable role in opposing Mutazilites. Unlike the Mutazilites he held the view that apart from reason, revelation and intuition were the two other sources of knowledge. Out of his numerous works 'Ihya' Ulum-al-Din (The Revival of Religious Sciences) has been the most outstanding one. He abandoned Taqlid (blind following of previous authorities) at his early age. Western Orientalists recognise him a personality of towering importance. Ibn-Taimiyya bitterly criticised some of his views, particularly his leaning towards Sufism. Allama Iqbal in his *Reconstruction of Religious Thought in Islam* observed: Ghazali based religion on philosophical Scepticism as a rather unsafe basis for religion and not wholly justified by the spirit of al-Quran.[1] According to S. Abul A-La Maududi : "Judged from the intellectual

view-point, the work of revival carried out by Imam Ghazali suffered in general from three main defects which may be ascribed to :

(a) his weakness in the science of Hadith,

(b) the predominant influence of the rationalist sciences on his mind, and

(c) his excessive inclination towards *tasawwuf*.

The man who, avoiding all these pitfalls, carried forward the real work of Imam Ghazali, viz. reviving the moral and intellectual spirit of Islam and purging its system of all innovations and impurities, was Imam Ibn-i-Taimiyyah)".[2]

Muhammad Jalal-ud-Din Rumi (1207-1273 A D)

The thirteenth century A D (seventh century A H) was a critical period for the World of Islam. The deviation of the Muslim Ummah from the teachings of Al-Quran became wider. Scholasticism ate into the vitals of Muslim society to make it vulnerable to the onslaught of the enemies of Islam. The Crusades initiated by the Christian World took a serious turn during the thirteenth century. Over and above this, Mongol invasions against Muslim regions and the fall of Baghdad in 1258 with its ruthless destruction brought frightful consequences for the World of Islam. Jalal-ud-Din Rumi was born at about this point of history. He is the greatest mystic poet of Islam. His great work *'Mathnawi-i-Manwi'* in six volumes made him immortal. It is considered by many as the Quran in the Persian Language. R. A. Nicholson translated and edited the *Mathnawi*. In the foreword by A. J. Arberry to *'The Life and Work of Muhammad Jalal-ud-Din Rumi by Afzal Iqbal,* he (Arberry) quotes Nicholson : "the greatest mystical poet of any age, 'seem to me no more than just. Where else shall we find such a panorama of universal existence unrolling itself through Time into Eternity?" He also quoted Professor E. G. Browne : "Without doubt the most eminent Sufi Poet whom Persia has produced, while his mystical *Mathnawi* deserved to rank amongst the great poems of all time.'

Sufis, having been derailed from the path of Al-Quran used to encourage renunciation of this world and recommend monasticism.

The Muslim Ummah, as a result, turned inactive and averse to worldly affairs. They (Sufis) became mainly responsible for the decadence of the Muslim world. Rumi unlike other mystics did not budge from the basic teachings of Al-Quran. He encouraged Jehad to establish truth as against falsehood. He emphasised the implementation of the Quranic teachings to develop self (khudi) that is, creation of personality (ego), free thinking and acquisition of power to fulfil the sacred duty alloted to the Muslim Ummah by the Creator. Iqbal was very much influenced by the philosophical views of Rumi. He said that Rumi turned dust into Elixir in his life . . . . . . Iqbal held, that "the World of today needs a Rumi to create an attitude of hope and to kindle the fire of enthusiasm for life.'[3]

Ibn-i-Taimiyya (1263-1328 A D)

Ibn-I-Taimiyya was the first intellectual in the Muslim world who boldly diagnosed the root cause of decadence of the Muslim Ummah was its deviation from the teachings of Holy Quran, so he called upon them to go back to Al-Quran. He was a dauntless Mujahid determined to bring back the Pristine purity of Islam. So his movement was often called the Salafi movement in the world of Islam. He used to criticize bitterly Shirk, Pantheism, Sufism, and other Innovations and Superstitious beliefs. He took an uncompromising stand for Shariah and he had to suffer imprisonment repeatedly and die in prison. Dr. Serajul Haque (Professor Emeritus D U) did his Ph. D. on '*Imam Ibn Taimiyya and his Projects of Reform.*' He observes : He was a fearless fighter but, unfortunately, had no power of reconciliation. The words *bid'a, innovation, shirk, polytheism* and *kufr*, (unbelief) were constantly on his lips. Unlike al-Ghazali and Ibn Rushd his extreme conservatism prevented him from making any compromise between the later ideas and the earliest ones. He cared very little for personal happiness and was ready to accept even physical torture in preaching his own opinion. He did not stop writing even in his prison and probably the greatest shock that he ever received, was to be deprived of paper and ink in prison. But the events of later years showed that his ideas had not perished entirely, for after lying dormant for four hundred years they were to bring forth a new movement in Arabia, which under the name of

Wahhabism, is one of the most vital elements in the life of Islam today.4

He blamed the Sufis and held *Tasawwuf* responsible for the debacle of the Muslim Ummah. He waged a Crusade against grave worship and other innovations. His *'Ziaratul Qubur Wal Istinjadu Bil-Maqboor'* is a direct attack against the said anti-Quranic concept. He unambiguously stated that any approach to the graves of any Wali, Pir and and even of the Prophet with a prayer to be fulfilled by them amounts to Shirk. His namaz-e-Janaza was attended by two lac males and fifteen thousand females.

He pointed out that due to 'Taqlid', blind following of the past authorities, the Muslim Ummah had lost its mobility. He also strongly advocated the renewal of 'Ijtihad' which means, in Islamic terminology, independent judgement on legal questions to facilitate the mobility and onward march of Islam with the passage of time.

Allama Iqbal has said of Ibn-I-Taimiyya : the spirit of Ibn-Taimiyya's teaching found a fuller expression in a movement of immense potentialities which arose in the eighteenth century, from the sands of Najd described by Macdonald as the 'Cleanest spot in the decadent world of Islam.' It is really the first throb of life in modern Islam; to the inspiration of this movement are traceable, directly or indirectly, nearly all the great modern movements of Muslim Asia and Africa e. g the Pan-Islamic movement.[5] According to Maududi Ibn Taimyya cleansed Islam of all impurities, purged its system of all shades of evil and presented it afresh before the world in its original pure form. He did not spare any person, however big and respectable, in his criticism. Even those people who enjoyed unqualified veneration and respect with the masses of people could not remain immune from his critical attacks. Wrong customs and practices which had been accepted as part of Islam for centuries, for which religious sanction had been obtained and to which even the Ulema had closed their eyes were ruthlessly attacked by Ibn-I-Taimiyyah. This straight and independent thinking and sharp out-spokenness of his, turned the whole world against him so much so that even at present Ibn-I-Taimiyya is remembered in a manner not very kind and pleasant. Most of his contemporaries who felt offended

by him got him tried and sent to jail several times. Those who came after him slandered and ex-communicated him posthumously to pacify their fury. But the fact is that the cry raised by him of following and practising the pure Faith, generated powerful movement which can still be heard reverberating in the world of Islam.[6]

IBN-I-KHALDUN (1332-1406 A D)

Ibn Khaldun, an exceptional talent, is said to be the father of Sociology and originator of historical philosophy. He was born at Tunis on May 27, 1332 A D when decay had set in the dominating power of the World of Islam. His life is full of adventures and vicissitudes.

'Muqaddimah' is the preface (Prolegomena) of his famous *Kitab al-'Iber'* universal history. He was the first Philosopher of history who compared the birth, growth, decay, and fall of a society, on a scientific basis on an analogy with the life cycle of the microcosm of an individual. Ibn Khaldun was the first man to consider the importance of economics in the success of politics but his views are different from those of Karl Marx (1818-1888) who appeared more than five hundred years after Ibn Khaldun : Marx's view was that economics is the only factor to influence society, whereas, according to Khaldun, economics is not the sole factor. Marx was one-eyed with a narrow approach, whereas Khaldun's vision was wide and all comprehensive in dealing with the Philosophy of History and Sociology. The life of the state depends, according to Ibn Khaldun, on the unity between the ruler and the ruled based on higher purposes of man and also on the combination of political power with religious conviction.

He emphasised the interdependence of political, economic, cultural, military, social and religious aspects of life for a successful state and a lasting civilization. He projected Islam as universal Human civilization having all these comprehensive factors combined together.

According to Professor Toynbee, the Philosophy of history propounded by Ibn Khaldun is the best specimen of intellectual achievement of any country and of any time. Toynbee mentions him in his *'A Study of History'* as a Superlative Genius in his study of the rise and fall of empires. Iqbal in his *Reconstruction of Religious*

Thought says : The whole spirit of the Prolegomena of Ibn-Khaldun appears to have been mainly due to the inspiration which the author must have received from the Quran.[7] In appreciation of the great talent of Khaldun, Iqbal further observed in the Reconstruction: 'The question for us to consider is to find out an effective method of enquiry into the nature and significance of extraordinary experience. The Arab historian, Ibn Khaldun, who laid the foundation of modern scientific history, was the first to seriously appreciate this side of human psychology and reached what we now call the idea of subliminal self' [8] Prophet advised the followers to learn from the world and not to merely pass through it. Ibn Khaldun's attitude towards history was influenced by his deep study of al-Quran and the Hadiths of the Prophet.

SHAYKH AHMED SIRHINDI (MUJADDID-I-AL F-THANI (1564-1624 AD)

The heretical period of Mughal Emperor Akbar presents a black chapter for Islam in the Indian Sub-Continent. He turned out to be a pervert to the extent that he denounced the fundamentals of Islam in co-operation with his accomplices Abul Fazl and others who sponsored the so called New Religion: Deen-i-Ilahi. He used to favour the Hindu Creeds, personally used to join different Hindu festivals, cow slaughter was stopped and Jizya was withdrawn. He used to encourage Shirk and innovations. None dared saying prayers (Salat) within the area of the Royal Palace.

On the basis of : V-smith: Akbar: 2nd ed. (1927); Ibn Hasan: The central structure of the Mughal Empire (1936); P. Saran: The Provincial Government of the Mughals, 1526-1658 (1941) Makhanlal Roy Chaudhury : The Din-i-Ilahi (1941); Sri Ram Sharma: The Religious policy of the Mughal Emperors (1940), Encyclopaedia Britannica (Vol.1 page-477) comments: Akbar deliberately founded his empire on an understanding with the Hindu Rajputs and on respect for Hindu religion and culture. In 1562 and 1570 he married Rajput princesses. He conferred important mansabs upon Rajput Chiefs and appointed some to high position in revenue departments. He set his face against a militant orthodox Islam by formally abolishing, in 1564, the Jizya or poll tax on non-Muslims and by rescinding the

taxes previously levied on Hindu pilgrims. He discouraged cow slaughter, participated in Hindu festivals and encouraged the study of Sanskrit Classics, ordering their translation into Persian.

In his own personal religious life, too often he was regarded as purely opportunistic politically. In 1575 Akbar built an ibadat-khana (house of worship) at Fatehpur-Sikri in which Muslims of many hues, Jesuit fathers from Goa, Zoroastrians, Hindu pundits and Yogis, discussed religion with Akbar himself. After 1582 he and his mentors at court formulated the tauhid-i-ilahi or divine monotheism compounded of ideas from Sufism and observances from Zoroastrianism, with Akbar himself as the adherents' pir or spiritual leader.

Sirhindi played a heroic role in reversing the heretical trends introduced by Akbar. He led the movement to restore the pristine purity of Islam. He demanded that the duty of the state was to fully implement Shariah and eliminate the subsequent accretions to ensure the purity of Islam. His letters, according to the research of Yohanan Friedmann, 354 in number, were written to two hundred persons, most of them were addressed to Sufis on various subjects and not more than seventy letters were addressed to Mughal officials.[9] These historically important letters are collectively known as 'Maktubat-e-Imam-i-Rabbani, which are considered to constitute the landmark in the development of Muslim Religious thought in the Indian Sub-continent. Sirhindi had a clean conception about Shariah and he was cautious about the innovations by the Sufis. Referring to Maktubat, Friedmann says that Sirhindi admitted that the expressions: Fana, Baqua, Judhbah and Suluk were not used in the time of the Prophet and were invented by the Sufis.[10]

Referring to Tadhkirah by Maulana Abul Kalam Azad, Friedmann says that there had been large numbers of Ulema and Sufis who were bemoaning the sad situation but none came forward to remedy it. The biggest disaster of India was that the *'Tasawwuf'* was corrupted by innovations and ignorance. The whole country was ignorant of the 'Shariah Science'. During the time of Akbar, innovations were spread by the Government itself with the active assistance of the wicked `Ulema and the Worldly (Dunya Parast) Sufis. Quoting Maulana Azad, Friedmann further says that Sirhindi was the only person who had the

courage and stamina to embark single handed upon a campaign of reform and renewal (Islam o Tajdid) and to stand up to the emperor himself. The rest of the Ulema in some cases even issued fatawa declaring Sirhindi and infidel. Sirhindi's mission was not limited, in Azad's view, to the Repudiation of Religious innovations and the introduction of 'Tawhid-i-Shuhudi'. His activities had a much wider scope. He transcended Tasawwuf and was fulfilling the task of the Prophet of old.[11] Sirhindi's efforts were crowned with success. His activities created the atmosphere which actually enabled Aurangzeb to rule according to the principles of Orthodox Islam.[12]

SHAH WALIULLAH OF DELHI (1702-1762 A D)

Against the background of decaying Mughal power and confusion all around, the intellectual roles of Shah Waliullah in the interpretation of Islam and giving a sense of direction to the Muslim Ummah, for restoration of the purity of Islam, are matters of great achievement and surprise too. While Muslims forgot the clear concept of Islam, as a complete system of life and while the Muslim Ummah confused the history of Muslims as the History of Islam, Shah Waliullah with deep study of Islam, dealt with those questions with marvellous skill and he brought home to the Muslims actual and perfect knowledge about Islam. He inspired the stagnant and backword-looking Muslim Ummah to have recourse to Ijtihad to bring back dyanmism in the Muslim World.

Of all the intellectuals and original thinkers born in the Indian sub-continent, Shah Waliullah was the first and foremost one to deeply study the causes of the debacle of the Muslim Ummah. He personally saw and observed the decaying Mughal period. He had been born four years before the death of Aurangzeb Alamgir. He alone saw no less than ten rulers succeeding to the throne one after another. His diagnosis was the same as that of Ibn-I-Taimiyya that the cause of the debacle for the Ummah was deviation from Al-Quran and he directed the Muslims to go back to the teaching of Al-Quran and re-start `Ijtihad' As a Prolific writer he wrote about 200 books out of which only 34 books were published. *`Hujjat-Allahil Baliga* 'is the important work in which rational analysis of different provisions of Shariah was made. He

translated *Al-Quran* and *Muatta of Imam Malik* into Persian. The work started by Sirhindi was successfully completed by him.

MOHAMMAD IBN ABD-UL WAHHAB (1703-1787 A D)

Mohammad Ibn Abd-UlWahhabwas born in Al-Uyaynah in 1703. He acquired knowledge from his father and other distinguished Ulema in Mecca, Medina, Basra and other places. He a youngman, having travelled in Iraq and Syria, returned in 1750 and started preaching anti-Shirk ideas with a view to restoring the pristine purity of Islam. His reformatory Ideas were deeply influenced by Imam Ibn Taimiyya's line of thought and teachings. Othman Abu Ahmed Ibn Muammar the ruler of Al-Uyaynah lent support to his movement, but having been threatened by Banu Khalid Chief of Al-Hasa to kill Mahammad, Othman had no alternative but at least to compel Muhammad to get away from the country, the latter reached Dariya, the seat of Muhammad Ibn Saud. Othman was repentant to remember that Muhammad Ibn-Abdul Wahhab had advised him on his first arrival at his court:

'I hope that if you rise in support of the One and the only God, God Almighty will advance you and grant you the kingdom of Najd and its Arabs'. Othman, remembered the dream of his grandfather who wished to make Al-Uyaynah the Capital of the Arab Empire and sent a letter to Ibn Wahhab to come back but the latter declined, he rather liked to continue with Muhammad Ibn Saud, who co-operated with him whole heartedly. By 1765 the whole of central and Eastern Arabia fell to Wahhabi Rule. Ibn Saud's son and successor Abdul Aziz (1) continued to work in harmony with Mohammad Ibn Wahhab, the former with his son Saud 11, was busy in the expansion of the empire whereas Ibn Wahhab Controlled Civil Administration. Allama Iqbal in his *Reconstruction of Religious Thought in Islam* (p 152) says that the great puritan reformer Mohammad Ibn Abdul Wahhab succeeded in spreading the fire of his restless soul throughout the whole world of Islam. On his death bed Ibn Wahhab bequeathed to his temporal successors the divine cause of establishment of the pristine purity of Islam for which he dedicated his life. They did not fail him.

JAMAL AL-DIN AL-AFGHANI (1839-1897 A D)

In the context of the pitiable condition for the world of Islam, during the 19th century, Jamal al-Din Al-Afghani appeared on the scene. He was a born fire-brand Mard-E-Mumin. He started a movement to bring back the unity of the Muslim world for revival of Muslim Power. Afghani like Ibn-I-Taimiyya and Shah Wali Ullah strongly felt that the cause of decadence of the Muslim Ummah was deviation from the teaching of Al-Quran. He further felt that due to the debacle of Muslim culture on the one side and advancement of science in Europe on the other, the Western imperialistic powers made inroads into the Muslim world. He also found that Muslim society had become stagnant and incapable of competing with Europe in a changing world. He was convinced that without going to the teachings of Al-Quran and 'Ijtihad' there could be no survival for the Muslim world. He chalked out an intellectual programme of filling up the gap between medieval Muslim society and modern western knowledge. He took up another simultaneous programme for consolidation of the Muslim Ummah. Unlike the views of his contemporary Sir Sayyed Ahmed, who could not antagonise the British in the context of the condition of the Muslims of the Indian sub-Continent, Afghani led an anti imperialistic political campaign. While Afghani was serving the cause of Islam in Egypt, Taufiq Pasha assumed power as an agent of the British. Afghani had to leave Cairo and reached Paris. His disciple Abduh having been driven away from Egypt, joined Afghani there in 1884. Both of them issued a weekly newspaper in Arabic from there: 'Al-Urah al-Wuthqa' He established a Pan-Islamic society styled as 'Ummul Qurah' in Mekka to inspire the Muslim world. Having quoted profusely from the holy Quran, he appealed to the Muslim Rulers, Intellectuals and masses all over the world to unite, on Quranic Principles of Brotherhood (Ukhuwwa), and to join his movement: 'Wahadat Al-Islamia' Which was termed by the western critics as 'Pan-Islamism'.

PAN ISLAMISM

In this connection the meaning of the term 'Pan' may be sorted out. The term signifies an idea about anything complete or whole or

Universal. Islam is a world religion, unlike other religions and is also a complete code of life. Its approach is Universal: Allah the Creator and Lord of the worlds cherishes and sustains the Universe as a whole and the outlook of his religion Islam is all comprehensive and universal. Islam does not admit of any geographical boundary or topographical limitations, nor does it admit of any racial and parochial approach. Al-Quran addresses to mankind as a whole 'Yea Aiyyuhanna's or to the believers where-ever they may be: 'Yea Aiyyuhallajina Amanu'. The Prophet of Islam unlike other prophets, was sent as a Universal Messenger to mankind as a whole.[13] He was not only for all believers[14] but also to the entire Universe.[15] Islam enjoins upon Muslims, both the rulers and the ruled to do what is right and forbid what is wrong.[16] That Islam as a religion is of Universal Character is justified by the name 'Islam' itself' which signifies submission to Lord of the worlds: Rabbul Alamin. It is not styled after the name of the founder as in the case of other religions: Confucianism, Buddhism, Christianity etc. Since it is a world religion , its conceptions are Universal. Its social, political, economic and legal systems have got Universal relevance and significance. So the Universal character of Islam is included and inherent within the scheme of Islam itself. Thus to qualify Islam with the term 'Pan' to make 'Pan-Islamism' is rather redundant.

Afghani drew the attention of the Ummah to the truth that Allah does not change the condition of a nation unless they themselves change their condition.[17] Afghani's devotion for the cause of Islam made him a full time crusader. He made his European tour for the political truce of Muslim, states with European Powers. W.S. Blunt in '*Secret History of the English Occupation of Egypt'* writes that it would be interesting to note that beside the union of Muslim countries Afghani also sought to bring Britain or Russia into a pact with Muslim states. Blunt records several meetings in London during 1884-1885 between Afghani and Randolph Churchill (father of Sir Winston Churchill) on the question of British-Musalman alliance.[18] Blunt further records that on the failure of the negotiations Afghani changed his mind, went to Russia for an alliance against the British Empire. He and his friends in London made a Franco-Russo-Indian conspiracy with Afghani as its head.[19] Iqbal

termed Afghani a bridge between the past and the present. Iqbal mentions both Shah Waliullah and Afghani in the following terms : Perhaps the first Muslim who felt the urge of a new spirit in him was Shah Waliullah of Delhi. The man, however, who fully realized the importance and immensity of the task, and whose deep insight into the inner meaning of the history of Muslim thought and life, combined with a broad vision engendered by his wide experience of men and manners, would have made him a living link between the past and future, was Jamal-ud-din Afghani.[20] According to W. C. Smith: a very great deal of subsequent Islamic development is adumbrated in the personality and career of Afghani: In fact there is very little in 20th century Islam not foreshadowed in Afghani.[21]

SIR SYED AHMED KHAN (1817-1898 A D)

Syed Ahmed Khan, contemporary to Afghani, founder of the Mohammedan Anglo Oriental College, which ultimately developed into Aligarh Muslim University, played an important role to the Muslim renaissance in the Indian sub-continent. He was a great organiser, writer, an educationist, a modern interpreter of Islam and a statesman. He fully realised the adamant and uncompromising anti Muslim attitude of Hindu India and he was the first Muslim to advocate the already existing Two-Nation Theory and it was he who forecast the partition of India. In 1867 he said: "It was now impossible for Hindus and Muslims to progress as a single nation" "In 1882 he said to a students' gathering at Ludhiana that Muslims were a nation. He declared: All individuals joining the fold of Islam together constitute a Nation of the Muslims, Remember: it is by keeping up Islam that our Nation is a nation". These are the first known unequivocal declarations that Muslims of India constitute a separate nation.[22]

It was the Hindus who by their religious conviction, social behaviour and political actions established beyond any doubt the concept of the Two-Nation Theory. Hindu India having felt that Urdu and Persian languages, prevalent during Muslim rule, carried the flavour of Islamic culture, organized a committee in the united provinces with Sharoda Prosad Shandal as its Secretary and started an agitation to replace the said languages by Hindi. Sir Syed Ahmed Khan wrote a letter on the 29th April, 1870 when he was in England to Nawab Mohsin-ul-

Mulk expressing the anxiety that if the Hindus continued to proceed that way it could be said with certainty that the Muslims could not pull on with them, rather separation was indispensable.[23]

In the context of the Hindu attitude and their anxiety to dominate the Muslims, Sir Syed in a speech in 1883 said; : 'Now, suppose that all the English were to leave India . . . . . . then who could be the ruler of India? Is it possible that under the circumstances two nations, the Muslim and the Hindus, could be equal partners to rule the country particularly when the Hindu Population is 4 times more than the Muslims. Subsequent events proved his vision to be true.

SAYYID AMIR ALI (1849-1928)

S. Amir Ali, the eminent jurist, a Muslim thinker and a statesman was born at Cuttack in Orissa and was educated in Hooghly Muhsiniyya College where he learned Arabic, English Literature and Law. He was one of the exceptionally meritorious and well read persons in the contemporary world. Wilfred Cantwell Smith in Islam in Modern History refering to 'Memoirs of S. Amir Ali' Islamic Culutre, Hyderabad (1931) states that he had been "enthralled" by Gibbon before he was twelve, and by the age of twenty had read most of Shakespeare, Milton, Keats, Byron, Longfellow, and other poets along with the novels of Thackeray and Scott, and "knew Shelley almost by heart".24

He was called to the Bar of the Inner Temple in 1873 and started practice in Calcutta. He became a member of the Bengal Legislative Council in 1878 then he became one of the 3 (three) Indian Members and the only Muslim Member of the Governor General's council. He became a Judge of the Calcutta High Court in 1890 and was appointed to the Judicial committee of the Privy Council as the first Indian member in 1909.

In the evolution of the Idealistic trend of interpretation of Islam he was the most distinguished Modernist in Islam. According to W C Smith the monumental work of Amir Ali: Spirit of Islam is probably the greatest single work of this trend.[25]

While the western world, was creating by its apparently dazzling civilization, an impact upon the Westernized Muslims who were

loosing faith in Islam, S. Amir Ali through his works: Spirit of Islam, a modernist Muslim Classic, A Short History of the Saracens, Mahammedan Law etc. succeeded in effectively defending Islam before the Bar of western Opinion.

He was convinced that due to the communal and intolerant attitude of Hindu India the alternative to British Rule in India was going to be a Hindu domination masquerading as Indian nationalism. He, therefore, founded the National Mohammedan Association in 1877 to teach the Indian Muslims western political techniques to protect their interest.[26] He was next to Sir Syed to foresee, the justification of the Two Nation Theory, which was further developed by philosopher poet Iqbal and Quaid-i-Azam Jinnah the architect of Pakistan through the partition of the Indian Sub-Continent.

QUAID-E-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH (1876-1948 AD)

By the later part of the twenties of this century, Muslim leaders: Quaid-e-Azam Jinnah, Maulana Mohammad Ali, Shawkat Ali, and others were convinced that despite their sincere attempts for an understanding with Hindu India, the latter was adamant not to consider the reasonable demands of the former, So Muslim leaders had no alternative but to stand on their own legs. A pertinent question that arose was as to who would be entrusted with the leadership of Muslim India. There was a consensus among the Muslims all over the sub-continent that it was Mr. M .A Jinnah alone who should be given the leadership, because of his extraordinary calibre as a statesman of integrity. Maulana Mohammad Ali when he started for England to join the first Round Table Conference in 1930 was ailing and he was taken on a stretcher to the ship; some of his disciples asked him as to who would lead them after him. He replied "Mr. Jinnah and none else." He prayed to God and further said: 'If great God puts it in Mr. Jinnah's head to take up the job.[27]

Similarly Allama Iqbal wrote to the Association of Nairobi Muslims who wanted him to guide them: "But let me tell you that I have finished my life work. I do not desire to live long. But one man whose service the Muslim world generally and the Indian Muslims particularly require is Mr. M. A Jinnah, I should like you to pray for his long life.[28] In the

context of the keen political tug-of-war among the British, the Hindus and the Muslims in the sub-continent, Iqbal, due to the sagacity, integrity and statesmanship of the Quaid-e-Azam Jinnah, pinned down his hopes on him. The following letter dated June 27, 1937 written by Allama Iqbal to Quaid-e-Azam unequivocally shows the depth of his confidence in the leadership of the Quaid-e-Azam:

"MY DEAR MR. JINNAH

I know you are a busy man, but I do hope you won't mind my writing to you so often, as you are the only Muslim in India to whom the community has a right to look up for self-guidance through the storm which is coming to North West India, and perhaps to the whole of India . . . . .To my mind the new constitution with its idea of a single Indian Federation is completely hopeless. A separate Federation of Muslim Provinces, reformed on the line I have suggested . . . . is the only course by which we can secure a peaceful India and save the Muslims from the domination of the non-Muslims. Why should not the Muslims of north west India and Bengal be considered as nations and entitled to self-determination just as other nations".[29]

The Quaid-e-Azam took up the responsibility of leading Muslim India. He asserted that Muslims form a nation and he defined Two- Nation Theory "We are a nation with our own distinctive culture and civilisation, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of value and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitudes and ambitions, in short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canons of international law we are a nation."

He declared: "The British want to rule India, and the Congress wants to dominate over the Muslims, I shall allow neither." Jawaharlal Nehru, on behalf of the Congress, made the statement that there were only two parties in the sub-continent:" the British and the All India National Congress". The Quaid-e-Azam replied, "No, there is a third party: the Muslims". He organized the disorganized Muslims of India at the sweat of his brow. The All India Muslim League, under his Presidentship, adopted a resolution on the 23rd of March, 1940 in Lahore demanding the partition of the sub-continent which is popularly

known as the Pakistan Resolution The teachings of Islam and the spirit of Islamic brotherhood inspired Muslim India in the historic movement to achieve Pakistan. Through his dynamic leadership Pakistan was achieved on the 14th of August, 1947 on the basis of the Two Nation Theory. He cornered the leaders of Congress who represented Hindu India and outwitted the British statesmen on the political chess-board of the sub-continent. Mr. H.V. Hodson, the Constitutional adviser of the last two Viceroys: Lords Wavell and Mountbatten says in *'The Great Divide-Britain-India-Pakistan':* "Lord Mountbatten was not the first Viceroy to be baffled in the debate with Mr. Jinnah. Mr. Edwin Montagu wrote in his diary thirty years earlier". 'Chelmsford tried to argue with him and was tied into knots.[30] Mr. Gandhi, the so called champion of non-violence, was found out by the Quaid-e-Azam to be a cunning fox and a Hindu revivalist.[31] According to Lord Mountbatten Mr. Gandhi urged Indian Unity, to be maintained even by force.[32] But it was not possible for Lord Mountbatten to keep India united because of the success of the Muslim League in establishing the Two-Nation Theory through the election results, and because of the statemenship of the Quaid-e-Azam. Lord Mountbatten says: "The man whom I had real difficulty in getting through was Mr. Jinnah, the Quaid-e-Azam (the great leader) as his followers called him. If it would be said that any single man held the future of India in the palm of his hand in 1947 that man was Mohammad Ali Jinnah. To all intents and purposes Jinnah was the Muslim League and if the dream of Pakistan the separate Muslim state ever did come true it would be Jinnah who brought it to life and fashioned it".[33]

Sir Sayed foresaw the idea of a Muslim state on the Two Nation Theory. Sayyid Amir Ali perceived be same. Chowdhury Rahmat Ali advanced it and Allama Iqbal Philosophised about it. The Quaid-e-Azam's leadership was indispensable for partition of the sub-continent. Annada Sankar Roy, the outstanding writer of West Bengal in a foreword of the book.: *'Jinnah Pakistan Natun Bhabana'* written by Shailesh Kumar Benarjee, an ardent follower of Gandhi says: If there would have been no Gandhi India would have been independent today or tomorrow but if there would have been no Jinnah there could

have been no Pakistan'. Annada Sankar Roy further admitted a hard fact about the integrity of the Quaid-e-Azam: The British Government could not win over Mr. Jinnah by offering him high positions and titles, he was unpurchasable and incorruptible.[34] Shaikh-ul-Islam Maulana Shabbir Ahmed Osmani, said in his Khutba after he had led the Namaz-e-Janaza of the Quaid: "The Quaid-e-Azam was the greatest Muslim after Aurangzeb".[35]

Since the Two-Nation Theory is the basis for partition of the Indian sub-continent which resulted in the creation of Pakistan, it is also as such the basis of the present Bangladesh. Islam is the sheet anchor of Muslim nationalism and the Two-Nation Theory. No responsible Muslim can be oblivious of these hard facts. Perpetual vigilance is the price of freedom.

DR. MUHAMMAD IQBAL (1877-1938 A D)

Allama Iqbal appeared on the scene during the last quarter of the 19th century and played his role during the first half of the 20th century. The entire world of Islam, by that time, with few exceptions had come to be under the sway of western imperialistic powers and the success of science and the progress of material life in the west had begun to dazzle the eyes of the world. The world of Islam was also enormously attracted by western culture and civilization.

Iqbal was born of a steadfast Muslim family with a background of Islamic values and with his oriental education he entered upon a new phase of life through his education in Europe.

During his stay there for three years (1905-1908) he secured the M. A Degree in Philosophy from Cambridge, obtained his Doctorate from Munich University, Germany, on the thesis '*Development of Metaphysics in Persia*' and was called to the Bar from the Honble Society of Lincoln's Inn.

His study of western Philosophy, and acquaintance with western concepts on different issues of life created in him a synthesis . This re-orientation made him a master of modern thought and a reconciler of the spirituality of the East and the materialism of the west.

Iqbal was very much critical of the secular concepts of the west on: sovereignty, nationalism, democracy, political and economic systems.

According to him the national state based on geography and language as distinguished from ideology and higher values makes the state itself a demigod and an object of adulation. People as citizens of such national states are trained up or compelled to live and die for the nation irrespective of right or wrong. Such secular states naturally become instruments of exploitation. The concept of such nationalism had come into vogue as a result of a secular intellectual movement in Europe during the 18th century. It became an instrument of exploitation and lacked all higher values. The concept of the national state played havoc with Islamic ideals : Brotherhood, Equality, Tolerance, Universalism and Pan-Islamism. Iqbal waged a crusade against nationalism based on geography. The concept of nationalism as envisaged by Al-Quran is based on Islamic ideology which is not confined by geographical boundary nor by barrier of language.

The foundation of the Islamic concept of nationalism is constituted by the philosophy of Tawhid, teachings of Al-Quran and the Prophet. In *Bung-e-Dara* he says that his centre is in Medina. He urged the Muslims to break the idols of nationalism and to be absorbed in Islamic Millat. There is no Irani, Turani and Afghani within the concept of Islam. He further stated that mankind created by Allah is one, but human greed and desire for power have divided them into different groups. In his poem '*Tulu-e-Islam in Bung-e-Dara,* Iqbal called the Muslims to become the messengers of Brotherhood of men which is the message of Islam. In that case all the differences of Hindi, Khorasani, Afghani and Turani will disappear. In Tarana-e-Milli he projects the concept of Universalism and the wide vision of a Muslim : "Chin o Arab hamara Hindustan hamara, Muslim hain ham, Watan hai sarajahan hamara. China is ours, Arabia is ours, Hindustan is ours, I am Muslim and the whole world is the homeland of ours." Iqbal rejected the Western idea of the fatherland as the basis of modern political nationalism. In his verses in The Mysteries of Selflessness, it is said : 'our essence is not bound to any place, the vigour of our wine is not contained in any bowl, Chinese and Indian Alike, the shard that constitutes our jar Turkish and Syrian alike, the clay forming our body; neither is our heart of India, or Syria or Rome nor any fatherland do we profess except Islam."

Emphasising the concept of Brotherhood of Islam he regreted in *Jawab-e-Shikwa* : the Prophet of all Musalmans is the same, Din is the same, Iman is the same, Kaba is the same, Allah is the same, Quran is the same, is it difficult for the Muslims to be united; there is Firkabandi, different groups and tribes and nations. Is this the way for the Musalmans to progress and become powerful?

It was Iqbal who stood against Western culture and civilization, he thereby arrested the tide of Western culture to save the Muslim world from evil influence.

Having assessed the contribution of Iqbal in his interview with Mr. Golam Hussain Azhar representative of an Urdu Monthly (Saiyara Digest) in May 1963, Sayyid Abul Ala Maududi stated that when the Islamic Philosophy of life and culture were being swept away by western culture, it was Iqbal who exposed the shallowness and undesirability of Western culture and gave a clarion call to the Muslim world to go back to the teachings of Al-Quran and the values of Islam. Iqbal condemned 'Taqlid' and urged the renewal of Ijtihad. He reminded the Muslim world; 'Oh Jamaneme tum muazzej the, Musalman hokar. Ab Tom Khar hu-e-Tarek-e-Quran hokar.'

Iqbal dedicated his life to inspiring the Muslims to go back to the teachings of Al-Quran, to consolidate them on the basis of Islamic brotherhood and he politically guided them as the philosopher poet of the Muslim Ummah. A modern interpretation to refashion Islam was the need of the hour. According to W. C. Smith : Such a refashioning was a service rendered to Islam chiefly by the outstanding Muslim poet and thinker of the century, Muhammad Iqbal. The need for this service may be measured in terms of the universal attention and veneration which he has attracted. He is great because he said with supreme eloquence and convincing passion what his fellows were vaguely beginning to feel, but were unable to formulate.[36]

Iqbal's political Philosophy was based on the ideology of Islam which considers man as the noblest creature and God's representative on this earth. The development of personality in man as such is a matter of supreme importance for Iqbal. He, therefore, inspired the Muslims to strengthen their Khudi and to develop their ego. He was not ready

to surrender his existence even before God, rather he was after the acquisition of the qualities of God and to absorb them in him. 'Takhallaku Be-Akhlak Allah' was his motto. Iqbal urged the Muslim Ummah to shake off their lethargy and to galvanize themselves in all spheres of life. He bitterly criticized those concepts which prescribe a negative view of life and encourage asceticism and renunciation of this worldly life by taking refuge in shrines and monastaries. He was critical of Sufism which encourages asceticism resulting in the degradation of the Muslim World. He was also a vehement critic of Pantheism, Unity of Being. (Wahadat-Ul-Wajud) Pantheistic Philosophy presupposes that the Creator and the creation form one inseparable existence and it identifies God with the Universe. God is part and parcel of the creation and each species of creation is also an inextricable part of God. This concept penetrated in 'Tasawwuf' (Muslim term for Mysticism) as 'Hama Wost' 'that is' all is He' and it encouraged the anti-Islamic concept of Rahbaniyat (renunciation of this worldly life) and merger with Him. The idea of Asceticisim grew from the concept that the human soul is confined and imprisoned not only on this material world but also in the human body itself. So man should, for his salvation, strive to free himself from these physical bonds. Christian Monasticism, Hindu Vedantaism and the Buddhist concept of Nirvana encouraged Rahbaniyat.

Iqbal castigated Ibn Arabi and his *'Al-Futuhat-al-Makkiya' and 'Al-Fusus Al-Hikam'* for the adoption of Mysticism. He called upon the Muslim Ummah to strengthen Khudi (Self) : 'Khudi-ko kar buland etna Ke-har takdir Se Pahele Khuda Khud Bandese Paunche Bata teri reza ke-a ha-e." Along with the development of Khudi, he emphasised `Amal (action) : Amalse Zindegi banti ha-e Jannat Bhi Jahannam Bhi. E-e-Khaki Apni Fitrat Me Na Nuri Ha-e Na Nari Ha-e.

Iqbal's study of the History of nations led him to the conclusion that civilization and culture alone cannot be sufficient for the survival of a nation. The Greeks and Romans had a highly developed civilization and culture but the former was destroyed by the latter inferior in culture and civilization while the latter (the Romans) were vanquished by the vendals and by barbarian like Attila the king of the Huns (435-453). Muslim civilization reached its zenith in Spain when Europe was

still in the grip of Barbarism. Students from the Christian World used to flock to the Muslim Universities for acquiring knowledge. Due to lack of power it succumbed to the Christian onslaught. Muslim civilization reached its zenith at Baghdad also which had become the only conspicuous centre of civilization and culture throughout the whole world but it succumbed to the invasion of Halaku Khan who destroyed Baghdad in ruthless manner. So Iqbal attached special importance to power to dominate the world. He was not agreeable even to accept a prophet who had no message of power and domination. He said :

- Nabuat bhi Ha-e Ummat Ke Li-e Barge Hashish, Jes Nabuat Men Na-ho quwat
- Shaokat Ka Pyam." Iqbal would not accept a Moses if there is no stick with him which is the symbol of power. Islam stands not for renunciation of this world but aims to dominate it. Unless there is Power, Qanun-e-Elahi can not be established. This is the justification of power. He reminded the Muslim Ummah of their past glory and heritage and inspired them : Learn again the lesson of truth, justice, bravery, thou shalt be entrusted with the leadership of the world again.

Like Sir Syed and Syyid Amir Ali, Iqbal was equally convinced of the inevitability of a disastrous consequence for Muslim India with a permanent and hostile Hindu Majority in the central legislature. He was convinced that partition of the sub-continent was the only solution of Indian political problem. In his presidential speech at the Allahabad Session of the All India Muslim League in 1930, he demanded the partition of the sub-continent on the basis of the Two Nation Theory. Iqbal's Idea was realised under the leadership of the Quaid-e-Azam in 1947 through the achievement of Pakistan, on the basis of the Two-Nation-Theory. The creation of Bangladesh is the corollary of the partition of the Sub-continent. The Quaid-e-Azam, the singular hero of partition and architect of Pakistan described Iqbal as his friend, philosopher and guide. According to Garamy Iqbal did the work of a Prophet-though one may not call him Prophet.37

ABDUL AZIZ BIN ABDUR RAHMAN AL-SAUD (1880-1953 A D)

Haramain Sharifain the two sancturaies : Makkatul Mukarrama and Medinatul Munawara where Al-Quran was revealed, preached and practised by the Prophet, are in Saudi Arabia; So it can be rightly called the heart-land and cradle of Islam. Let us now examine the role played by Saudi leadership in the process of re-generation of Islam in recent times. Abdul Aziz Ibn Saud, popularly known as Ibn Saud was the most distinguished personality who established the Kingdom of Saudi Arabia. As a great conqueror he crushed, Ibn-Rashids and Turks, annexed Hijaz and lands beyond it, to the Najd area. He consolidated the Kingdom and declared Al-Quran to be the Constitution for Saudi Arabia in 1932. He stressed the importance of political independence and supremacy of Islam. He enforced the Shariah in the fields of criminal, civil and commercial disputes. Islamic Jurisprudence (Fiqh) is strictly followed and is supplemented, with the change of time and circumstances, through Ijtihad.

Ibn Saud found that due to deviation from the basic teachings of Al-Quran, Muslim society had adopted anti-Islamic ideas, rites and rituals which encouraged accretions and innovations. So with an iron hand he uprooted the innovations to ensure the pristine purity of Islam. His unique role, as a reformer in various fields, advanced the process of regenerations for the Muslim Ummah during this century (the twentieth). During his life time, he appointed his eldest son to be his Crown prince and the second son, Faisal Ibn Abdul Aziz to be the Crown prince of his eldest son (Saud).

FAISAL IBN ABDUL AZIZ (1906 - 1975 A D)

He succeeded his elder brother as the ruler on November, 2 1964. He was fully conscious of the responsibility of a ruler in Islam. He took revolutionary steps in different fields to develop the country and to establish justice and fairplay according to Quranic principles. He did not believe in any gap between the ruler and the ruled. He declared the State Policy in these words : 'We are not rulers, we are preachers of Islam, the religion of prosperity, the religion of love and the religion of brotherhood." He converted Saudi Arabia from a mere pilgrimage Centre to a modern Islamic welfare State. He was conscious of the commitment of his country to Islam.

Apart from introducing radical developments in different spheres of National life, he took revolutionary steps, according to the dictates of Islam, in the international spheres to strengthen the bond of Islamic brotherhood by extending a helping hand to suffering humanity and the Muslim Ummah in particular. He emphasised the Dawa Programme all over the world. In his speech at the inaugural session of the Islamic Conference held at Makkah al-Mukarramah on 15th Dhul Hijja, 1384= April 17, 1965 he declared : `Brothers, this is not an ordinary conference. It is unlike any other assembly, because in this conference you will be studying the conditions of Muslims in every part of the world. Muslims everywhere will be looking up to you with hope, praying that this conference begins a new era enabling them to march forward on the path of righteousness and truth and to mark the beginning of true Islamic guidance based on the Holy Book of Allah and the Sunnah of His prophet (S.M.)". He continued, "Dear brothers, today we find the Islamic nation suffering from disunity, quarrels and disagreement, a state of affairs portending grave dangers. What need is there for disunity? Why disagree, when we are called upon to refer to God's Book and the Sunnah of His Prophet? It is incumbent on all Muslims to make Allah's Book and the Sunnah of His Prophet our arbiter, our judge in all affairs. As you know, Islam is the religion of wisdom, the religion of progress, the religion of strength and the religion of justice and equity. Islam stands unequalled and is far ahead of any man-made law or regulation. Why then, brothers, do we who are Muslims, believers in Allah and followers of the Sunnah of His Prophet, resort to temporal laws and constitutions which contradict the principles of our religion? Islam does not hamper the organization of our affairs, but this organization must be derived from Allah's Book and the Sunnah of His Prophet (peace and blessings be upon him). We must, therefore, organize our affairs in accordance with Allah's Book and the Sunnah of His Prophet. We may be at a disadvantage in that we have for long neglected to study the contents of Allah's Book and His Prophet's Sunnah, and failed to understand in full their true meanings and examples. We must, therefore, study this side of the problems. I am sure that our revered Ulama will uncover all that is embedded in the teachings of the Holy Prophet for the well-being of Muslims."

"Brothers, I am well aware that in the implementation of our Islamic Mission we are bound to be opposed, criticised and, perhaps, even attacked, all the same we, who have dedicated ourselves to the service of the true Faith, shall remain undaunted by the help of God. He who wants to antagonize us, let him do what he likes : He who wants to attack us, let him attack; for neither, shall we pay attention to them nor answer them in kind, and our reaction shall be limited to the spirit of the popular quotation; 'God Almighty, do lead my people to the right path, because they do not know." He continued : "Brothers, the Kingdom of Saudi Arabia, both government and people, shall support our Muslim brothers in every country of the world. We ask our Muslim brothers to support one another and co-operate with each other in whatever is beneficial for their religion and life on earth."

RABITAT AL-ALAM AL-ISLAMI

Out of this historic speech was born RABITAT AL-ALAM AL-ISLAMI (MUSLIM WORLD LEAGUE) : The constitution of the Rabita was adopted with the objectives : To fulfil the duty imposed on us by God.

The Rabita has been rendering an immense service to the cause of Islam and humanity : it has been providing funds for mosques, schools, madrasas in under" developed Muslim countries; Dawa work has been undertaken through distribution of Al-Quran, Imam and teacher training centres and other methods. Relief work was successfully undertaken during flood and cyclone in Bangladesh and other countries and during drought in Sudan, Somalia, Ethiopia and other countries. The Rabita ungrudgingly attended to different problems of the Ummah with all seriousness throughout the Muslim World.

OIC : The Organization of the Islamic Conference is constituted of by the representatives of the Governments of the Muslim world. This world body is the biggest International Organization next to the UNO. From this forum the political, economic and cultural interest of the Muslim world is taken care of. King Khalid succeeded him in 1975 A D and pursued the same policy, KING FAHD the present ruler and Custodian of Haramain Sahrifain, has been successfully following the same policies declared and established by King Faisal. On

assumption of his office he reaffirmed his determination to pursue this programme for the progress and development of Saudi Arabia to enhance the glory of Islam and the programme of the Saudi Government draws the admiration of all concerned throughout the world. So, contribution of Saudi Arabia is multidimentional for the interest of the Muslim World.

IMAM KHOMEINI (1901-1989 A D)

The success of the Islamic Revolution of Iran under the unique leadership of Imam Khomeini is an extraordinary victory of Islam in the modern world. Imam Khomeini was born of a highly respectable and a traditional family on October 23, 1901 in Khomein town at some distance from Tehran. His father Ayatullah Sayyid Mustafa Masawi died as a martyr at the age of 47 at the hands of Government Agents. His great grand father Sayyid Din Ali Shah was an inhabitant of Kashmir and was popularly known as Sayyid Ahmed Hindi. Khomeini a talented scholar, acquired deep knowledge in different branches of Islam, took teaching as a profession and became a professor of Philosophy at the age of twenty seven. The Western imperialistic powers propagated the idea that religion and politics were two distinct concepts. He brought home the idea to the Muslim Ummah that, in Islam, religion and politics are not two distinct concepts, rather, Islam is a complete and an integrated system of life. He pointed out that during the time of the Prophet, religion and politics were not two separate spheres. He urged the youths and the workers of the Islamic movement to shatter the wrong western idea into pieces and to face the local agents of the Western powers who were acting as enemies of Islam. Since 1962, he had started the actual movement against American expolitation and Jewish conspiracy. He gave a clarion call to the masses to stand united and to boycott the so called plebiscite arranged by the Shah to demonstrate his (Shah's) public support. Consequently the Imam was arrested on June 5, 1963. The government had to face an upheaval triggered in Tehran in the movement for his release. He was again arrested on November 4, 1964 and exiled to Turkey. He took asylum in France and was in exile for fifteen long years, it is from here that he led the movement for the Islamic revolution. The revolution succeeded on February 11,

1979, giving rise to the Islamic Republic of Iran. Till the end of his life, Khomeini played a remarkably straight forward role against the imperialistic designs of the West. Through a letter dated January 4, 1989 addressed to Mikhail Gorbachev, he invited him to put faith in the Creator and Religion. He reminded Gorbachev that the absence of faith had struck the worst blow on the Soviet People and said that no human problem could be solved without faith in God and Religion. He cautioned him that it was clear by now that Communism would soon be in the museums of political history. He warned him that while he was trying to come out of the hallucination of communism, he should not fall a prey to the trap of western capitalism and secularism.

SAYYID ABUL-ALA MAUDUDI (1903-1979 A D)

When due to change of time the impact of Western influence and secular ideas the Muslim World totally lost sight of Islam as a complete and dynamic system of life, it felt the urgent necessity of a clear and correct interpretation of Islam in the context of modern times. At this hour of need Allama Iqbal came to interpret Islam afresh. Abul-Ala Maududi appeared on the scene to carry out the unfulfilled work of Iqbal, with his extra-ordinary talent as a scholar and as a prolific writer. Maududi diagnosed like his predecessors that the root cause of all ills, degradation and distintegration of the Muslim world is dislogement of the Ummah from the basic teachings of Al-Quran. When questions were being posed from secular quarters that though Islam could establish an ideal society more than one thousand years ago, it could not offer any solution of human problems in the context of the modern world. It was Maududi who accepted the challenge through his literature : major books on different aspects of Islam numbering 138 with a large number of booklets on allied topics. Tafhimul Quran his famous commentary of Al-Quran in six volumes, another commentary Trajaman-e-Quran and a biography of the Prophet (P.H.) (Sirat-i-Sarwar-i-Alam in two volumes) brought Islam home to the readers in a splendid manner. His works have already been translated into eighty different languages, all over the world, including Arabic, Persian, English, French and German. His greatest contribution is the presentation of Islam as a complete and an integrated system of life for the solution of all human problems. Even while a young man of

thirty years, Maududi was considered by the elders to possess the high quality of Ibn-Taimyyia : E's to Ibn Taimiyya Ka Rang-ha-i! [38]

While a young man of thirty six years only Maududi attended a conference at Darul Ulum Nadwa in 1939, Allama Sayyid Sulaiman Nadwi introduced him : 'I am introducing before you, a young man who is however an ocean of knowledge and is known to the literary world. He is the mouthpiece of Islam in the modern age. His knowledge can offer solutions of all problems of the present day world. Muslim world expects a lot from him."[39] Maududi's propositions, based on a comparative study of different thoughts : Western, oriental and Islamic, bear the imprint of wisdom which establish the distinction of Islam. Due to his rational approach and scientific interpretation of Islam, he could bring both the Arabic and English knowing sections of people on one platform. Having dealt with Islam as a complete code of life he not only saved Islam from fragmentation and isolation from practical life but also freed it from confinement in mosques and Khankas. Through his mighty pen, he created a congenial atmosphere for Islam to play its due role in each sphere of life : Individual, social, political, economic, national and international, WC. Smith in *Islam in Modern History* says that Maududi was the most systematic thinker of modern Islam and his chief contribution was the transforming of Islam into a system. . . . . .. According to him Islam has an economic system, political system, constitution, so on.[40] Smith in *Modern Islam in India* further says that even during the early forties the religiously minded Muslims in the Universities and students of the Indian Sub-continent considered him to be the most modern interpreter of Islam and successor of Iqbal.[41] Justice Javid Iqbal, son of Allama Iqbal, says : the work left by the Allama was completed by Maududi but the work was to be continued with the passage of time.[42] Hindu India through its friend Maulana Hossain Ahmed Madani got a book written 'Muttahida Qaumiat Aur Islam' in support of the so called one nation theory. Allama Iqbal through a poem expressed surprise that Hossain Ahmed could not realise that Islam could not approve of nationalism based on territory (watan).[43] Abul-Ala Maududi most successfully controverted Madani's contention through his writings : *Masala-e-Qaumiyat*, in the

light of Al-Quran and Hadith, he through series of articles in the Tarzamanul Quran during the period 1938-39 unmasked the Congress manoeuvere. He, accourding to Syed Sharifuddin Pirjada, debunked Congress secularism and showed unsuitability of India for democratic rule as there would be only one Muslim vote against four Hindu votes.[44] Maududi in *'Siyasi* Kashmakash*'* expressed the view that it was only the worshipper of Bharatmata who might be pained at partitioning India, but the Maulana would be the happiest to get even one square mile from out of the whole of India if the sovereignty of Allah might be established there.[45] Jamate Islami founded by him in 1941 has been playing a significant role in the Sub-continent as the pioneer of Islamic movement. His rich literature has been exerting a great influence upon Islamic movement all over the world.

HASAN-AL-BANNA (1906-1949 A D)

Hasan Al-Banna, a contemporary to Maududi, only three years younger than the latter, founded the Association of the Muslim Brethren (Ikhwanul Muslimin) in 1928 in Ismailia (Egypt). He had also founded the Young Men's Muslim Association (Y M M A) in 1927 in Cairo to face the design of the Young men's Christian Association (Y M C A) which had been established in 1923 in Cairo. The Islamic movement that he started was carried conjointly through both the organizations; Ikhwanul Muslimin and the Y M M A 'Back to the teaching of Al-Quran' was his mission to which he dedicated his life. He led the Islamic movement to an extraordinary degree of success. He left a galaxy of talented and dedicated scholars including Syed Kutub (Shaheed), Muhammad Qutub, Abdul Quader Awda as his colleagues.

Apart from the aforementioned personalities from different parts of the world who made substantial contributions in the Renaissance Movement of the Muslim World, the following names, out of others in the Sub-continent, also deserve a special mention since they also consistently thought and worked, without any deviation from ideological mooring, in the same direction:

Shah Abdul Aziz, son of Shah waliullah Dehlvi (1746-1824), Shah Ismail of Delhi (1778-1831), Haji Shariat Ullah founder of Faraji

Movement (1781-1840), Sayyid Ahmed Barelawi (1782-1831), Moulana Keramat Ali Jainpur (1800-1873), Nawab Mnhsinul Mulk (1837-1907), Altaf Hussain Hali (1837-1914), Nawab Viqarul Mulk (1841-1917), Chirag Ali (1844-1895), Moulana Shibli Nomani (1857-1914) and his associate Sayyid Sulaiman Nadwi, Maulana Akram Khan (1868-1968), Nawab Sir Salimullah (1871-1915), Maulana Hasrat Mohani (1875-1931) Aga Khan (1877-1957), Maulana Mohammad Ali (1878-1931), Ismail Hussain Shiraji 1880, Chowdhury Rahmat Ali (1895-1951), Nawabzada Liaquat Ali Khan (1895-1951) and Khwaja Sir Nazimuddin (1893-1964).

References

1. Sir Mohammad Iqbal — *The Reconstruction of Religious Thought In Islam,* Published by Javid Iqbal, son of Allama Iqbal. p-4
2. S. Abul A'la Maududi — *A Short History of the Revivalist Movement in Islam,* Translated by Al-Ash 'Ari Islamic Publications Ltd. Lahore (Pakistan), P-64
3. Sir Mohammad Iqbal — Ibid, P-121
4. Dr. Sirajul Haque, Professor Emeritus, Department of Islamic Studies, DU — *Imam Ibn Taimiyya And His Projects of Reform* Published by Islamic Foundation, Dhaka, P-183
5. Sir Mohammad Iqbal — *Ibid*, P-152
6. S. Abul A'la Maududi — *Ibid*, PP-70-71
7. Sir Mohammad Iqbal — *Ibid*, P-139
8. Do — Do PP 190-191
9. Yahanan Friedmann — *Shaykh Ahmed Sirhindi. An outline of His Thought and Study-his image in the eyes of Posterity.* McGill Queen's University Press, Montreal, London - 1971, P-2
10. Do — Ibid, P - 44
11. Do — Ibid, P - 106

12. Do — Ibid, P - 108

13. Al-Quran — (a) Saba : 28 (b) A'raf : 158

14. Do — Tauba : 61

15. Do — Anbiyaa : 107

16. - Do - — Al-I-Imran : 110

17. - Do - — R'ad : 11

18. W. S. Blunt — Secret History of English Occupation of Egypt-London-1907, PP-467-468

19. - Do - — Ibid, P-358

20. Sir Mohammad Iqbal — Ibid, P-97

21. Wilfred Cantwell Smith — *Islam in Modern History*, A Mentor Book Published by the New American Library, P-54

22. G. Allana — Quaid-e-Azam Jinnah, The Story of A Nation. P-295

23. Maktubat-E-Sir Syed — Published by Bangla Academy, 1374 B.S. Letter No. 17. P-63

24. W.C. Smith — *Islam In Modern History*. A Mentor Book Published by the New American Library, P-68

25. W. C. Smith — *Ibid*, PP. 68 - 69

26. The Encyclopaedia of Islam, New Edition Leiden E. J. Brill-1979

27. Souvenir presented to Mohammad Ali Jinnah by Mrs. Rafiq Sharif, on his birth day in 1945

28. Pakistan Times, 28 December, 1955

29. Letters of Iqbal to Jinnah, Sh. Mohammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore, PP-20-24

30. H. V. Hodson — *The Great Divide, Britain-India-Pakistan* Oxford University Press-Karachi, P-217

31. Larry Collins and Dominique — *Freedom at Midnight*, P- 102

32. The life and Time of Lord Mountbatten Illustrated biography based on the Television history by John Terrain. With a forward by Lord Mountbatten. P-153

33. Do P- 151

34. Shailesh Kumar Benarjee Jinnah Pakistan Natun Bhabana, Mitra and Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10 Shama Charan Street. Calcutta PP-5 & 6

35. Sharif Al-Mujahid Jinnah, P- 659

36. W. C. Smith *Modern Islam In India, A Social Analysis.* Sh. Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore (Pakistan), P-104

37. Speech of Prof. William Rush Brook on Iqbal Day, London Iqbal Review Journal of Iqbal Academy April, 1967

38. Muhammad Nuruzzaman *Maudufi,* Prachi Prokashani. P-179

39. Abbas Ali Khan *Maulana Maududi,* Sindabad Prokashami 1980, P-284-285

40. W. C. Smith *Islam in Modern History* A Mentor Book, P-164

41. W. C. Smith *Modern Islam In India,* P-164

42. Biswer Monishider Drishtite *Maulana Maududi,* edited and compiled by Abbas Ali Khan, P-330

43. Dr. Mohammad Iqbal *Armagan-i-Hajaj,* P-278

44. S. S. Pirzada *Evolution of Pakistan,* PP-191-192

45. Abul A'la Maududi *Syasi Kash Maksh,* 3rd Volume

Vision of Iqbal

Mohammad Hosain Malik

Born on November 9, 1877 at Sialkot. Got his early education there and then joined Government College, Lahore for higher education. He did his honours in Arabic and English Literature and won scholarship for his Masters Degree, in Philosophy which he got with Gold Medal as he topped this University.

With his aptitude towards poetry he starting writing poems and taking part in 'Musharia' right from his school and college life.

Iqbal who received his early teachings from the well-known great Intellectuals of the time Moulvi Syed Mir Hassan and Professor Sir Thomas Arnold, Iqbal decided to work for the overall uplift of Muslims in the Subcontinent.

Muslims in the Subcontinent were not only living a miserable life of slaves but were also indisciplined and un-united.

He decided to wake-up the Muslims in the Subcontinent and through his poems and verses tried to unite them against Colonialism.

Iqbal reminded the Muslim about their past glory and told them through his poems about their pride and achievements for the humanity, mankind and religion.

He Wrote

نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے ھندوستاں والو
تمھاری داستان تک بھی نہ ھوگی داستانوں میں

وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ھے
تیری بربادیوں کے مشورے ھیں آسمانوں میں

This sort of poems created a new vision in the people and they realised that they are having not only the life of a slave but even worst than the animal when there his no concept of any freedom.

Iqbal proved to the public that these rulers who are enjoying the freedom for every citizen in their own country are not giving this right to the Indian here.

This was the start of a new thinking among the Muslims throughout the sub-continent, who rejected the concept of Nationalism and Capitalism, because these concepts were not providing the equality of all human beings as provided in Islam.

We all agree that as a profound thinker, Dr. Allama Mohammad Iqbal left a deep and lasting impression not only in South Asia but also on the entire Muslim world as well as on the West.

Iqbal was a messenger of renaissance and the greatest of the luminaries who set in motion the revolutionary spirit of the 20th century and stirred the Muslims from out of their deep slumber. As a poet, thinker and philosopher, he urged the Muslims to shake off lethargy and devote themselves to constant struggle and action. Dr. Iqbal called for inculcation of self-discipline, self-respect and self-reliance through his concept of *Khudi* and wanted its expression through righteous actions.

Allama Iqbal always dreamed for the creation of a society, which should be free from injustice, poverty, social evils and hatred against each others.

He always advocated for the *Truth* both in spoken and practical. He preached for an unbreakable *Faith* and *Unity* as a Millət, and as the Muslim Nationalists, to fight against the poverty, slavery and to achieve the goal of progress with other nations.

He was of the opinion that any compromise on *Unity* and *Faith* would lead us to an irrepairable loss and destruction:

فطرت افراد سے اغماض بھی کرلیتی ھے
کبھی کرتی نہیں ملت کے گناھوں کو مُعاف

"Nature may overlook the individuals, i.e. may not punish them here for their misdeeds, but it never forgives the sins of a Nation."

Allama perhaps writes about himself that messegeners like him would never come again:

سرود رفته باز آید که ناید
نسیمے از حجاز آید که ناید
سر آمد روز گارے این فقیرے
دگر دانائے راز آید که ناید

[The melodies bygone may come again

Or Nevermore!

The Zepher from Hejaz may come again

Or Nevermore!

The days of this Faqir are ended now,

For evermore!

And yet another seer may come or nor

For evermore!]

'ইকবাল দর্শনে ঐক্য ও সংহতি' শীর্ষক সেমিনার

মুহাম্মদ রুহুল আমীন

মহাকবি ডঃ আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবালের ৫৫তম মৃত্যুবার্ষিকী ছিলো ২১ এপ্রিল ১৯৯৩। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্যে আল্লামা ইকবাল সংসদ ১৪ মে, শুক্রবার '৯৩ বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে 'ইকবাল দর্শনে ঐক্য ও সংহতি' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। সংসদ সভাপতি বর্ষীয়ান দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব এনামুল হক। অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সংসদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মীর কাসেম আলী বলেনঃ বিশ্বব্যাপী ইকবাল চর্চা অব্যাহত রয়েছে। বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, ফার্সী, আরবী, হিন্দী, জার্মান, ফ্রেন্স বিভিন্ন ভাষায় ইকবাল সাহিত্য অনূদিত হয়েছে। ইকবাল একাডেমী, ইকবাল ইন্সটিটিউট ও ইকবাল সোসাইটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইকবাল চর্চা করে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও ইকবাল চর্চার গৌরবময় ঐতিহ্য ছিলো। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ইকবাল চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি 'ইকবাল একাডেমী'র বিলুপ্তি ঘটে। ইকবালের স্মৃতি মুছে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। ·······

মূল প্রবন্ধে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট জনাব সৈয়দ তোসারফ আলী ঐক্য ও সংহতির ওপর ইকবাল দর্শনের ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতিতে মুসলমানদের ৬টি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন এক, মুসলিম বিশ্বের সমস্যা সমাধানে ওআইসিকে শক্তিশালী করা। দুই, প্রতিটি মুসলিম দেশকে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান করা। তিন, আধুনিক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। চার, বেকারত্ব ও অশিক্ষা দূরীকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা। পাঁচ, মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। ছয়, প্রতিটি মুসলিম দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করার উপর জোর দেয়া।

আলোচনা পর্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুজীবুর রহমান বলেনঃ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের হিংস্রতা সম্পর্কে ইকবাল আগেই আঁচ করতে পারেন যা তিনি লেখনীর মাধ্যমে বলে গেছেন। ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যেই ইকবাল আসল মানবতার সন্ধান পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব শাহ আবদুল হান্নান বলেন, ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে ন্যায় বিচার। ওআইসিকে শক্তিশালী করে মুসলিম দেশগুলোকে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

সাবেক তথ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট জনাব মুজীবুর রহমান বলেনঃ ইকবালের চিন্তা-ভাবনার ভিত্তি ছিলো আল কুরআনের শিক্ষা। তিনি সেই শিক্ষাকে মানবতার কল্যাণে কাজে লাগাতে সচেষ্ট ছিলেন। ওদিকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার ভিত্তি ছিলো

রামায়ণ, মহাভারত ও উপনিষদ। তিনি আর্ট ফর আর্ট সেকে বিশ্বাসী ছিলেন। ইকবাল জীবনের জন্য বাহন বানিয়েছেন শিল্পকে।

বাংলাদেশ টাইমসের সম্পাদক জনাব মহবুব আনাম বলেনঃ মহাকবি ইকবাল নোবেল প্রাইজ পাননি ঠিকই, তবে তাঁর প্রতিভা নোবেলপ্রাপ্তদের চেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই বেশী ছিলো। হয়তো তিনি মুসলমান ছিলেন বলেই তাঁকে নোবেল দেয়া হয়নি। আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা উগ্রসাম্প্রদায়িক বংকিম চন্দ্রের জন্ম–মৃত্যু দিবস পালন করলেও ইকবালের জন্ম–মৃত্যু দিবস পালন করেন না। অথচ আমাদের এই স্বতন্ত্র জাতিসত্তা অর্জনের পেছনে ইকবালেরও অবদান রয়েছে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে বাংলাদেশস্থ পাকিস্তানের হাইকমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল বলেনঃ ইকবাল ছিলেন মুসলিম রেনেসাঁর বার্তাবাহক। তিনি পশ্চিমা সভ্যতাকে খুব ভালভাবে পর্যালোচনা করতে পেরেছিলেন বলেই পশ্চিমা সভ্যতার সবকিছুকে যেমন তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি, তেমনি এর চাকচিক্যতাকে মোহগ্রস্ত করতে পারেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, হৃৎগৌরব অর্জনের জন্যে দুনিয়ার সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মধ্য এশিয়ার স্বাধীন মুসলিম দেশসমূহের পুনরুত্থান ও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তাঁর দর্শনেরই সোনালী আভা। কম্যুনিজমের পতনের পর অনেকে ইসলামকে পশ্চিমা বিশ্বের জন্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ইকবাল সাহিত্য আমাদের প্রভূতভাবে আন্দোলিত করতে পারে।

প্রধান অতিথির ভাষণে জাস্টিজ আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী বলেনঃ ইকবাল নিছক কবি বা দার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিকও। সবচেয়ে বড় কথা, ইকবাল ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী কবি, ভাবুক ও রাজনীতিক। নর–নারীর ভালবাসা, বসন্তের মলয় সমীরণ, ফুলের সৌন্দর্য, পাখীর গান, প্রেমিক–প্রেমিকার বিরহ–মিলন, জীবনের সুখ–দুঃখ এসবই হচ্ছে কবিতার মামুলী বিষয়বস্তু। সাধারণ কবি বন্ধুরা এসব নিয়েই কাব্য চর্চা করেন, কবিতার পংক্তি গাঁথেন, গানের সুর বাঁধেন। গতানুগতিকতার এ সোজা পথ ছেড়ে যে কবি–দার্শনিক সম্পূর্ণ এক নতুন পথে গেছেন, তিনি হচ্ছেন মহাকবি আল্লামা ইকবাল। তিনি কবিতাকে করেছেন জাতি গঠনের হাতিয়ার। দর্শন এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করেছেন ইসলামের খেদমতে। ইকবালের কবিতায় মিশে আছে ইসলাম। ইকবাল বিশ্ব মুসলিমকে এক প্লাটফর্মে একত্রিত করার জন্যে আমৃত্যু কলমের সৈনিক হিসেবে জিহাদ চালিয়ে গেছেন।

সভাপতির ভাষণে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেনঃ তদানীন্তন ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার জন্যে মহাকবি ইকবাল অবিরাম চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। ইকবালকে বুঝতে হলে তাঁর লেখা পড়তে হবে। পবিত্র কুরআনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন আল্লামা ইকবাল। আমাদের দেশে ইকবাল চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগকে মজবুত করার জন্যে সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আমি সংশ্লিষ্টদের ইকবাল চর্চায় এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

চা চক্রের পর সেমিনার শেষ হয়। সেমিনারের সার্বিক উপস্থাপনায় ছিলেন সংসদের আন্তর্জাতিক সম্পাদক জনাব হাফীজুর রহমান।

ডঃ মুজীবুর রহমান

শাহ আবদুল হান্নান

মাহবুব আনাম

সৈয়দ তোসারফ আলী

হাফীজুর রহমান

অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখছেন সংসদ সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মীর কাসেম আলী

অভ্যাগত অতিথিবৃন্দের একাংশ

সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন সংসদ সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ডানে রয়েছেন জাস্টিজ আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী, আনোয়ার কামাল, মীর কাসেম আলী–
বামে রয়েছেন এডভোকেট মুজীবুর রহমান, মাহবুব আনাম, শাহ আবদুল হান্নান ও সৈয়দ তোসারফ আলী

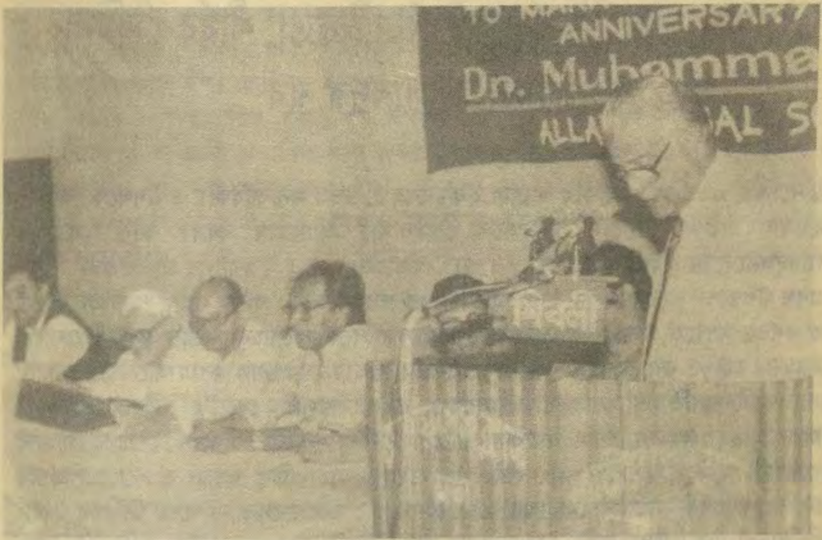

প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন জাস্টিজ আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী

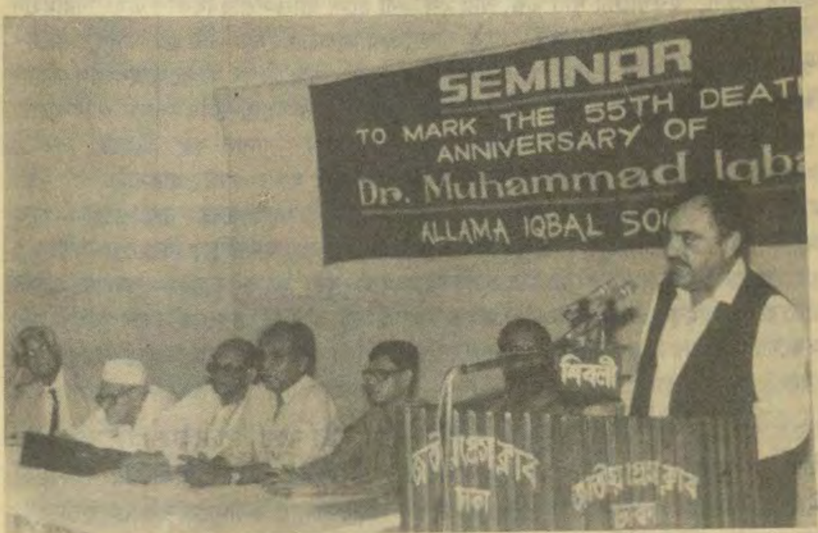

বিশেষ অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন পাক হাই কমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল

'আমাদের কাল ঃ ইকবালের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক সেমিনার
শিকদার আবদুর রব

৯ নভেম্বর '৯৩ ছিলো মহাকবি আল্লামা ইকবালের ১১৬তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে 'আল্লামা ইকবাল সংসদ' হোটেল সুন্দরবনে সেমিনারের আয়োজন করে। কারী মোহাম্মদ আবদুল্লাহেরের কুরআন তিলাওয়াতের পর 'আমাদের কাল ঃ ইকবালের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী। কবির দর্শন, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে, তার চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত জনাব মাহমুদ বায়াত, পাকিস্তানের হাই কমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল, সাবেক বিচারপতি জনাব আবদুল বারী সরকার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট জনাব মুজিবুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডীন ও দর্শন বিভাগের প্রফেসর অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম এবং কবি আল মাহমুদ। সভাপতিত্ব করেন সংসদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। স্বাগত ভাষণ দেন সংসদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মীর কাসেম আলী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ তোসারফআলী।

অধ্যাপক শাহেদ আলী তাঁর প্রবন্ধে বর্তমান সময়ে ইকবালের কাব্য ও দর্শনের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলেন, 'ইকবালের খুদী তত্ত্ব, যার মূল কথা হলো ব্যক্তিসত্তার বিকাশ এবং বিরামহীন কর্মতৎপরতা ও সংগ্রামের আদর্শ, তাতে পাশ্চাত্যের লিবারেলইজম-এর যে আদর্শ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে তারই স্বীকৃতি রয়েছে, যদিও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিসত্তার বিপদ সম্পর্কে ইকবাল সতর্ক, অন্যদিকে সমাজের উপর গুরুত্ব দিয়ে সমাজকে খুদী বা ব্যক্তিসত্তায় লালন-পালন ও বিকাশের ক্ষেত্র ঘোষণা করে সমাজবাদী চিন্তাধারাকেও যথাযোগ্য মূল্যদান করা হয়েছে। এভাবে আসরারে খুদী ও রমূযে বেখুদীতে তিনি ব্যক্তি-সমাজের মধ্যে একটা ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করে অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সর্বগ্রাসী সমূহবাদের ত্রুটিগুলো থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কেবল মুসলমানদের নয়, আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে এ ধরনের ব্যক্তি ও সমাজ সর্বপ্রকার আতিশয্য থেকে মুক্ত থাকে বলেই এ সমাজ একটা শান্তিকামী, সহিষ্ণু, উদার সমাজ। এ সমাজ সংঘর্ষ সৃষ্টি করে না, বরং এ সমাজবহির্ভূত আর সকলের জন্য একটা নমুনা স্থাপন করে সবাইকে এই নমুনায় নিজ সমাজ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়।

ইকবালের পাশ্চাত্য সমালোচনা সম্পর্কে তিনি বলেন, তাঁর মধ্যে পাশ্চাত্যের প্রতি ঘৃণা নেই, তিনি কেবল তার ত্রুটিগুলোর প্রতি আঙ্গুল নির্দেশ করেছেন সংশোধনের প্রত্যাশায়। পক্ষান্তরে নির্জীব, উদ্যোগ ও ব্যক্তিত্বহীন নিজ সমাজকেই সমালোচনার কষাঘাতে রক্তাক্ত করেছেন, মোল্লা ও খানকা ব্যবসায়ী পলায়নবাদী সুফীদের অন্ধতা ও পরাজয়ী মনোভাব থেকে মুক্ত করার জন্য তীব্র ভাষায় তাদের আক্রমণ করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর উদ্দেশ্য ধ্বংস বা অভিসম্পাত নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানব ভ্রাতাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।'

ইকবালের জাতীয়তাবাদের ধারণা সম্পর্কে তাঁর বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'ইসলাম সমস্ত জড়বস্তুর বন্ধন ও গোলামীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। ইসলামের জাতীয়তা ভিত্তি একটি খাঁটি ও পবিত্র পরিকল্পনার উপর স্থাপিত। ইসলাম এমন এক মানব গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে চায় যাদের মধ্যে বর্ধিত ও সম্প্রসারিত হবার পূর্ণ উপযোগিতা স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান। ইসলামে জাতীয়তার ধারণা জাতি সম্পর্কিত অন্য সকল মতাদর্শ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর মূল আদর্শ ও ভিত্তি ভাষার ঐক্য নয়, বাসস্থানের ঐক্য নয় বরং এর মূল নিয়ম হচ্ছে নিখিল সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে মত ও বিশ্বাসের ঐক্য ও সামঞ্জস্য যা সব মানুষকে এক অবিচ্ছেদ্য শাশ্বত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে দিতে সক্ষম'। ······· তিনি বলেন, 'ইকবাল সকল দেশের, সকল মানুষের, সকল কালের কবি।'

ইরানের রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ইকবালের চিন্তা ও কর্মের যথাযথ মূল্যায়ন এক দুরূহ বিষয়। এই বিশাল মহান ব্যক্তিত্ব মানবিক ও আত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং একজন মুসলমান হিসাবে তিনি বিশেষ কোন ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখেননি। তাঁর চিন্তাধারা হচ্ছে সমগ্র ইসলামী চিন্তাদর্শ বিকাশের দর্পণ স্বরূপ, যা ধীরে ধীরে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। তিনি উপমহাদেশের একজন সংস্কারক হিসাবে মূল্যায়িত হয়ে থাকেন। তাঁরই সাহসী প্রেরণায় একটি ইসলামী দেশ হিসাবে পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিলো। তাঁর অনুধাবন কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুধাবন নয় বরং একটি সংগঠন ও একটি আদর্শের অনুধাবন এবং সর্বোপরি আমাদের অবস্থা এবং পরিবেশেরও অনুধাবন স্বরূপ। তিনি সমাজ ও দার্শনিক চিন্তাধারার পুনর্গঠন করে একটি প্রতিষ্ঠানে রূপদান করেন যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-দর্শন ও আইনগত বিশেষ প্রক্রিয়ায় সুবিন্যস্ত। তাঁর কবিতা কেবল কবিতা নয়, তা হলো দর্শন, চিন্তা এবং নতুন দেশ ও জাতি গঠনের উদাত্ত আহবান এবং পরিকল্পনায় পূর্ণ। তিনি পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তার অন্তসারশূন্যতা দেখতে পান। তাই তিনি এগুলোর পরিবর্তে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের আহবান জানান।

তিনি বলেন, ইকবালের দর্শন হচ্ছে আত্মোপলব্ধির দর্শন, অর্থাৎ আত্মার স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতা। তাঁর দৃষ্টিতে যদি কেউ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভে সমর্থ হয় এবং আত্মাকে চিনতে পারেন তাহলে তিনি তার ভিতর এমন একটি জগত সৃষ্টি করতে সক্ষম যা বাহ্যিক জগতের সমস্ত অপরিপূর্ণতাকে দূরীভূত করতে সক্ষম। তিনি মানুষকে সচেতন, স্বাধীন, চিন্তাশীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আসক্তিই হচ্ছে মানুষের বড় শত্রু। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার উপকরণগুলোকে বস্তুবাদী এবং এর প্রকৃতিকে সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, বর্তমান অবস্থায় ইসলাম সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার কারণে একদিকে যেমন তারা স্বকীয় জাতিসত্তাকে হারিয়ে ফেলছে তেমনি ব্যক্তিবর্গের উপরও অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে।

পাকিস্তানের হাই কমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল বলেন, 'ইকবাল সংকীর্ণ কোন জাতীয়তাবাদের কথা বলেননি, তিনি মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধের বিশ্বজনীন নীতির কথা বলেছেন। তিনি চেয়েছেন মুসলমানদের আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলতে।

এডভোকেট জনাব মজিবুর রহমান আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, পাশ্চাত্যে যখন ঘোর অন্ধকার, ইসলামী সভ্যতার আলো তখন চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ইসলামই পাশ্চাত্যকে পুনর্জাগরণের

পথ দেখিয়েছে। ইসলাম মানুষকে পশ্চাতে ঠেলে দেয় না, অগ্রগতির পথ দেখায়। তাই আল্লামা ইকবাল চেয়েছিলেন অধঃপতিত মুসলমানদের মধ্যে সেই ইসলামী আলোক বর্তিকা জ্বালাতে। তিনি বলেন, বিশ্বে এখন গণতন্ত্রের চর্চা চলছে। কিন্তু গণতন্ত্র কোথায়? ভোটের পূর্বে গণতন্ত্রের মালিক জনগণ। কিন্তু ভোটের পর প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী। তখন কোথাও জনগণের গণতন্ত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, আমাদের সময়টা সময় না, দুঃসময়। বিশ্বের সকল দেশেই বিরাজ করছে অশান্তি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ অনেক কিছু করতে পারলেও ঘরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই ইকবাল যন্ত্র–সভ্যতার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতা চলছে বস্তুবাদিতার উপর ভিত্তি করে। তাই সেখানে আত্মা নেই। কিন্তু তারপরও মুসলমানরা তার খারাপ দিকগুলো গ্রহণ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, মুসলমানদের দুঃসময়কালে ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন এবং এ থেকে বাঁচার জন্য তিনি মুসলমানদের সামনে ইসলামী জীবন বিধান তুলে ধরেন। তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান এবং তাঁর জীবন দর্শনে ছিলো ইসলামের প্রতিফলন।

কবি আল মাহমুদ বলেন, রাজনৈতিক কারণে ইকবালের কবিতা বাংলা সাহিত্যে স্থান পায়নি। তাঁর কবিতা থেকে বঞ্চিত আমাদের যুব সমাজ। কোন কোন সময় বা স্থানে ইকবালের দর্শন আলোচিত হলেও আমাদের সুধী সমাজে তাঁর কবিতার কোন স্থান নেই। যাঁরা তাঁকে নিয়ে ভাবেন তাঁরাও তাঁর কবিতাকে কেন এড়িয়ে যান তা আমার বোধগম্য নয়। ভারতের শিল্পীরা ইকবালের 'চীন ওয়া আরব হামারা হিন্দুস্তাঁ হামারা' গানটি গর্বের সাথে গাইলেও আমরা সে ব্যাপারে অজ্ঞ। এর চেয়ে লজ্জার আর কি থাকতে পারে। এ লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলো দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে বিচারপতি আবদুল বারি সরকার বলেন, ইকবালের অভ্যুদয় এমন এক সময় যখন মুসলমানরা দেশে দেশে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ইসলামের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বিশ্ববাসীকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। কবি, দার্শনিক হিসাবে তিনি ইসলামকেই উপস্থাপন করেছেন। কবি ইকবাল ছিলেন ইসলামের প্রতিনিধি।

সভাপতির ভাষণে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, ইকবালের জন্ম হয়েছিলো আল্লাহর নিয়ামত হিসাবে। বিভিন্ন মতাদর্শের সংস্পর্শে আসার কারণে ইসলামকে নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিলো তা যেমন ইমাম গাযযালী দূর করে ইসলামকে সঠিকভাবে তুলে ধরেন তেমনি ইকবালও কোরআন–হাদিস থেকে দূরে সরে যাওয়া মানুষকে কোরআনের প্রতি আহবানের মাধ্যমে সঠিক পথ দেখান।

মীর কাসেম আলী তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, ইকবাল ছিলেন একজন মহাকবি এং বিশিষ্ট দার্শনিক। তাঁর দর্শনের মূল বিষয় ছিলো খুদী যা মানুষকে তার অবস্থান সম্পর্কে উপলব্ধি করিয়েদেয়।

সৈয়দ তোসারফ আলী ' আল্লামা ইকবাল সংসদ' গঠন প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় শিল্পীদের ইকবালের তিনটি গান পরিবেশনা থেকে ইকবাল সংসদ গঠনের প্রেরণা লাভ করি। চা চক্রের পর সেমিনার শেষ হয়।

আল মাহমুদ

এডভোকেট মুজীবুর রহমান

প্রফেসর শাহেদ আলী

সৈয়দ তোসারফ আলী

মীর কাসেম আলী

প্রফেসর আমীনুল ইসলাম

হাফীজুর রহমান

সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

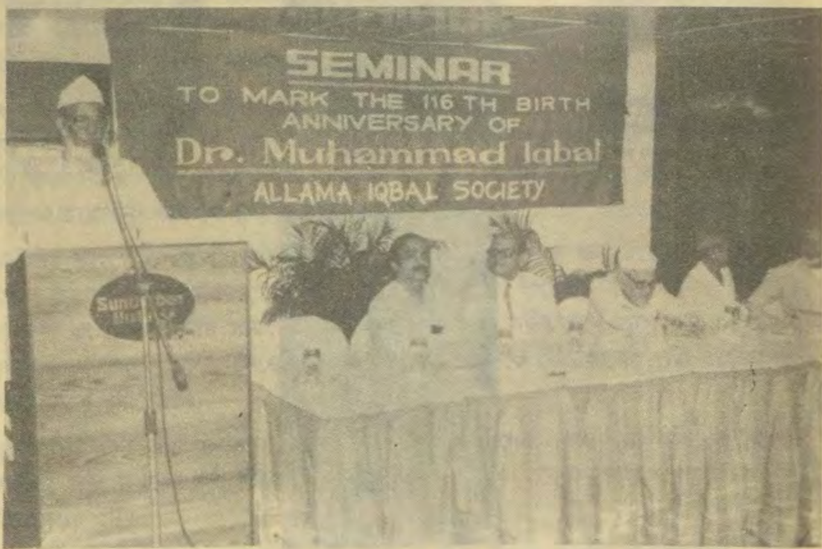

প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন জাস্টিজ আবদুল বারী সরকার

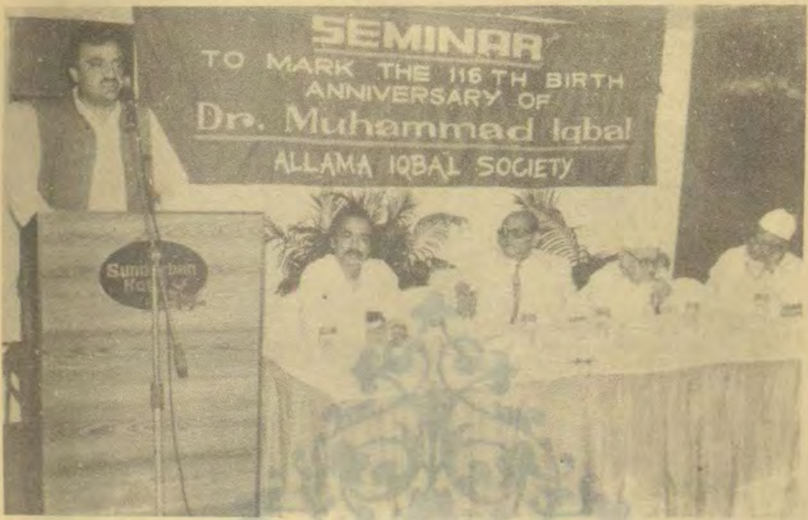

বিশেষ অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন পাক হাই কমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল

বিশেষ অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন ইরানী রাষ্ট্রদূত জনাব মাহমুদ বায়াত

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
30990
LAHORE.

B 3
IQBAL ACADEMY PAKISTAN
LIBRARY.
Acc. No.........
LAHORE.

00030990